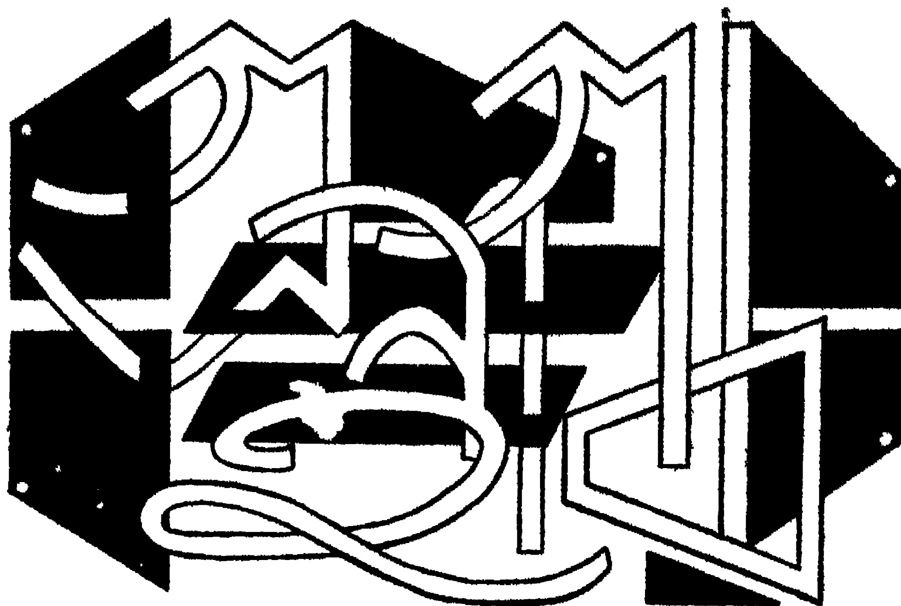
সম্মেলন সংখ্যা



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭৪

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১ | ১৩৭৪, বৈশাখ

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ গ্রন্থাগারবিদ্যার অখণ্ড জগৎ ॥

বর্ধমান জেলার শ্যামসুন্দরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণটি যাঁরা মনোযোগের সহিত অনুধাবন করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁর সেই ভাষণের এক স্থানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিশ্বঐক্য স্থাপনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর এই ভাষণে তিনি বলেছেন, "বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আরও বেশী বর্ধিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা এমন একটি বিশ্বে বাস করছি যেটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অথবা বাণিজ্যিক দিক থেকে এক, মতবাদের দিক থেকে দুই বা তিন, এবং জাতীয়তাবোধের দিক থেকে বহু। এই বিশ্বের শান্তি আজ বিপন্ন—সেখানে আছে শক্তির লড়াই, দম্ভের বড়াই আর স্বার্থের সংঘাত। এই সব সংঘাতের ফলে প্রায়ই যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিশ্বের মানুষ হয়ে ওঠে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত, কারণ সে জানে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে আণবিক যুদ্ধ এবং এই আণবিক যুদ্ধে হয়তো সমগ্র মানব জাতির ধ্বংস সাধিত হবে। বিশ্বের ও বিশ্বমানবের এই সঙ্কট থেকে মুক্তি চাই। একত্বকে দ্বিত্ব ও বহুত্ব অপেক্ষা বলশালী করতে হবে। তার জন্য চাই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। … … …

তাই বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে তার প্রসার সাধনে সকল দেশ যদি সচেষ্ট হয়, তাহলে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলন দেশের সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং এক দিক থেকে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তাই আজ অনস্বীকার্য।"

সভাপতি মহাশয় যে বিশ্বগ্রন্থাগার আন্দোলন ও সংস্থা গঠনের কথা বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে তার জন্য কিছু কাজ অবশ্যই UNESCO-র উদ্যোগে হয়েছে। যদি আমরা UNESCO-র কার্যধারা বিচার করে দেখি তাহলে এটা দেখতে পাব। এই কিছুদিন

আগেই UNESCO-র বিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হয়ে গেল। UNESCO-র এই বিশ বছরের কাজকর্মের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে UNESCO কাজ করে চলেছে। হয়তো এই সব কাজ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট জোরদার হয়নি বা বিশ্বের জনগণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেই বাণী জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দিতে হবে। গ্রন্থাগারকে সেজন্য উদ্যোগী হতে হবে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনায় যেমন গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিকতা ও সমগ্র মানবজাতির ঐক্য সাধনার ক্ষেত্রেও যে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সুদূর এক পল্লী প্রান্ত থেকে বিশ্বঐক্য ও সৌভ্রাত্রের যে বাণী আজ উঠল তা সারা বাংলায়, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ুক। বস্তুতঃ এই ঐক্যানুভূতি ও প্রেমের মন্ত্র ভারতের পক্ষে নতুন কিছু নয়। 'এই মহামানবের সাগর তীরে-র পূণ্যভূমিতে বারবার সেই মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার তার সঞ্চিত জ্ঞানের আলোকবর্তিকা সঙ্কেতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞানের যেমন কোন জাতীয়তা নেই তেমনি গ্রন্থাগারবিদ্যারও কোন জাতীয়তা নেই। প্রয়োগকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকলেও আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে, জাপানে বা ভারতে, এমন কি, সোভিয়েত দেশ বা চীনেও গ্রন্থাগারবিদ্যা মূলতঃ একই। তার উদ্দেশ্যও এক। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের (১৮২২-১৮৯৫) প্রায় একশ বছর আগেকার বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"Science has no nationality because knowledge is the partimony of humanity, the torch which gives light to the world. Science should be the highest personification of nationality because of all nations, that one will always be foremost which shall be first to progress by the labours of thought and of intelligence.

Let us therefore strive in the pacific field of Science for the pre-eminence of our several countries. Let us strive, for strife is effort, strife is life when progress is the goal," (ইংরাজী উদ্ধৃতি মার্জনীয়)।

রূঢ় বাস্তবের আঘাতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের আশা বারবার বিঘ্নিত হয়েছে, তবু আশাবাদী মানুষ তার আশা ছাড়েনি। আজকের দুনিয়ায় প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে; বিশ্বের এক অংশে যদি শান্তি নিরাপদ না হয় তবে পৃথিবীর কোন অংশেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে—একথা আশা করি বাতুলের উক্তি বলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীরা মনে করবেন না।

Editorial : Librarianship :—One World.

।। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ।।

শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ বর্ধমান জেলাবাসীর মহা আনন্দের দিন। পশ্চিমবঙ্গের শত শত জ্ঞানী-গুণী, গ্রন্থাগার প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী ও গ্রন্থপিপাসুগণের সমাবেশ হইয়াছে বর্ধমান জেলার একটি গণ্ডগ্রামে, জ্ঞানের সন্ধানে "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে" এই ভাব লইয়া। গ্রন্থাগার আন্দোলন যাহাতে উত্তরোত্তর সমুন্নতির পথে অগ্রসর হয়, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়—সেই সদিচ্ছা লইয়া আপনারা ছুটিয়া আসিয়াছেন। আপনাদের শিক্ষা সম্প্রসারণের মহৎ উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যে জেলায় আপনারা আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ধমান জেলাকে সেই সংস্কৃতির মধ্যমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে বর্ধমান তথা কাটোয়ার দান অনস্বীকার্য। অনুবাদ কাব্য, বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য সব কিছুরই উৎসস্থল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে। যথা, মহাভারতের অনুবাদক স্বনামখ্যাত কাশীরাম দাস যাঁর প্রতি কবি মধুসূদন শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিয়াছেন —

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
হে কাশী! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।"

সেই ঋষির জন্মভূমি এই জেলার সিঙ্গীগ্রামে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম বর্ধমানেরই কবি। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কাটোয়া মহকুমার কাঁদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার, যাঁহার লেখা—

"যদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতি।"

সেই লোকসঙ্গীতের সম্রাট কবি দাশরথি রায় এই গ্রামেরই অদূরবর্তী বাঁধমুড়া গ্রামের অধিবাসী।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ধমান জেলার দান অগ্রগণ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের উৎসমুখ নবদ্বীপ হইলেও রসপ্লাবনের ধারা বেশীর ভাগই প্রবাহিত হইয়াছিল এই রাঢ় অঞ্চল হইতে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি বৈষ্ণব জগতের আদিগ্রন্থ যথা ঝামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত, দেনুড়ের শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত, কোগ্রামের লোচনদাস ঠাকুরকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গ্রন্থগুলি প্রণেতার বাস বর্ধমান জেলায়। বৈষ্ণবপদকর্তা ও মহাজনদের মধ্যে ২।৪ জনকে বাদ দিলে প্রায় সকলেই বর্ধমানের সুসন্তান।

এ ছাড়া এই জেলায় বাসস্থান গৌরীদাস পণ্ডিতের অম্বিকা কালনায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিদ্যানগরে, গোবিন্দ ঘোষের অগ্রদ্বীপে, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কৃষ্ণদাসের আকাইহাটে, সত্যরাজ খাঁ ও রামানন্দ বসুর কুলীন গ্রামে, সুবুদ্ধি রায় ও সুবুদ্ধি ঘোষের বেলগাঁয়ে, উদ্ধারণ দত্তের নৈহাটীতে, জ্ঞানদাসের কাঁদরায়, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শীতলগ্রামে, কড়চা লেখক গোবিন্দদাসের কাঞ্চননগরে, শ্রীনিবাস আচার্যের যাজিগ্রামে। কৃষ্ণবিজয়-এর গ্রন্থকার মালাধর বসুর কুলীনগ্রামে, রূপ সনাতনের নৈহাটীতে, কেশব ভারতীর দেনুড়ে, কবিকঙ্কণের দামুন্যায়, নৈয়ায়িক বুনোরামনাথের সমুদ্রগড়ে, নরহরির সাহিত্য-শিষ্য বাসু ঘোষের দুলাই-এ, আর কত বৈষ্ণব তীর্থের নাম করিব আরও আছে অনেক।

বাহান্ন পীঠের দুইটী পীঠস্থান এখান হইতে ৭ মাইলের মধ্যে একটা ক্ষীরগ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা যোগাদ্যা অন্যটী অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাটোয়া সহরে যেখানে রুদ্র অজয় ভাগীরথীর ক্রোড়ে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়াছে—সেই সঙ্গমস্থলে চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস হয়।

আধুনিক যুগে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ), শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ সুকুমার সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী বসু, রাসবিহারী ঘোষ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয় কুমার দত্ত, রেঃ লালবিহারী দে প্রভৃতি এতদঞ্চলীয় সাহিত্যিক কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদানের কথা সর্বজনবিদিত।

এক্ষণে শ্রীখণ্ড গ্রামের যেথান হইতে গৌরলীলারসের অমিয় ধারা উৎসারিত হইয়াছিল ও যেখানে আজিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ ও গৌরলীলার রসবিলাসের উৎস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মধ্যমণি। কাটোয়া হইতে চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গ্রামখানির প্রাচীনত্বের ইতিহাস যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ দাস ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও ৮।১০ উর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষের ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাক চৈতন্য যুগে এই গ্রামের নাম ছিল খণ্ডপুর। বহু জাতি অধ্যুষিত ১৮ পাড়া বিরাট গ্রামখানিকে খণ্ডেশ্বর, শ্রীমহাদেব, (যাহার মন্দির রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক নির্মাণের নিদর্শন আজও বর্তমান) খণ্ডেশ্বরী দেবী, কঙ্কেশ্বরী, সিংহবাহিনী, গোপীনাথজিউ, শ্রীশ্যাম রায় প্রভৃতি দেববিগ্রহের সেবাপূজাদি যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরে অবশ্য আরও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাগ চৈতন্যযুগে তন্ত্র সাধনার জন্য শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধি ছিল। আজও বহুস্থানে পঞ্চমুণ্ডের আসন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের যুগে ও চৈতনোত্তর

যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা ও সংস্কৃতির জন্য এই গ্রামের সুনাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

"ক্ষিতি নব খণ্ড মধ্যে খণ্ড মহাস্থান
সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান॥" [মহাজন রামগোপাল দাস]

শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি গৌরাঙ্গের পার্ষদগণ ছিলেন এই বৈষ্ণবীয় ভাবধারার উৎস। মুকুন্দ ছিলেন বাদশাহ হুসেন শাহের গৃহ চিকিৎসক অথচ পরম বৈষ্ণব। একদিন হুসেন শাহের শিরোভূষণস্থিত শিখিপুচ্ছ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহারই পুত্র শ্রীরঘুনন্দন মাত্র আট বৎসর বয়সে কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথকে সাক্ষাৎভাবে নাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শ্রীনরহরি গৌরাঙ্গবিষয়ক প্রথম পদ রচয়িতা ও বহু সংস্কৃতগ্রন্থের প্রণেতা। পুরীধামে ইহারই নিকট দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লোকানন্দাচার্য তর্কে পরাজিত হইয়া ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনিই চৈতন্যদেবের প্রকটকালে 'রসরাজ মহাভাব' শ্রীচৈতন্যদেবের তিনটি শ্রীবিগ্রহ স্বাবিষ্টভাবে নির্মাণ করাইয়া বড়টি কাটোয়ার দাস গদাধরকে, মধ্যমটি বগুড়ার ভাগ-কোলায় নিত্যসেবার জন্য প্রদান করেন এবং ছোটটি নিজে সেবা করিতে থাকেন। ইহারই আদেশে ইহার শিষ্য শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, দুলর্ভসার প্রভৃতি গ্রন্থ ও চৈতন্য বিষয়ক বহু ললিত মধুর পদ রচনা করেন। ইহারই বহু শিষ্যের মধ্যে পদকর্তা চন্দ্রশেখর, পদকর্তা দ্বিজলক্ষ্মীকান্ত, শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবাইত শ্রীচক্রপাণি চৌধুরী প্রভৃতি অন্যতম। ইহার আকর্ষণে একবার শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদসহ শ্রীচৈতন্যদেব মধুপান লীলাচ্ছলে শ্রীখণ্ডে আসিয়া এই দেশকে ধন্য করেন।

"মোহিত গৌরাঙ্গ রায় সকল ভকত তায়
প্রভু নিত্যানন্দ উনমত।" (রামচন্দ্র কবি)

"মধুমতী মধুদানে ভাসাইল ত্রিভুবনে মত্ত কৈল চৈতন্য নাগরে।
মাতিল শ্রীনিত্যানন্দ আর যত ভক্তবৃন্দ বেদবিধি পড়িল ফাঁপড়ে॥"
[রায় শেখর]

শ্রীচৈতন্য পদরজস্পর্শে ধন্য এই খণ্ডগ্রাম তখন হইতে শ্রীখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বহুবার শ্রীখণ্ডে আসিয়া ঠাকুর নরহরির উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও কবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দ দাস কবিরাজের জন্মস্থান শ্রীখণ্ডে। খণ্ডের কবি শ্রীদামোদর গোবিন্দ দাসের মাতামহ। দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া খ্যাত কবিরঞ্জন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা কবিশেখর (নামান্তর রায় শেখর) যিনি বহু গ্রন্থ ও পদ লিখিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহারও এইখানেই জন্মস্থান ছিল। রঘুনন্দনবংশীয় শ্রীজগদানন্দের

পদাবলী, রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী, শ্রীগোপাল দাসের রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের অনবদ্য সম্পদ। শ্রীখণ্ডের এই ঐতিহ্যের তখন হইতে পরবর্তী যুগেও ধারাবাহিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে কবি বলরাম দাস, নৃসিংহানন্দ, রসিকানন্দ, গোপীনাথ কবিরাজ দার্শনিক রাখালানন্দ শাস্ত্রী, কবিরাজ রাধিকানন্দ রায়, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, কবি সচ্চিদানন্দ ঠাকুর, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম, এ বিটি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যযুগে পুরীর রথযাত্রার সমুখে "খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন" সেই বৈশিষ্ট্যে ভরা রসকীর্তন আজও শ্রীখণ্ডের আকর্ষণ। এখনও সংকীর্তনাচার্য শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর বর্তমান রহিয়াছেন যাঁহার কথা কীর্তনকলা রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। ইঁহারই প্রণীত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" বৈষ্ণব জগতের খ্যাতনামা পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। ইঁহার রচিত ভক্তিরসাত্মক অন্যান্য গ্রন্থ, শ্রীখণ্ড উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত এম, এ প্রণীত বেদান্ত রহস্য ও অন্যান্য গ্রন্থ, ৺রাখালানন্দ শাস্ত্রী প্রণীত মৌলিক-চিন্তাধারা সমন্বিত গ্রন্থাদি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিত ৺জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাদি বেদান্ত শাস্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যায় সমুজ্জ্বল। শোনা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সময় এই গ্রামে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ধমান জেলায় গ্রন্থাগার প্রীতিও আজিকার নহে। বহু অতীতকাল হইতে পুঁথি ও পুস্তক সংরক্ষণাগারের ঐতিহ্য এখানে আছে। বর্ধমানরাজের বিশেষ আনুকূল্যে জ্ঞান-পিপাসুদের চরিতার্থ করিতে রাজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ ছিল অসামান্য।

বর্ধমান জেলার বহু গ্রন্থরত্ন লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, বার্লিন প্রভৃতি বিদেশের প্রসিদ্ধ হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহশালায় আজিও বিদ্যমান আছে যাহার জন্য বর্ধমান জেলা গৌরব বোধ করিতে পারে। বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই গ্রামের সুসন্তান ৺রাখালানন্দ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে কতিপয় জার্মান গবেষক পণ্ডিত কিছু প্রাচীন পুঁথি স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন। এ ছাড়াও পুস্তক সংরক্ষণাগার হিসাবে বর্ধমান রাজ পাবলিক লাইব্রেরী (অধুনা জেলা গ্রন্থাগার) কালনা এডওয়ার্ড লাইব্রেরী (অধুনা রবীন্দ্র পাঠাগার) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বৈদ্যপুর নন্দীদের পাঠাগার, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত অকাল পৌষ পাঠাগার, পূর্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থবিশেষ, বোহারের মুন্সীদের আরবী ও উর্দু কেতাবের সংগ্রহ (যাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত হইয়াছে) দেহুড়ের সাহিত্যিক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়, কাটোয়ার শ্যামলাল পাঠাগার, শ্রীখণ্ডের চিত্তরঞ্জন পাঠামন্দির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লাইব্রেরীয়ান শ্রীবসন্ত বিহারী চন্দ্রের সমৃদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হইবার

মত। সুতরাং জ্ঞানচর্চার মিলনক্ষেত্র পাঠমন্দিরগুলি এই জেলার বৈশিষ্ট্য বহন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিঃস্বার্থভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শহর হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। সেজন্য তাহারা পল্লীবাংলার নমস্য। তাঁহারা আজ শহরের চিন্তাধারাকে পল্লী সমাজের চিন্তাধারার সহিত নিবিড় সংযোগস্থাপনে অগ্রণী, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ কিন্তু রূপায়ণে সমস্যাও পর্বতপ্রমাণ। আর্থিক সঙ্গতির অভাবই পল্লী পাঠাগারগুলির প্রধান সমস্যা। পল্লীবাসীদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শহরে ছুটিতেছেন আপন ভাবনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উচ্ছ্বাসে। গ্রামগুলি ক্রমশই: শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। তদুপরি এই ধরনের শুভ প্রচেষ্টার মূলে আন্তরিকতার অভাব। এই জড়তা হইতে পল্লীবাংলার মানসমুক্তি ঘটাইতে দেশের যুবশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রকে জ্ঞান সাধনার মিলনক্ষেত্রগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিয়া যুবশক্তিকে প্রেরণা জোগাইতে হইবে। পাঠাগারের নিয়োজিত কর্মীদের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমহারে ও নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে হইবে। পাঠাগারগুলির ব্যবস্থাপকদের কথকতা, পাঠ, যাত্রাগান, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে নিরক্ষর ব্যক্তিদের পাঠাগারের প্রতি লোকপ্রিয়তা বাড়াইবার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

পুস্তক নির্বাচনে ও সরবরাহে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ বিচক্ষণতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী ব্যয়ে সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। প্রতি অঞ্চলে সরকারী ব্যয়ে একটি করিয়া আদর্শ পাঠাগার গঠন করিয়া তাহা হইতে ছোট ছোট গ্রাম্য পাঠাগারগুলি যাহাতে পুস্তক ঋণ লইতে পারেন তাহার ব্যবস্থাপনাও আজ আপনাদের চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

কত জ্ঞানী-গুণী-ভক্তের পুণ্যময় স্মৃতিতে পবিত্র করা এই স্থান আজ আবার পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে আপনাদের ন্যায় সাধুব্যক্তিদের শুভাগমনে। সুস্বাগতম, আমরা আপনাদের সেবার অযোগ্য, তবু আজ আমরা ধনী; যেহেতু আপনাদের সেবার অধিকার পাইয়াছি।

বাংলা দেশের গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠানগুলির গৌরবময় ঐতিহ্য উত্তরোত্তর সমুন্নতির মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হউক ইহাই কামনা করি আর প্রার্থনা করি—

"ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে"

Welcome Address :
Nityananda Thakur, Chairman,
Reception Committee.

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥ সভাপতির ভাষণ ॥

শ্রীসুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যবৃন্দ, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও সমবেত সুধীজনমণ্ডলী,

আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একবিংশ অধিবেশনে 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়' এই পল্লীপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হবার সুযোগ দানের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। অধিবেশন আহ্বান করার জন্য বিশেষ করে শ্রীখণ্ড ও শ্রীখণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এই গ্রাম শ্রীখণ্ড। এই জেলার জনসংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক এবং সাক্ষরতার হার হল শতকরা ২৯.৬। জেলার পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার হল শতকরা ৩০.৪ এবং রমণীগণের মধ্যে ১৮.১। সর্বভারতীয় সাক্ষরতার মানের মাপকাঠিতে বর্দ্ধমান জেলা অনুন্নত নয় বরং অধিকতর উন্নত এবং শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হওয়ায় ইহার সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি প্রযোজ্য। এছাড়া শ্রীখণ্ডের একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও ঐশ্বর্য বর্তমান। শ্রীখণ্ড মনে করিয়ে দেয় মহাপুরুষদের কথা—মন চলে যায় সুদূর অতীতে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য 'লীলা অভিরাম' এর কেন্দ্রভূমিতে। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে গৌরবোজ্জ্বল শ্রীখণ্ড—"বাঙ্গালী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের রাজটীকা শ্রীখণ্ডের ললাটে জাজ্বল্যমান"। বৈষ্ণবধর্ম ও তান্ত্রিকধর্মের মিলনক্ষেত্র এই শ্রীখণ্ড গ্রাম। বিশেষ করে বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে ইহার দান উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডের "মধু পুষ্করিণী" আজও শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের শ্রীখণ্ডে পদার্পণের কথা মনে করিয়ে দেয়। শ্রীখণ্ড হল বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থস্থান—বৈষ্ণব সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র। এই পুণ্যভূমিতে আগমনে ও অবস্থানে কলিকাতার দ্রুত চলমান যান্ত্রিক জীবনের নিষ্পেষিত ক্লান্ত অবসন্ন মনে কিছুটা সজীবতা, সরসতা ও পবিত্রতা সঞ্চারিত হবে—এই আমার বিশ্বাস। এই সুযোগদানের জন্য শ্রীখণ্ডবাসিগণকে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দকে আবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে যে সম্মান দেওয়া হ'য়েছে আমি জানি যে তার যোগ্য আমি নই। অযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এই দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছি একটি প্রলোভনের জন্য—সেটি হ'ল গ্রন্থাগার সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আরও কিছু জানার প্রলোভন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে সর্বভারতীয় অধিবেশনে অনেকবার যোগদান করেছি কিন্তু গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ এই প্রথম।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ; তাই অজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ বিজ্ঞান বিষয়ক কোন বিজ্ঞ ভাষণ যদি কেউ আশা ক'রে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি নিরাশ হবেন। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট

র'য়েছে বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকাদিতে। সে বিষয়ে কোন আলোচনা আমি করতে চাই না; কারণ আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

তবে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে; সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা ক'রব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আমি গত বিশ বৎসর ধ'রে ব্যবহার করেছি – আজও ব্যবহার করছি। আমি শুনেছি গ্রন্থাগারের আহ্বান—হয়ত বলতে পারেন গ্রন্থাগারের গান। সে আহ্বানের সুর সম্মোহনী—তাকে অগ্রাহ্য করার শক্তি আমার নেই। লোকে যেমন বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের আশায় সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদির আশ্রয় নেয় আমি সকল ব্যাপারেই গ্রন্থাগারের আশ্রয় নিয়ে এসেছি। জীবনটা ত হারজিতের খেলা, জয়-পরাজয়ের মেলা। সারা জীবনই হল সংঘাত—আশা-নিরাশার সংঘাত, সুখ-দুঃখের সংঘাত, সত্য-মিথ্যার সংঘাত আলো-অন্ধকারের সংঘাত। সংঘাত থেকে সমন্বয় সাধনই হ'ল জীবনের ধর্ম—তার জন্য চাই নিষ্ঠা, কর্মপ্রচেষ্টা ও অন্তরের ভারসাম্য। এই সংঘাতময় জীবনে কখনও আসে আলোর ঝলক, কখনও আসে অন্ধকারের মসীলেখা। সকল সময়েই গ্রন্থাগার হ'য়েছে আমার সাথী—আলো যখন এসেছে, তার তীব্রতা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেনি; অন্ধকার যখন জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রেছে তখন তার গভীরতা আমাকে মর্মাহত করেনি। গ্রন্থাগারে আমি পেয়েছি "never failing friends"। তাই গ্রন্থাগার আমার কাছে কেবল গ্রন্থের আগার নয়, এ হল শান্তির আলয়, গবেষণার মন্দির, মনন ও সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

গ্রন্থাগারের গান যিনি শুনেছেন তিনি নিজের প্রকৃত পরিমাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য। কোন ব্যক্তির জীবনে অর্জিত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য গ্রন্থাগারের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের তুলনায় অতি সামান্য ও তুচ্ছ এই বোধ পাণ্ডিত্যের দম্ভ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থভবনে যখন প্রবেশ করি তখন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের বিশাল রূপের কাছে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হয়ে যাই। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের উক্তি ও বাণী এবং Plato, Aristotle থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য মনীষীগণের গবেষণালব্ধ তথ্য ও মৌলিক চিন্তার কথা যখন গ্রন্থভবনে গিয়ে অন্তরে উদিত হয় তখন নিজেকে মনে হয় অতি সামান্য – মনে হয় জীবনে জানার ও শেখার এখনও অনেক বাকী—যা শিখেছি, যা জেনেছি তা কেবল কণামাত্র – জন্ম জন্ম ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসের ফলেও অনেক কিছু অজ্ঞাত থাকতে বাধ্য। বর্তমানে পণ্ডিতম্মন্যতা অনেক সময় সামাজিক ব্যাধির আকার ধারণ করে সে ব্যাধি থেকে মুক্ত করে গ্রন্থাগার—পণ্ডিতকে ব্যাধিমুক্ত ক'রে সাধারণের পর্যায়ে এনে সাধারণের সঙ্গে সংযোগ করার পথ সুগম করে দেয় এবং সেই সংযোগের ফলে সাধারণ উন্নত হয়ে উঠতে পারে। দম্ভঘেরা ছোট 'আমি'র বিসর্জন এবং সেই স্থানে বৃহত্তর 'আমি'র স্ফুরণ—এই

অসাধ্য সাধন একমাত্র গ্রন্থাগার দ্বারাই সম্ভব। সকলের বেলায় হয়ত একথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যিনি গ্রন্থাগার সচেতনভাবে ব্যবহার ক'রে থাকেন—যিনি গ্রন্থাগারের অকথিত বাণী শুনেছেন—যিনি গ্রন্থাগারের স্তব্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত হন—যিনি গ্রন্থাগারের আহ্বানে আত্মহারা হয়ে ওঠেন—তিনি নিশ্চিতভাবে এই সুরধ্বনি শুনতে পান। গ্রন্থাগারের গান হল অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের গান-সে গানের সুর ভেসে আসে বর্তমানে আর বর্তমানকে রূপায়িত ক'রে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। মূক অতীত মুখর হয়ে ওঠে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারের সাহায্যেই আমরা জানতে পারি মানবজাতির ইতিহাস, তার জ্ঞানবিজ্ঞান ভাণ্ডারের বিকাশ ও পরিমাণ —তার অতীত ও বর্তমান ; এবং তার ফলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা পাই নির্দিষ্ট সূচনা। গ্রন্থাগার অতীতের সৃষ্টি কিন্তু সে হল ভবিষ্যতের স্রষ্টা। মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে কোন মনীষীর অন্তরে গ্রন্থাগার নবযুগের বার্তা বহন ক'রে আনতে পারে এবং সেই বার্তা বাস্তবকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ইতিহাসের নূতন গতিপথ রচনা করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আরও বেশী বর্দ্ধিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা এমন একটি বিশ্বে বাস করছি যেটি ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অথবা বানিজ্যিক দিক থেকে এক, মতবাদের দিক থেকে দুই বা তিন, এবং জাতীয়তাবোধের দিক থেকে বহু। এই বিশ্বের শান্তি আজ বিপন্ন—সেখানে আছে শক্তির লড়াই, দম্ভের বড়াই আর স্বার্থের সংঘাত। এই সব সংঘাতের ফলে প্রায়ই যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিশ্বের মানুষ হ'য়ে ওঠে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। কারণ সে জানে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে আনবিক যুদ্ধ এবং এই আণবিক যুদ্ধে হয়ত সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস সাধিত হবে। বিশ্বের ও বিশ্বমানবের এই সঙ্কট থেকে মুক্তি চাই। একত্বকে দ্বিত্ব ও বহুত্ব অপেক্ষা বলশালী করতে হবে। দ্বিত্ব ও বহুত্বকে একত্বের মধ্যে অবলুপ্ত করতে হবে। তার জন্য চাই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন স্থাপন। জাতি, গোষ্ঠী ও জোটের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে বিশ্বত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষের মনে। আর সেই বিশ্বত্ববোধের বুনিয়াদের ওপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যত মানবজাতির একত্বের বাণী ও আহ্বান। যুদ্ধের ও সংঘাতের বীজ রয়েছে মানুষের মনে—মানুষের মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে সেই বীজ। সেই বীজ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে হানাহানি জাতিতে জাতিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ। সেই বীজ যদি মানুষের মন থেকে অপসারিত করা যায় তাহলে বিশ্বে শান্তির পথ সুগম হয়ে উঠবে। UNESCO শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে বলা হ'য়েছে—"As wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace are to be constructed." মানুষের মনকে সংঘাত প্রবণতার বিষ থেকে মুক্ত করাই হল শান্তিরক্ষা ও শান্তিসৃজনের প্রশস্ত উপায়। কিন্তু সেই আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে চাই মানবমনের পরিবর্তন। ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্ত্বা ও জাতিসত্ত্বা রয়েছে তাকে

আন্তর্জাতিক সত্তা অর্থাৎ বিশ্বত্ববোধের মধ্যে অবলুপ্ত করতে হবে। এই অবলুপ্তির ফলে ব্যক্তিসত্তা বা জাতিসত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না—বরং তাদের প্রকৃতরূপে পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্ফুরণ সাধিত হবে। এই বোধ, এই জ্ঞান বিশ্বের জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং সেই প্রচারের মাধ্যম হবে গ্রন্থাগার। প্রতি দেশে পৃথক ভাষায় এই সত্যকে সহজবোধ্য ভাবে গল্প, আলোচনা, প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে প্রতি অঞ্চলে জনসাধারণের কাছে এই বাণী পৌঁছে দিতে হবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। তাই বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে তার প্রসার সাধনে সকল দেশ যদি সচেষ্ট হয় তাহলে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলন দেশের সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আন্তর্জাতিক দিক থেকে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তাই আজ অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার যদি বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয় এবং এই গ্রন্থাগারকে যদি বিশ্ব-ঐক্য প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে গ্রন্থাগারগুলি কেবল দেশের নয় সমগ্র বিশ্বের নবরূপায়ণে সক্রিয় যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। বিশ্বঐক্য সাধনে গ্রন্থাগারগুলির যে বিশিষ্ট অবদান থাকতে পারে—এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে যদি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কগণ কোন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হন তাহলে হয়ত অনেকটা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। UNESCO-র সহায়তায় ও উদ্যোগে এই পথে অগ্রসর হ'লে স্থায়ী বিশ্ব গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সংস্থা গ'ড়ে উঠতে পারে এবং তার দ্বারা বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। সুদূর আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দ, ইউরোপের জনগণ, আফ্রিকার জনসাধারণ, চীন ও ভারতের অধিবাসিবৃন্দ - সকলেই যদি দেখে যে তাদের বিভিন্ন ভাবধারা মনন ও চিন্তনের মধ্যে একটি মানবতাভিত্তিক ঐক্যের সূত্র বর্তমান, তাহ'লে স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে একটি একাত্মবোধ জেগে উঠবে এবং তার ফলে পরস্পর বৈরীভাব বিদূরিত হবে, সংঘর্ষস্পৃহা লুপ্ত হবে এবং পরস্পরকে জানার ও বোঝার পথ সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু কে এনে দিতে পারে এই মনন ও চিন্তনের মধ্যে ঐক্যসূত্রের অনুভূতি? গ্রন্থাগারকে যদি এই আদর্শ রূপায়ণের যন্ত্র হিসাবে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে হয়ত এটা সম্ভব হ'তে পারে।

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দিক থেকেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বাধীন ভারতে আজ বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাবৈষম্য ও বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, আঞ্চলিক আনুগত্য ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যায় আজ ভারত জর্জরিত। মহাভারত আজ যেন বহু খণ্ডিত ভারতে পরিণত হ'তে চায়। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার চাই। ভারতকে

একসূত্রে বেঁধে রাখতে হ'লে চাই ঐক্যমন্ত্রে নবদীক্ষা। সেই দীক্ষা সম্ভব গ্রন্থাগারের সহায়তায়। ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তক-পত্রিকায় সাধারণের উপযোগী ক'রে যদি এই ঐক্যমন্ত্রের প্রচার করা হয় তাহলে অনেকটা সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। প্রতি গ্রামে চাই গ্রন্থাগার--সেই গ্রন্থাগারে থাকবে ভারতের ঐক্যমন্ত্রের গানে ভরপুর পুস্তক-পত্রিকা—সেই সব পুস্তক-পত্রিকা জনগণের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য ক'রে দিতে হবে। তার দ্বারা হবে অসাধ্য সাধন। আমাদের দেশের সরকার জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে যদি এই পথে অগ্রসর হন তাহলে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করা হয়ত সম্ভব।

আবার দেখি যে, বর্তমান ভারতে গণতন্ত্র প্রচলিত হ'য়েছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ভারতের বর্তমান স্বীকৃত আদর্শনীতি। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয় সাধন এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাজবাদের বিকাশ ও স্ফুরণ—ইহার মূল উদ্দেশ্য। সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের সঙ্কট দেখা দিয়েছে - বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে। গণতন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখতে হ'লে সমাজবাদের সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকের সহিত সমাজবাদের অর্থনৈতিক দিক মিশ্রিত ক'রে পরিপূর্ণ মানবসত্তার বিকাশের পথ সহজ ক'রে দিতে হবে। অর্থনৈতিক দাসত্বের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা কখনই কার্যকরী হয় না—আবার সমাজবাদের অথবা সাম্যবাদের রাজনৈতিক বেড়াজালের মধ্যে হয়ত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকতে পারে কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা লোপ পায়। তাই ভারত এই দুই আদর্শের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি নিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়াসী। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী ক'রতে হ'লে জনগণের মধ্যে এনে দিতে হবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ এবং সমাজবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। স্কুল কলেজের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই চেতনা ও ধারণা জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন ক'রে সেখানে এই সব বিষয়ে পুস্তক-পত্রিকা বহুল পরিমাণে সঞ্চয় ক'রে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে নূতন স্বাধীন ভারতের নব আদর্শের বাণী। এখানেও দেখা যায় গ্রন্থাগারগুলির নূতন ভারত সৃজনে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য র'য়েছে।

তাছাড়া আমাদের সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হ'য়েছে। সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন সেদিন হয়ে গেল। তাতে জনগণের রাজনৈতিক মন ও চেতনার যে ছবি প্রতিফলিত হ'য়েছে তাতে মনে হয় ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা আজ অনেক উন্নত আকার ধারণ করেছে। সেই উন্নত চেতনার অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের জন্য চাই শিক্ষা--সাধারণ জনশিক্ষা। সাধারণ জনশিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে কাজ ক'রতে পারে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার।

অবশ্য একথা সত্য যে, গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ক'রতে

হ'লে তার সঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমস্যা এসে যায়। আমার বিশ্বাস যে, বর্তমান ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলির উপর নূতন দায়িত্ব অর্পণ করার দিন এসেছে। আজ ভারতে কেবল যে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়েছে তা নয়, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণও ভারতের স্বীকৃত নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম। সেই নীতিকেও কার্যে রূপায়িত করা হ'চ্ছে। তার ফলে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং "পঞ্চায়েতি রাজ" চালু করা হয়েছে। এর পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর গ্রামভিত্তিক গণতন্ত্র গঠন আদর্শ। এই বিকেন্দ্রীকরণের এবং 'পঞ্চায়েতি রাজ' স্থাপনের উদ্দেশ্য হল জনগণকে সক্রিয় ও সচেতনভাবে গ্রামের শাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কাজে ও নীতিতে যুক্ত করে নেওয়া। তার ফলে তাদের মধ্যে সকল সময়ে গ্রামের ও দেশের কাজ ও নীতির সঙ্গে একটি একাত্মবোধ আসবে এবং সকল বিষয়ে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে। এই আদর্শ ও নীতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে এই দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা ও চেতনা আনতে হবে তবেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। জনগণ যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে তাহলে এইসব আদর্শ ও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়। এই শিক্ষা ও চেতনা জনগণের মধ্যে এনে দিতে পারে গ্রন্থাগার, যদি এ বিষয়ে সরকার কোন পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করেন।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও চেতনার প্রসার কি করে সম্ভব হতে পারে। নিরক্ষর যারা তারা ত' গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকা ব্যবহার করতে পারবে না। এমতাবস্থায় আমার মনে হয় যে, গ্রন্থাগারকে একটি নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রতি গ্রামে যদি সরকারের আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে হয়ত সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হতে পারে। ইহা অবশ্যই ব্যয়সাপেক্ষ ও পরিকল্পনা সাপেক্ষ। কিন্তু সরকারকে এ দায়িত্ব একদিন না একদিন গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষার প্রসার আমাদের সরকারের ঘোষিত নীতি। প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে এর সাথে নৈশবিদ্যালয় যুক্ত করার ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক-ভাবে চালু করা যেতে পারে। আর্থিক দায়িত্ব অবশ্য সরকারকে বহন করতে হবে এবং এই ব্যয় শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ ছাড়া গ্রন্থাগারগুলিকে আর একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা একটি গভীর ও জটিল সমস্যা। এই শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায় অনেক সময় বেকারত্বের বোঝায় বিভ্রান্ত হয়ে বিকৃত মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। তার ফলে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মহীনতা অনেক কুচিন্তার জনক। শিক্ষিত বেকার যারা গ্রামে বা সহরে রয়েছে

তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা জাগাতে হবে। গ্রন্থাগার যদি এইসব যুবকদের আকর্ষণ করতে পারে তাহলে তাদের মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে সৎপথে চালিত হতে পারে। তাদের মনন ও চিন্তনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে সৃজনমুখী পরিখায় বহমান হতে পারে। সেদিক থেকে আমার বিশ্বাস যে, গ্রন্থাগারগুলির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামে গ্রামে এবং সহরের প্রতি অঞ্চলে যদি সাধারণ পাঠাগার থাকে এবং সেখানে যদি আলোচনা, প্রদর্শনী, বিতর্ক ইত্যাদির নিয়মিত ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষিত বেকারগণ সেগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তার ফলে গ্রন্থাগারই হবে তাদের সময় অপনোদনের উপায় ও কেন্দ্রস্থল। এতে একদিক থেকে যেমন সামাজিক সমস্যা দূরীভূত হবে কারণ তাদের মনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে গ্রন্থাগার, অপরদিকে এইসব শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে আরও জ্ঞানের স্পৃহা জাগরিত হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লব্ধ শিক্ষার আরও প্রসার হবে অনুশীলনের মাধ্যমে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থাগারের এটি হল একটি বিশেষ উপযোগিতা। অনুশীলন ও চর্চার অভাবে সকল শিক্ষাই অকার্যকরী হয়ে যায়। সাক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে লব্ধ শিক্ষার অনুশীলন, উৎকর্ষ ও পরিণতির জন্য গ্রন্থাগার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতি গ্রামে এবং সহরের প্রতি অঞ্চলে গ্রন্থাগার হবে সান্ধ্য সম্মিলন কেন্দ্র—তাতে থাকবে পঠন, মনন ও চিন্তনের সুযোগ ও মানসিক উৎকর্ষের উপায়।

জনশিক্ষা ও জনচেতনা আজ সকল গণতান্ত্রিক দেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—এটা জাগ্রত মানব মনের চাহিদাও বটে। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে শিক্ষা এই প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে না। এর জন্য চাই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি মানব মনের পিপাসা মেটাতে পারে এবং মনকে প্রসারিত ও উন্নত করতে পারে। গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হলে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন—এর সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে নৈশ বিদ্যালয়, বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে চিত্র-প্রদর্শনী এবং মাঝে মাঝে সমাজের ও দেশের মূল সমস্যাগুলির ব্যাখ্যাগত সহজ সরল ভাষণ ও আলোচনা। আর সেই সঙ্গে সাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে আনতে হবে গ্রন্থাগার প্রবণতা।

গ্রন্থাগার প্রবণতা জনগণের মধ্যে আনয়ন করা কষ্টসাধ্য—কিন্তু কষ্টসাধ্য বলে সেদিকে সচেষ্ট বা প্রয়াসী না হওয়া কিন্তু একটি বিশেষ কর্তব্যচ্যুতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল তাৎপর্য লুপ্ত হবে যদি জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃষ্টি না করা যায়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। গ্রন্থাগার যদি ব্যবহৃত না হয় তাহলে গ্রন্থাগার স্থাপনের কোন অর্থই থাকে না। তাই গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃজন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবশ্যই অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কি ক'রে এই গ্রন্থাগার প্রবণতা আনা যায়? শিক্ষিত জনগণও অনেক সময় হাল্কা হাসি-গল্পে-ঠাট্টা-তামাসায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে হয়ত আনন্দ পায়—কিন্তু গ্রন্থাগারে পঠন,

আলোচনা ইত্যাদি ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে চায় না। জীবনে সময় বিশেষে ও ক্ষেত্রবিশেষে হাল্কা হাসি তামাসার অবশ্যই প্রয়োজন আছে—কিন্তু আধিক্য কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রন্থাগারে যেমন জটিল ও কঠিন বিষয়ক বস্তুও থাকবে, তেমন সহজ সরল হাল্কা আনন্দোদ্দীপক রচনাবলী ও বিষয়বস্তুও রাখতে হবে। এবং গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের কর্মচারীবৃন্দের একটি বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের স্থানীয় সামাজিক জীবন ও জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একটি নিবিড় ও অন্তরঙ্গতাপূর্ণ যোগসূত্র গঠন করতে হবে। গ্রন্থাগারের কর্মচারিবৃন্দ স্থানীয় জনগণের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করে,—আলোচনা, কথা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের কি গুণ, কি সুবিধা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবেন। তাছাড়া তাঁদের মনের চাহিদা ও গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে (অবশ্য সেটা যেন বিকৃত না হয়) তার উপযোগী পুস্তক-পত্রিকা গ্রন্থাগারে সঞ্চিত করতে হবে এবং সেই সব ব্যক্তিকে (অবশ্য যদি তারা সাক্ষর হয়) গ্রন্থাগারে এনে পাঠের মাধ্যমে আনন্দলাভের পথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কিছুদিন এইরূপ করতে পারলে তাঁদের মধ্যে গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে এবং পরে গ্রন্থাগার প্রবণতা তাঁদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। অব্যবহৃত গ্রন্থাগার হল মৃত গ্রন্থাগার, জীবন্ত গ্রন্থাগারের জীবনচাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিমাণে। ব্যবহারের পরিমান আবার নির্ভর করে ব্যবহার প্রবণতার উপর। তাই গ্রন্থাগার প্রবণতা জীবন্ত গ্রন্থাগারের জীবনগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এজন্য গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃজন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অঙ্গীভূত। যাঁরা এই আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করেন তাঁদের এই দায়িত্ব বহন করতেই হবে। অর্থাৎ তাঁদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হবে—তাঁদের সঙ্গে মানবীয় সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে—এক কথায় তাঁরা হবেন জনগণের শুভার্থী, পরিচালক ও বন্ধু।

এছাড়া গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃষ্টির আর একটি উপায় আছে বলে আমার মনে হয়। সেটি হল গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য পুরস্কারদান প্রথার প্রবর্তন। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারদান প্রথা প্রবর্তিত হ'য়েছে নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ কর্মীদের মর্যাদা ও উৎসাহ দান করার জন্য। আমার মনে হয় যে, যদি নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পুরস্কার প্রথা চালু করা হয় তাহলে প্রথমে পুরস্কারের লোভে অনেকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এবং পুরস্কারের আশায় অভ্যাস পরে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হবে। এই পুরস্কার প্রথাকে প্রকার ভেদে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বৎসরে গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিনসংখ্যার ভিত্তিতে পুরস্কার ঘোষিত হ'তে পারে। আবার কোন বিশেষ প্রকারের বা বিষয়ের পুস্তক, গ্রন্থ ও পত্রিকাদির ব্যবহার সংখ্যার ভিত্তিতে পুরস্কার নির্ধারিত হ'তে পারে। গ্রামে গ্রামে প্রতি গ্রন্থাগারে যদি এই নীতি স্বীকৃত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী কোন সভায়

যদি 'গ্রন্থাগার ব্যবহার পুরস্কার' প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে ঘোষিত হয় এবং তাঁদের পুরস্কার দান করা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—গ্রন্থাগার স্থাপনেরই অর্থ নেই, পুস্তকক্রয়ের শক্তি নেই তার ওপর কি করে পুরস্কার প্রথা প্রবর্তন করা যাবে। কিন্তু প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, এই পুরস্কার প্রথায় অর্থব্যয় হবে অতি সামান্য—পুরস্কার হবে প্রতীক—আসল জিনিস হ'ল পুরস্কারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসমক্ষে সম্মানদান। পুরস্কারের আর্থিক মূল্যের মোহে নয়—সম্মানের মোহে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা অবশ্যই বর্ধিত হবে। আর অর্থের প্রশ্ন যদি সত্যই বড় হয়ে ওঠে—, তাহলে সে প্রশ্নের সমাধান করবেন হয় কোন স্থানীয় গ্রন্থাগারানুরাগী ধনী ব্যক্তি অথবা সরকার। যেখানে গ্রন্থাগার প্রবণতার অভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেখানে পরীক্ষা মূলক ভাবে এই প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং আমার বিশ্বাস যে ইহার ফলে প্রায় মৃত অথবা অর্ধমৃত গ্রন্থাগার জীবন্ত গ্রন্থাগারে পরিণত হবে।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মচারীদের মৃদু ও সহায়তাপূর্ণ আচরণ গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃষ্টির অন্যতম উপায় মনে করি। এটা আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আমি গত বিংশ বৎসর ধরে পঠন ও গবেষণা কার্যাদি করেছি—এখনও ঐ গ্রন্থাগার প্রায় প্রত্যহ ব্যবহার করে থাকি। দিনের কর্তব্য গুলি সমাপণের পর গ্রন্থাগারে কয়েকঘণ্টা অতিবাহিত না করলে মনে যেন শান্তি পাই না। যদি কোন কারণে কয়েকদিন গ্রন্থাগারে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মনের মধ্যে একটা অভাববোধ জেগে ওঠে। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রতি এই আকর্ষণ কেবল গ্রন্থাদির জন্য নয়— আর একটা কারণ গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের সুমধুর আচরণ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারিগণ সকল সময় সকলভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে এই সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণা ও অধ্যাপনা বিষয়ক পঠনকার্যাদি বিভিন্নভাবে ব্যাহত হত এবং গ্রন্থাগারের প্রতি এই আকর্ষণ অনুভব করতাম না। গ্রন্থাগারিক, ও সহঃ গ্রন্থাগারিক থেকে আরম্ভ ক'রে সকল কর্মচারিবৃন্দ আমাকে সকল সময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন—যখনই কোন গ্রন্থ বা দলিলপত্রাদি অনুসন্ধানে কোন অসুবিধা হয়েছে তখনই সকলে এই অসুবিধা দূর করে দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান, এই প্রসঙ্গে আমি আমার কর্তব্য মনে করি। এবং এই সহযোগিতা ও মধুর আচরণের ফলে তাঁদের সকলকে আমার আত্মীয় বলে মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পঠন ও অবস্থান কালে আমার মনে হয় যেন আমি স্বগৃহে আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে কাজ করছি। এই যে বোধ—এই যে আকর্ষণ—এই যে অনুভূতি—গ্রন্থাগারের পাঠক হিসাবে আমার মনে জেগে ওঠে তার কারণ কেবল পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদির আহ্বান নয়—আরও কারণ হল কর্মচারিবৃন্দের সহযোগিতাপূর্ণ আত্মীয়

সদৃশ আচরণ এবং মনোগ্রাহী অনুকূল পরিবেশ। তাই আমার বিশ্বাস যে, পাঠক হিসাবে আমার বেলায় যেটা সত্য বলে অনুভূত হয়েছে সকল পাঠকের বেলায় এবং সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই সত্য প্রযোজ্য হতে পারে।

এটা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার কথা যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সব সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। পরিষদের জন্ম ইতিহাসে ও কার্যাবলীর তালিকা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘতর করতে চাই না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানবিদগণ এই সম্বন্ধে অবগত আছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তারিত ভাবে জানতে ইচ্ছুক তাঁরা পরিষদের বার্ষিক বিবরণী ও পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পাঠে সকল তথ্য জানতে পাবেন। নবরূপে সঞ্জীবিত পরিষদ ১৯৩৩ সালে তার কার্য আরম্ভ করে, যদিও ১৯২৫ সালে এই পরিষদের প্রথম জন্মক্ষণ। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থানপতন, আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে এই পরিষদ তার আপন আদর্শের রূপায়ণ উদ্দেশ্যে। একচতুঃত্রিংশ বৎসরের মধ্যে পরিষদের কার্যাবলী সত্যই প্রশংসনীয়। ১৯৩৩ সালে যে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১, ১৯৬৫ সালের শেষে তার মোট সভ্য সংখ্যা হয়েছে ১২৬৩। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, পুস্তকাদি প্রকাশন, বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশলাদি প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের কার্যাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যা এবং অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধার জন্য পরিষদ পূর্ণভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারছেন না। সভ্যবৃন্দের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতন ইহার অর্থের মূল উৎস। সরকারের কাছ থেকে মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য পরিষদ পেয়েছে। কিন্তু সমস্যার অনুপাতে এই পরিষদের অর্থ তহবিল অত্যন্ত অল্প—তাই বিভিন্ন দিক থেকে পরিষদের কর্মসূচীর রূপায়ণ ব্যাহত হচ্ছে।

আমার মনে হয় নিম্নলিখিত উপায়গুলি সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা সহায়তা করতে পারবে :—

(১) গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে সরকারকে ইহার প্রসারের ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে হবে। ইহার জন্য চাই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন। পরিষদ গত কয়েক বৎসর ধ'রে গ্রন্থাগার আইনের জন্য দাবী ক'রে আসচে—পরিষদের উদ্যোগে একটি বিলও তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সরকার আইন এখনও প্রণয়ন করেননি। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিষদ প্রকাশিত "কেন গ্রন্থাগার আইন চাই ?' এই পুস্তিকার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পরিষদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে হ'লে জনগণের সমর্থন চাই। বিভিন্ন অঞ্চল ও গ্রাম থেকে যদি জনগণ সরকারের কাছে গ্রন্থাগার আইনের দাবী জানায় তাহলে হয়ত সরকার সেই দাবী পূরণে তৎপর হবেন। এই আইনের উদ্দেশ্য হবে প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার

স্থাপন। পঞ্চায়েত আইন দ্বারা যেমন প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— অনুরূপভাবে গ্রন্থাগার আইন দ্বারা প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যদি প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তাহ'লে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই নীতিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব সরকারকে ঘোষণা ক'রতে হবে। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয়, গ্রন্থাগারিকদের বেতন ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারকে মূল দায়িত্ব নিতে হবে।

(২) সরকারের বাৎসরিক বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার বাবদ বরাদ্দ ব্যয় পৃথকভাবে উল্লিখিত ক'রতে হবে। এই ব্যয়ের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারিত ক'রে দিতে হবে আইনের দ্বারা অর্থাৎ Statutory Grant for Libraries এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর তার পরিমাণ প্রয়োজন হ'লে যাতে বৃদ্ধি করা যায় তারও যেন ব্যবস্থা থাকে।

(৩) সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের নিয়োগ সরকার ক'রবেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা এই প্রসঙ্গে সরকার অবশ্যই বিবেচনা করবেন। প্রয়োজন হ'লে এই নিয়োগ ব্যাপারে সরকার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রবেন।

(৪) প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সহিত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় যুক্ত ক'রতে হবে। বয়স্ক বয়স্কাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন হ'লে ইহার জন্য পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা ক'রতে হবে অথবা গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ যেন আকর্ষণীয় ও ক্রমবর্ধমান করা হয় এবং তাঁরা যাতে প্রকৃত মর্যাদা পান সেদিকেও দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(৬) গ্রন্থাগার ব্যবহারের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রথার প্রবর্তন ক'রতে হবে। তার উদ্দেশ্য হবে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃজন।

(৭) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য যেন কোন বিশেষ কর আরোপ করা না হয়। কোন বিশেষ কর বসান হ'লে কর ভারাক্রান্ত জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে পারে। অবশ্য স্থানীয় ধনী গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে এবং তাঁদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় মূলতঃ এতদিন গ্রন্থাগার উন্নয়ন সাধিত হয়ে এসেছে—আজ যখন স্বাধীন জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত তখন সরকারকে এই দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(৮) বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত সংযোগরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারী, বেসরকারী, সরকার সমর্থিত, সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত, গ্রামীণ, জেলা, কেন্দ্রীয় ইত্যাদি সকল প্রকার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যেন একটি যোগসূত্র থাকে।

বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক লাভ হতে পারে।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে গ্রন্থাগার ব্যাপারে আরও অর্থসাহায্য দাবী করতে হবে। অবশ্য এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার সমূহের ব্যাপারে তৎপর, সাধারণ গ্রন্থাগার সমস্যা ইহার আওতার মধ্যে আসে না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে, সর্বভারতীয় একটি গ্রন্থাগার কমিশন নিযুক্ত করার সময় হয়ত এসেছে। সেই কমিশন বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শন করে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুপারিশ করবে। কমপক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিশন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রাজ্যের উপযোগী গ্রন্থাগার প্রসার ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রন্থাগারের প্রতি সমাজের, সরকারের ও দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর নব রূপায়ণের দিন আজ উপস্থিত। গ্রন্থাগার আজ জনশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রন্থাগার নীতি সরকারকে গ্রহণ ক'রতে হবে এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করতে হবে। সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে গ্রন্থাগার নীতিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করতে হবে। অবশ্য বেসরকারী চেষ্টায় ও আগ্রহে গ্রন্থাগার আন্দোলন এতদিন অগ্রসর হয়ে এসেছে। সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও বেসরকারী আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় যেন কোন শিথিলতা না আসে। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৩ সালে ৩৬২০টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। তার পরেও হয়ত আরও কয়েকটি স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তাহলেও সমস্যার গভীরতা সহজেই অনুমেয়, যখন দেখি যে পশ্চিম বাংলায় মোট গ্রামের সংখ্যা হল ৩৮৫৩০ এবং আমাদের দাবী হল প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন। এখনই হয়ত এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব নয়। তবুও পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হবে হবে। গ্রন্থাগার আইনে যেন প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই নীতিকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থের অনটনের দোহাই দিয়ে গ্রন্থাগার প্রসার নীতিকে স্থগিত রাখা এখন আর সমীচীন নয়। সরকারের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন পরিষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা একসঙ্গে যুক্ত হলে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা আশা করি যে, পশ্চিম বাংলার নূতন সরকার এ বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে বাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করবেন।

Presidential Address :
By Dr. Subimal Kumar Mukherji—(Head of the Department, Political Science, Calcutta University.)

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। ২১-২৩ এপ্রিল, ১৯৬৭।

গত ২১শে এপ্রিল স্থানীয় শ্রীখণ্ড উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে বৈকাল ৫-৩০ টায় একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযাদব মুরলীধর মূলে। নির্ধারিত উদ্বোধক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে না পারায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটনও করেন শ্রী মূলে। প্রথমে স্থানীয় শিল্পী কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। সম্মেলনের নির্ধারিত সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়ে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

শ্রীমূলে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বহুদিন থেকেই তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি শ্রীখণ্ডের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। গ্রন্থাগারিকেরা নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী, সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচনেও তাঁরা ভুল করেন নি। তিনি যে সঠিকভাবে এই সম্মেলন পরিচালিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সঙ্গে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মীর নাম জড়িত।

জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে বরাবরই এই পরিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মিঃ চ্যাপম্যান থেকে এর শুরু। ১৯৩৩ সালে যখন খান বাহাদুর আসাদুল্লা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন তখন শ্রীমূলে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। এবারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আসতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। মিঃ চ্যাপম্যান থেকে যার শুরু এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রায় সকল গ্রন্থা-গারিকই এই মহান সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছেন—তিনিও আজ এখানে উপস্থিত হয়ে তার কর্তব্য পালন করতে পেরে আনন্দিত।

অতঃপর তিনি গ্রন্থাগার সহযোগিতা, আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক-বিনিময়, যৌথ সূচী প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পত্রিকা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির প্রশংসা করে বলেন যে, এই পত্রিকাটি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয়

সমূহ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে সম্প্রতি যে ইংরেজী সূচীপত্র দেওয়া হচ্ছে তার খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, দু'এক লাইনে প্রতিটি প্রবন্ধের যদি সারসংক্ষেপ এই সঙ্গে দেওয়া যায় তবে ভালো হয়। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কেও তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। পরিষদ প্রকাশিত পুস্তক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ করে তিনি বাণী বসুর 'বাংলা শিশু-সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী' বইটির কথা উল্লেখ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর তাঁর মুদ্রিত ভাষণটি পাঠ করেন [পূর্ণ ভাষণটি এই সংখ্যায় ছাপা হল]।

ইউ-এস-আই-এস লাইব্রেরীর ডিরেক্টর শ্রীমতী লোয়া ফ্ল্যানাগান তার ভাষণে বলেন, ইউ-এস-আই-এস গত ১৬ বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। গত ১৬ বছরে এই লাইব্রেরীর যত ডিরেক্টর এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের নানাবিধ শিক্ষামূলক কর্মধারার সাফল্যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, ১৯২৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিকে সম্মেলন কলকাতা শহরেই হয়েছে। তারপর এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য জেলায় জেলায় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৪৪ সালে একবার বর্ধমানে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল। এই ধরনের সম্মেলনের সার্থকতা এই যে, সম্মেলনে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং নতুন চিন্তাধারা জন্মলাভ করে। প্রতিবারই সম্মেলনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে—এবারেও বৃটিশ কাউন্সিল, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং নিজবালিয়ার সবুজ পাঠাগার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সবুজ পাঠাগারের প্রদর্শনীটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীগুলি পাঠ করেন।

পরিশেষে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান : ঐ দিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত শ্রীখণ্ডের স্থানীয় কীর্তনীয়া সম্প্রদায় কর্তৃক কীর্তন গান ও পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক তরজা গান সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

২২শে এপ্রিল। সকাল ৭-৩০ টা। সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এই অধিবেশনের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। আলোচনাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে মূল প্রবন্ধের

ওপর আলোচনা ও পরে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়। যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের পূর্বেই নাম-ঠিকানা লিখে সভাপতিকে দিতে তিনি অনুরোধ জানান।

মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনার মুখবন্ধরূপে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারণা সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। গ্রন্থাগার আজ শুধু অবসরবিনোদনের সঙ্গী নয়, পণ্ডিতের আশ্রয় মাত্র নয়, আজ জীবনের সর্বস্তরে গ্রন্থাগার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রন্থাগারের এই ব্যাপকতায় আজ গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থ সমাবেশ মাত্র নয়, গ্রন্থসম অন্য বস্তু দ্বারা নিরক্ষর ব্যক্তিদের পরম সহায়রূপেও গ্রন্থাগার দেখা দিয়েছে। আত্মশিক্ষাচর্চায় গ্রন্থাগার সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আত্মশিক্ষার সুযোগ না থাকলে সদ্য সাক্ষররা তাঁদের অধিগত বিদ্যা ভুলে যাবেন এবং বিপুল অপব্যয় হবে। আত্মিক শিক্ষা প্রসারের সুযোগদানে গ্রন্থাগারকে অগ্রসর হতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার অ ন্দোলনে পশ্চাৎপদ নয়। তবুও আমাদের দেশের নিরক্ষরতা মনে রেখে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় গ্রন্থাগারের দিক থেকে অনেকাংশে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু গ্রন্থা-গুলির অবস্থা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। জনমত গ্রন্থাগারমুখীন নয়। সরকারের বরাদ্দ টাকায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয়ক্ষমতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কি করা হয়েছে এবং আরো কি করা প্রয়োজন আমরা আজ তাই বিচার করব। শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর দেশবাসীকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হতে পারে না। শ্রব্য ও দৃশ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উপযোগী হতে পারে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারকে একাধারে কমিউনিটি সেণ্টার ও তথ্যকেন্দ্র করে তুলতে হবে। এজন্য একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকবেনা। সরকারী সকল কর্মতৎপরতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ থাকা চাই। জনসংযোগের অভাবে আমাদের পরিকল্পনাগুলি আরোপিত মাত্র হয়েছে, সাঙ্গীকৃত হয়নি। এক্ষেত্রে গ্রন্থা-গারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই প্রকাশিত না হলে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের একান্তভাবে যোগ রয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চলের লোক যাতে সহজে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায় তা দেখতে হবে।

অতঃপর প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা সম্পর্কে এবং সরকার থেকে গ্রন্থাগারগুলির প্রতি কতটা দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে আমার জানা নেই। গ্রামের বুনিয়াদি স্কুলগুলিতে সন্ধ্যা বেলায় গ্রন্থাগার ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। সরকারী প্রচার বিভাগ অনেক বিষয়ের ওপর দলিলচিত্র নির্মাণ করেছেন কিন্তু গ্রন্থাগারের ওপর দলিলচিত্র নির্মিত হলে এ বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রীশম্ভু চট্টোপাধ্যায় (চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির, শ্রীখণ্ড) মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি সুচিন্তিত নয়। এতে জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির গৌরবজনক অধ্যায়ের কথা অনুপস্থিত। আমি দেখেছি, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় জনগণ গভীর উৎসাহী—এই সব উদ্যোগের ছোট ছোট রূপায়ণকে সমন্বিত করতে হবে। এই সমন্বয় দপ্তরকেন্দ্রিক হবে না। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গ্রামীণ জনসাধারণের এই উৎসাহের কথা মনে রাখতে হবে। সমন্বয় অর্থ শিক্ষা, লোকশিক্ষা এমন কি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন। গ্রামের পাঠশালা, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতির যদি জনজীবনের সঙ্গে যোগ না থাকে তবে সমন্বয়ের কোন অথ হয় না। শুধু লাইব্রেরী ডিরেক্টরেট স্থাপনই যথেষ্ট নয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)—বৃটিশ আমলে শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে শাসক সম্প্রদায় চান নি। স্বাধীনতা পরবর্তী আমলেই প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ আমলে জনসাধারণের উদ্যোগ ছিল—জনসাধারণের চেষ্টায় স্কুল হয়েছে—গ্রন্থাগার হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রবণেক্ষণ শিক্ষার ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগী হতে হবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল (ক্রবসংহতি, বালসী, বাঁকুড়া) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রামের গ্রন্থাগারে তফাৎ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাঠক যায় নিজের তাগিদে, কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছেই যেতে হয় গ্রন্থাগারিককে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল গ্রন্থাগারের সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাকে বিস্তৃত করা উচিত। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ অসম্ভব।

শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) গত বিশ বছরে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এটা না হওয়ার বাধা কোথায় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন। তাছাড়া একটি সর্বাত্মক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এজন্য একটি লাইব্রেরী কমিশন বসানো দরকার।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক)—মূল প্রবন্ধে কোন চিন্তার দৈন্য রয়েছে বলে মনে করিনা। আলোচ্য গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে অর্থাভাব, অসমপরিচালন ব্যবস্থার জন্য উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

শ্রীসত্যব্রত সেন (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার)—সরকার পরিচালিত Social Education centre-cum-Library পরিচালনাব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশে বিস্তৃত ও স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল। D S E O, B D O প্রভৃতির গ্রন্থাগার পরিচালনায় কি ভূমিকা হওয়া উচিত তা ভেবে দেখা দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্য প্রশিক্ষণের কথা সুপারিশে বলা হয় নি। পৃথক লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট হওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বেরা (সারেঙ্গাবাদ, ২৪ পরগণা) গ্রন্থাগারগুলির তীব্র অর্থাভাব। নগণ্য সরকারী সাহায্য মেলে। লাইব্রেরীর ফাণ্ড স্বল্প। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের উন্নতি অসম্ভব।

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার') মূল প্রবন্ধের দৈন্য সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা যদি যথোপযুক্ত পরিসংখ্যান না দেন তবে এই দৈন্য থেকে যেতে বাধ্য। গত শ্যামপুর সম্মেলনে ঠিক হয়েছিল, প্রতি জেলার অন্ততঃ কিছু গ্রন্থাগারের এইরূপ পরিসংখ্যান ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে কিন্তু চিঠি লিখেও জেলা গ্রন্থাগারগুলির কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত পরিসংখ্যান না পেলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষেও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এজন্যই এই মূল প্রবন্ধেও দৈন্য রয়েছে দেখা যায়।

শ্রীবাণী বসু (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা) পূর্ববর্তী সম্মেলনেরই বিষয়বস্তু নিয়ে বর্তমান সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছে। জনগণের উৎসাহ স্বীকার করে নিয়ে সরকারী আনুকূল্যে কী লাভ হয়েছে ও আরও কি করা যেতে পারে তাই মূল প্রবন্ধের বিষয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গ্রন্থাগার প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—কেন না সকলেরই চাকরী-বাকরী আছে। গ্রামে যাঁরা আছেন তাঁরাই হবেন পরিষদের প্রতিনিধি। আর্থিক সমস্যা সর্বভারতীয় তাকে স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতে হবে।

শ্রীঅশ্বিনী সেন (সেমিনার লাইব্রেরী, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং) মূল প্রবন্ধে জনগণের চাওয়া ও উৎসাহ-উদ্যোগের স্পষ্ট ঘোষণা নেই। প্রবন্ধের মূল সুর সরকার এই করেন নি—সেই করেন নি। কিন্তু জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিভাবে কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে তার চিত্র স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীপ্রভাস চৌধুরী (হাইড রোড ইন্সটিটিউট ; খিদিরপুর) জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে পরিকল্পনাগুলি সফল হয়নি একথার বিরোধিতা করছি। পরিকল্পনাগুলি সমষ্টিকেন্দ্রিক, ব্যষ্টিমুখীন নয়, ফল ব্যর্থতা। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা-

ব্যবস্থা সমাজ কল্যাণমূলক নয় বলে কোন উন্নতি সম্ভব নয়। মূল প্রবন্ধে সরকারের কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু জনগণের সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করা হয়নি।

শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগারিক, মালদহ) বেসরকারী ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন প্রয়োজন, তাঁরা সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে নির্দিষ্ট সুপারিশ দেবেন। এ ব্যাপারে উদ্যোক্তা হবেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের একজন প্রতিনিধি পুরুলিয়ায় গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগদানের অপরাধে বরখাস্ত হয়েছেন, এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত।

শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত (জেলা গ্রন্থাগারিক, বিদ্যানগর)—প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতীত সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সফল হতে পারেনা। বর্তমানে লাইব্রেরী কমিটিগুলির সংগঠন যেভাবে হয়ে থাকে তাতে তা দলাদলির কেন্দ্র হয়ে পড়ে। জেলা, মহকুমা, গ্রামীণ ইত্যাদি গ্রন্থাগার সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। গোটা জিনিস পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা (administrative measure) গ্রহণ করা প্রয়োজন। এবং এই ব্যাপারটিকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)—বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলা যায়—সংস্কৃতিকে শ্রেণীগত বা বিশেষ কোন শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা ভুল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে বুর্জোয়া সংস্কৃতি বলে আমরা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারি না। গত বিশ বছরের ব্যর্থতার কারণ নিরক্ষরতা। গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র গ্রন্থভিত্তিক কাজকর্মে সীমাবদ্ধ না থেকে চিত্তাকর্ষকও হতে হবে। অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযোগসাধনমূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই। তদন্তকমিশন গঠন, সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি পূর্ববর্তী বক্তাদের প্রস্তাব সমর্থন করি। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলি যদি নিঃশুল্ক হয় তাহলে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাহায্যে উন্নতি সম্ভব।

এর পর মূল প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জবাবী ভাষণে বলেন, মূল প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কমিশন গঠনের সমর্থন করি। লাইব্রেরী-গুলি যাতে অধিকতর অর্থসাহায্য পায় তার জন্য আবেদন জানাতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি না হলে সরকারী সাহায্যের দরবার নিষ্ফল। গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্ত পরিসংখ্যান দিয়ে সহযোগিতা না করলে প্রবন্ধ সুচিন্তিত হতে পারে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারাকে আরও প্রসারিত করে দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প ট্রেনিং-এর পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। জেলায় জেলায় পরিষদের সদস্যরাই পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবেন।

প্রথম অধিবেশন। দ্বিতীয় পর্যায়। সময় ১০টা।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী আগামী ২৬শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে যে স্মারকলিপি দেওয়া হবে তা সভায় পাঠ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল যাবত সভা-সমিতি হয়েছে, স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে গ্রন্থাগারিক ছাড়াও সকল শ্রেণীর কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৬৪-র এপ্রিলে চলিত বেতনক্রমে সুরাহা হয়নি। চালু বেতনক্রমের অসামাঞ্জস্য রয়েছে। সার্ভিস রুল-এর প্রবর্তন প্রয়োজন।

সুপারিশ—(ক) ১) নোতুন বেতনক্রম (পুরুলিয়া সম্মেলনে গৃহীত) ২) গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মীদের মত সবরকম সুযোগ দান। ৩) স-বেতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। ৪) কর্মীদের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ। ৫) গ্রন্থাগার কমিটিগুলির পুনর্বিন্যাস। ৬) শীতকালীন ভাতা (খ) ইউ, জি, সি অধিকাংশ ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন তাঁদের সুপারিশ কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। স্পনসর্ড কলেজের সংগ্রহভিত্তিক বেতনক্রম অবৈজ্ঞানিক। প্রাইভেট কলেজের বেতনের হার সর্বত্র সমান নয়। গবর্ণমেণ্ট কলেজের সুখ সুবিধেয় তাঁরা বঞ্চিত। Prof-in-charge প্রধান হওয়া মর্যাদা হানিকর, অবিলম্বে দূর করা উচিত। অন্যান্য কর্মীদের নোতুন বেতনক্রম চালু করতে হবে। কলেজ কাউন্সিল-এর সভ্য হবেন গ্রন্থাগারিক। সিকিউরিটি প্রথা অযৌক্তিক। সরকারী অর্থবিভাগ এর বিপক্ষে। এই প্রথা প্রত্যাহৃত হোক।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতি স্কুলে চাই। শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক চাই। teacher-in-charge প্রথার অবসান চাই। বেতনক্রম শিক্ষকদের সমান হবে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। সন্তানদের শিক্ষা অবৈতনিক হবে।

আলোচনা—শ্রীঅমিয় কুমার সেন Security প্রথা সরকারী নীতি বিরোধী বলে মন্তব্য করেন।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য : প্রশিক্ষণে দীর্ঘসূত্রতা বর্জনীয়। সচেতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চাই। শিক্ষণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বছরে ২/১ জন ট্রেনিং-এর সুযোগ পান। আমার জেলায় ৩৮ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১২ জন ট্রেনিং পেয়েছেন।

শ্রীসত্যব্রত সেন (ক) স্কুলের প্রকৃত অবস্থার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। (খ) কমিটিগুলির পরিচালনাধীনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক গলদের অনুসন্ধান। ঘ) স্পনসর্ড লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য—'ঝ' প্রস্তাবে Advisory কমিটি হওয়া উচিত। 'ট' প্রস্তাবে জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক Inspector হবেন।

শ্রীঅরুণ গুপ্ত (সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর) 'খ' প্রস্তাবে বিদেশী পুস্তকের বাংলায় অনুবাদ যোগ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীঅমিয় সেনের বক্তব্য—

(১) কলেজ ও স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমান বেতনক্রম বাঞ্ছনীয়। (২) জেলা গ্রন্থাগারিকদের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের সমান মর্যাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। দায়িত্বের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক সমান একথা মেনে নেওয়া দরকার। (৩) ডেপুটেশন ভাতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। (৪) গ্রামীণ কর্মী মহিলাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতীতে Diploma ও Certificate Course প্রচলন বাঞ্ছনীয়। (৫) জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হবে। (৬) Cadre of Library Inspectors অভিজ্ঞদের নিয়ে সৃষ্টি হতে পারে।

২য় কার্যকরী অধিবেশন : সময় বৈকাল ৩ ঘটিকা

সভাপতি জানকীনাথ বসু।

'বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধটি পেশ করে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ বলেন, বাংলা বইয়ের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তা চলছে। তিনি প্রচুর তথ্য উদ্ধার করে দেখান, বাংলাদেশের বাইরে বাঙালীর বই, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকেদের বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলা দেশে লেখক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও, কেন ঠিকমত কাজ হচ্ছে না তা ভাবার কথা। তুলনায় কেরলের Southern Indian Book Trust এর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ে সাহায্য করার মত উপযুক্ত সংস্থা নেই। বৃত্তি বা জীবনের সঙ্গে যোগ নেই এমন বই কি করে বিক্রি হতে পারে তা ভাবা দরকার। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য সরকারী সাহায্য চাই।

আলোচনা :—

(১) শ্রীসৌরেন গাঙ্গুলী : Physical দিক—(ক) পুস্তক শিল্প দীর্ঘ দিনে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেও কিন্তু প্রকাশনের আদর্শ মান বজায় থাকে নি। অবশ্য 'নাভানা' ইত্যাদির প্রকাশনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশনের technical দিকগুলো সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা প্রয়োজন। (খ) Physical aspect এর কিছু norms থাকা উচিত। প্রচ্ছদ ওপর ওপর ভাল হলে চলবে না। Lay out, ভাল কাগজ, ভাঙা টাইপ না দেওয়া, প্রভৃতি দেখা উচিত। Index, glossary ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। (গ) Reading habit—রুচির ক্ষেত্রে আমাদের মান অনুন্নত। গল্প উপন্যাসের প্রকাশকই বেশী। পাঠ্য রুচি লঘুবিষয় কেন্দ্রিক। রুচির উন্নতি ব্যতিরেকে Serious বই প্রকাশ হবে না। ফলে Serious লেখা বন্ধ হবে। এর দায়িত্ব

প্রকাশকদের এবং গ্রন্থকারদের। (ঘ) সমীক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এর জন্য কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক দরকার। এজন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া উচিত।

(২) শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু: প্রবন্ধের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। (ক) উপহার হিসেবে পুস্তক অপ্রীতির কারণ বোধ হয় দ্বিত্ব হবার সম্ভাবনা। এর প্রতিকার প্রকাশকদের gift certificate বিক্রয়। (খ) Catalogue ও অন্যান্য information প্রকাশক ও গ্রন্থাগার পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। এজন্য সেমিনার করা প্রয়োজন।

(৩) শ্রীঅমিয় কুমার সেন: (ক) middle man হিসেবে পুস্তক বিক্রেতার ভূমিকা সম্পর্কে সমীক্ষা প্রয়োজন। তাহলে সম্ভবত মূল্যবৃদ্ধির কারণ নির্ণীত হতে পারে। বাংলাদেশে লেখক ৭১/২% কমিশন পান পুস্তক বিক্রেতা সেখানে ২৫% ও পান। (খ) সরকার পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ করেছেন তা না হলে বইয়ের দাম খুব বেশী হয়। দাম যুক্তিযুক্ত হলে জাতীয়করণ সঙ্গত হত না। (গ) জাতীয়করণে Reading habit একরকম হবার সম্ভাবনা। একবিষয়ের কতকগুলো বইয়ের মান সারা দেশেই একরকম হবার সম্ভাবনা। একবিষয়ের কতকগুলো বইয়ের মান নির্ণয় করে প্রকাশক সংস্থাকে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। (ঘ) ভাল বই ছাপার ব্যাপারে প্রকাশক অগ্রণী হলে সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী। রমেশচন্দ্রের 'ঋগ্বেদ' প্রকাশে সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু সাহায্য করার মত বই পাওয়া যায় না। এ খাতে বরাদ্দ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

(৪) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী: (ক) পুস্তক প্রদর্শনী — যাবতীয় প্রকাশিত বই বিষয়ানুযায়ী সাজিয়ে পরিমিত বিজ্ঞাপনযোগে, পর্যাপ্ত সাহায্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা (সরকার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প্রকাশক) করা দরকার। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে এ জিনিস হয়েছে। (খ) Indian Standard Institute প্রচারিত title page এর standard মেনে চললে (প্রকাশক) Catalogue এর সুবিধে হবে। অন্যান্য বিষয়েরও Standard থাকা উচিত। (গ) বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশনে প্রকাশক ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি দেওয়া। (ঘ) প্রকাশক প্রচারিত নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা আরও সুষ্ঠু ও annotated হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশক সংস্থা, রাজ্যসরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হোন। Bengali Books in Print নানা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাড়াও 'গ্রন্থাগার'-এ মাসিক Systematic List হিসাবে প্রকাশ করা উচিত। (ঙ) আমেরিকার "catologue in force" এর পরীক্ষা কার্যকরী না হলেও—ছাপার স্তরে থাকাকালীন cataloge এর যথাযথ একটি প্রতিলিপি বইয়ের পিছনে মুদ্রিত হলে সুবিধে হয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দোপাধ্যায়: (ক) প্রকাশকাল, সুনির্দিষ্ট চিহ্নাদি ছাড়াও উচ্চারণ নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহারে সমাধান। (খ) পাঠস্পৃহা বরাবরই কম। আচার্য রায়ের আমলেও এটা ছিল।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় : Minimum sale guarntee—বিভিন্ন বিষয়ের লেখক-গোষ্ঠী দ্বারা বই লিখিয়ে সেই বই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (প্রায় ৩৫০০ | ৪০০০ লাইব্রেরীর মধ্যে যদি ১০০০ | ২০০০ বইও বিক্রি হয়।) সরবরাহের আশ্বাসে ভাল বই বেরোবে। এককথায় ফরমায়েসী বই। প্রকাশক সমিতির নিকট প্রস্তাব রাখছি।

শ্রীজানকীনাথ বসু : (ক) Royalty, trade discount, প্রভৃতি : U. K., U. S. A. তে বই বিক্রী অনুসারে Royalty দেওয়া হয়। সেদেশে authors' contribution (economic responsibility) থাকে। এদেশে এখনও এটা চালু নয়। কেরলের মত Royalty, Trade discount দেওয়া সর্বত্র সম্ভব নয়। ছাপার মানের কথা তুললে আপনাদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ছাপা তো তৃতীয় শ্রেণীরও নিম্নে। (খ) Book Production—পুস্তক ব্যবসা সঙ্কটমুখীন। প্রকাশক সর্বত্র ব্যবসায়ী দৃষ্টি সম্পন্ন নন। Serious বই নেশার বশেও প্রকাশিত হয়। (গ) জাতীয়করণ—পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত nationalize হওয়ায় বিরাট ব্যবসা পুস্তক বিক্রেতার হাতছাড়া। অমিয়বাবুর মতে middlemenদের অবস্থা উন্নত এ তথ্য সত্য নয়। Board কিছু বই monopoly করেছে। এসব বই-এর বিক্রয়ভার সাধারণ মধ্যবিত্ত পুস্তক বিক্রেতার নয়। (ঘ) U. K, U. S. A অপেক্ষা আমাদের দেশে কাগজের দাম ৩০% বেশী। Printers' cost, binding cost বেশী হওয়ায় মূল্য হ্রাস সম্ভব নয়। (ঙ) E.L.B.S. এর পুস্তক ও অন্যান্য আমেরিকান বই বিশ্বের Underdeveloped country-তে ব্যবসা হালে বিস্তৃত করছে। PL 480-র মতই বেড়াজালে আমাদের বই শিল্প এতে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলা পুস্তকশিল্প বাঁচাতে হলে এইগুলো বন্ধ করা দরকার। Import বন্ধ করা দরকার নয় বটে তবে foreign intrusion in book trade বন্ধ হওয়া উচিত। মনোপলি ব্যবসার বই ধরাবার খরচ নেই। সরকারী বই ভুলে ভর্তি। তাছাড়া জাতীয়করণের বই ছাপা হয় free gift এর কাগজে। কম দামই পুস্তক শিল্পের একমাত্র বাঁচার উপায় নয়। কম দামে বিদেশী বই-এর প্রকাশনে চিন্তার স্বাধীনতা কিছু ক্ষেত্রে ব্যাহত হতে বাধ্য। প্রকাশন সমিতি সরকারের সাহায্য চান। না হলে জাতীয় সংস্কৃতি দেউলিয়া হয়ে যাবে। দিল্লীতে National Book Production-এর আগামী সভায় এ বিষয় উত্থাপিত হবে। বর্তমানের রুচি কালের গতিতে পরিবর্তিত হবে। Books in Print প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশক সংস্থা গ্রন্থাগার পরিষদের সকল প্রকার আন্দোলনে যোগদান দ্বারা পঠন-পাঠনের প্রসার ও পুস্তকশিল্পকে বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

শ্রীবাণী বসু : ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান : রাত্রে শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতির বালক-বালিকাদের নানাবিধ ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান ও স্থানীয় আদিবাসীদের বোলান নৃত্য প্রতিনিধি ও দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়।

সমাপ্তি অধিবেশন। ২৩শে এপ্রিল—সময় সকাল ৮টা।

ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(১) মূল প্রস্তাব শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় উত্থাপন করেন। সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। সমর্থন করেন—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) 'বাংলা বই: গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাব। প্রস্তাবক—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সমর্থন করেন—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) পুঁথিপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়। সমর্থন করেন—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

(৫) শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরের শ্রীশম্ভুনাথ চ্যাটার্জীর প্রস্তাব—শ্রীকৌমুদি ভূষণ ভট্টাচার্য উত্থাপন করেন। সমর্থন করেন শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সর্বশ্রী বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রমীলচন্দ্র বসু এই প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন। বিষয়টি কমিটিতে বিবেচনার জন্য শ্রীসত্যব্রত সেন একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। মূল প্রস্তাবক সংশোধনটি সমর্থন করেন।

সভাপতির বিদায়ী ভাষণ ঃ সভাপতি বলেন, বিদায়ের সময় স্বভাবতঃই ব্যথার সঞ্চার হয়। আমি সর্বভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকেছি। সেখানেও ১৫০ থেকে ২০০ প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিনিধির সংখ্যা দেখে আমি আশান্বিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমি পেলাম সম্মেলনে এসে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার যদি সুযোগ পাই তবে সৌভাগ্য বলে মনে করব। গ্রামীণ, জেলা বা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রকৃত চেহারা কি—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেটা তুলে ধরেছেন। প্রতি গ্রামে বা প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে যে সব গ্রন্থাগারিক আছেন তাঁরা প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে এসে আলোচনা করুন, সরকার অবহিত হোন। মাত্র ২ দিনের জন্য অবস্থান, কিন্তু এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। উদ্যোক্তারা আন্তরিকভাবে সম্মেলন আহ্বান করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শেষ প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হল এতে ভালই হল—অনেক সময় আগামী অধিবেশন সম্পর্কে ঘোষণা করায় অসুবিধা হয়, অর্থসমস্যা রয়েছে। শুধু গ্রন্থাগারকে নিয়ে সম্মেলন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ করে ছাত্ররা, শিল্পীরা, এখানকার অধিবাসীরা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি :

সভাপতি মহাশয়ের সান্নিধ্যে প্রতিটি গ্রামবাসী ধন্য হয়েছে। আপনারা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করেছেন। এখানে এই সম্মেলন হয়েছে বলে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এই প্রসঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে একটি কথার অবতারণা করছি। গ্রামে সম্মেলন করার ব্যবস্থা সুন্দর, কিন্তু গ্রামের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান না হলে সম্মেলন কতদূর সফল হবে সন্দেহ। গ্রামের অধিবাসী-দের সমস্যাগুলির জন্য আলোচনার জন্য যদি কিছু সময় সম্মেলনে রাখেন তবে ভাল হয়। এই সম্মেলনে শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরও সহযোগিতা করেছেন। আমাদের মধ্যে তাঁরাও রয়েছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এক'দিনের সম্মেলনে আমরা সকলে একাত্ম হয়ে গেছি, ধন্যবাদ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ার রীতি আছে। বিদায় নেওয়ার সময়ে স্থানীয় সকলের সহযোগিতার কথা বারবার মনে হচ্ছে। বাড়ীতে যেসব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তা সম্মেলনে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু মনে হয়েছে আমরা বাড়ীতেই আছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের নিরলস তত্ত্বাবধানে মুগ্ধ হয়েছি। অভ্যর্থনা সমিতির সকল সভ্যদেরও ধন্যবাদ। শ্রীখণ্ডের স্কুলের কর্তৃপক্ষ সম্মেলন চলা কালে সাজসজ্জার বিপর্যয় ঘটিয়ে যে এই সম্মেলন হতে দিয়েছেন তাতে তাঁদের কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে। সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্থানীয় পাঠ্যমন্দির তাঁদের আতিথ্য, গ্রন্থাগারে নিয়ে গিয় দেখানো,—সৌজন্য, সত্যই উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি, শ্রীখণ্ডের অধিবাসীরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা—প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

ক'দিন তো আনন্দ অনুভব করেছি একটু ব্যতিক্রম হয়েছে এখানকার পাঠ্য-মন্দিরের প্রস্তাবে ; কিন্তু মতান্তর হলেই মনান্তর হবে এমন কোন কথা নেই।

পুস্তক প্রকাশন সমিতির সম্পাদক, যে সকল প্রকাশকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাছাড়া যাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন—বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি, বৃটিশ কাউন্সিল, নিজবালিয়া সবুজ পাঠাগার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় যে নানাকাজ থাকা সত্ত্বেও এ তিনদিন এখানে কাটিয়ে গেলেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি একনিষ্ঠ গ্রন্থাগার অনুরাগী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর একবিংশ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

21st Bengal Library Conference :
Brief Report.

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব

বর্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ২১-২৩শে এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার-গুলির অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করিতেছে। এই প্রস্তাব-সমূহ কার্যকরী করিবার জন্য এই সম্মেলন রাজ্যসরকার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার-কর্মী এবং শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে।

১১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পর্কিত

(ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে এই রাজ্যের অন্যরাজ্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়া, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানকে অগ্রাধিকার দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

(খ) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগার,, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, সমাজসেবী প্রত্যেককে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই কার্যক্রমে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরণের পাঠের ও তথ্যের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও সদ্য সাক্ষরদের শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্বও গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলিকে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহারের দায়িত্ব ও সর্ববিধ সাহায্যের ব্যবস্থা রাজ্যসরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সম্মেলন মনে করে যে, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্যাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(গ) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সদ্য সাক্ষরদের চাহিদা পূরণের জন্য নানাবিধ পুস্তক এবং পত্রপত্রিকাদি প্রকাশনের এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে গ্রহন করিতে হইবে।

(ঘ) বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পাঠ চাহিদা পূরণের জন্য উক্ত বিভিন্ন বৃত্তিভিত্তিক পুস্তকাদি স্বল্পমূল্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশের—, বিদেশী পুস্তকের বাংলা ভাষায় অনুবাদের এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দানের এক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, গ্রন্থাগার পরিষদ, লেখক সম্প্রদায় এবং গ্রন্থাগারগুলিকে যুগ্মভাবে গ্রহণ করিয়া উহা সার্থক করিতে হইবে।

(ঙ) এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্থক সংগঠন, পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অধিকর্তার অধীনে একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সব গ্রন্থাগারকে এই ডাইরেক্টরেটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন

করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় এই গ্রন্থাগারগুলিকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তাধীন করা জনস্বার্থের অনুকূল হইবে না।

(চ) জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষণ, সমুন্নতি, সংযোগ রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমুন্নতির স্বার্থে এই সমস্ত জেলা পরিষদগুলিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সমন্বিত করিতে হইবে।

(ছ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কোনরূপ চাঁদা বা টাকা জমা লওয়া অনুচিত। এই সব গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী অর্থসাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ইহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার করিতে হইবে।

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় একই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই কমিটিগুলি পরামর্শদাতা কমিটি হিসাবে কাজ করিবে। প্রতি স্তরে গ্রন্থাগার কমিটিগুলির সভ্য-সম্পাদক থাকিবেন সেই স্তরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক।

(ঝ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সর্বনিম্নে রাখিয়া এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ পিরামিডের ন্যায় কাঠামো গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এইরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য অবিলম্বে যথোচিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঞ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মী ব্যতীত অন্য কাহারও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের অধিকার থাকা উচিত নহে। সুতরাং গ্রামসেবক—গ্রামসেবিকা, সমাজ শিক্ষা সংগঠক এবং মহিলা সমাজশিক্ষা সংগঠকদের দ্বারা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের যে নির্দেশ পুরুলিয়া জিলার সমাজশিক্ষা অধিকর্তা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(ট) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হওয়া উচিত।

১। প্রতিটি পৌর ও মহকুমা শহরে একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

২। প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৩। ২৫০০র অধিক জনসংখ্যা সম্বলিত গ্রামে একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৪। কলিকাতা শহরের জন্য কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারকে শীর্ষে এবং একশত ওয়ার্ড গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে লইয়া একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

ঠ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমীক্ষা করিয়া ইহার যথোচিত সমুন্নতির অভাবের কারণ ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগের উপযোগিতা অনুভব করিতেছে এবং সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই বিষয়ে আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

ড) গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোনরূপ পৌনঃপুনিক অর্থের বরাদ্দ করা হয় নাই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া প্রতি গ্রন্থাগারে অন্তত: ৬০০৲ বার্ষিক গ্রন্থ ক্রয় বাবদ বরাদ্দ করিতে এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

ঢ) জিলা গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য। এই সম্মেলন সরকারকে জিলা গ্রন্থাগার সহ সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকে অধিকতর আর্থিক সাহায্য দিবার অনুরোধ জানাইতেছে।

ণ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য দাবী সম্পর্কে যে স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছে তাহা এই সম্মেলন অনুমোদন করিতেছে এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

ত) যতদিন পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করা না যাইতেছে ততদিন পর্যন্ত বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করিয়া যাইতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই গ্রন্থাগার-গুলিকে ক্রমান্বয়ে সরকার প্রবর্তিত বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যাহাতে আনা যায়।

থ) পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২ গ্রন্থাগার কর্মিগণ সম্পর্কিত

ক) দেশের শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে, গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ও আদর্শরক্ষার কাজে নিরক্ষরতাবিরোধী অভিযানে এবং ব্যক্তি ও সমাজের আর্থিক ও বৈষয়িক সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিকতর সচেতন হইতে হইবে। আরও কর্তব্যনিষ্ঠ ও যোগ্য হইতে হইবে। ইহাতে শুধু গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই আসিবে না। সমাজের আকৃতিও পরি-বর্তিত হইয়া যাইবে।

খ) গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের মধ্যে আরও সহযোগিতা মূলক কার্যক্রম যথা যৌথসূচী নির্মাণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পুস্তকের লেন-দেন। আলোচনা-চক্র, সভা-সম্মেলন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠনে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) গ্রন্থাগারগুলিতে অবিলম্বে এই সব কার্যক্রম গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইবে—

১। তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা।

২। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য পুস্তক নির্বাচন।

৩। সদ্য সাক্ষরদের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করা।

৪। পোষ্টার ও চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থ প্রদর্শনী, বিভিন্ন স্মরণীয় দিবস পালন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে আরও অধিক জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

৫। গ্রন্থাগারকে আরও অধিক সময় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলিয়া রাখা।

৬। স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজজীবন ও অর্থনীতির পর্যালোচনা করা এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক ও তথ্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭। নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষামূলক বিনোদনের উদ্যোগে সাহায্য করা।

৮। পুস্তক ও পত্রপত্রিকা পাঠের জন্য পৃথক পাঠকক্ষের বন্দোবস্ত করা।

৯। শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা।

১০। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা ও বৃত্তিভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

১১। সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত উদ্যোগে প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

১৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কিত

(ক) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম যথাযথভাবে চলিতেছে কিনা তাহা পর্যালোচনা ও নির্দেশ দানের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার জন্য পরিষদকে একটি পৃথক তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিতে হইবে। রাজ্য সরকারকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারাও যেন এইসব সংগঠনের নিকট হইতে পরামর্শ ও বিভিন্ন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন।

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুপরিচালনার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সার্থকরূপ দিবার জন্য রাজ্য সরকারকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আরও অধিক পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।

(ঘ) রাজ্যের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো কিরূপ হওয়া উচিত তাহা পর্যালোচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে একটি বিশেষ সম্মেলন অবিলম্বে ডাকিতে হইবে।

(ঙ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীকে আরও ফলপ্রসূ করিবার জন্য এই রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন (১) সকলে গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন (২) পরিষদের প্রয়োজনমত আপন আপন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করেন এবং (৩) আপন আপন অঞ্চলে পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়া যান।

২ ॥ বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রস্তাব ॥

১। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা এবং অন্যান্য দাবী সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করিতেছে। এই সম্মেলন এই স্মারকলিপি কার্যকরী করিবার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন সঙ্গে সঙ্গে স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত সব দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

২। এই সম্মেলন বিগত রাজ্য পে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার পুস্তক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের জন্য যে অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক নীতি স্থির করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত জ্ঞান, দায়িত্ব, গ্রন্থাগারের প্রকৃতি, আয়তন ও কার্যধারা প্রভৃতি নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩। এই সম্মেলন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট যে সিকিওরিটি ডিপোজিট গ্রহণের প্রথা আছে তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন এই প্রসঙ্গে ভারতসরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির একটি সুপারিশ এবং ভারত সরকারের অর্থবিভাগের একটি নির্দেশনামার প্রতি রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই সব সুপারিশ ও সার্কুলারে গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে কোন সিকিউরিটি ডিপোজিটের প্রয়োজন নাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। এই সম্মেলন মনে করে যে, কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যদি না থাকে যে গ্রন্থাগারিকের অবহেলার জন্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থ হারাইয়াছে, তাহা হইলে গ্রন্থ হারাইয়া যাওয়ার জন্য গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা সমীচীন নয়।

৫। এই সম্মেলন মনে করে যে, সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন সরাসরি তাঁহাদের নামেই প্রেরণ করা উচিত।

৬। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে গ্রামীণ, মহকুমা, সহর প্রভৃতি গ্রন্থাগার-গুলির পরিদর্শনের ও তত্ত্বাবধানের অধিকার জেলা গ্রন্থাগারিককে দেওয়া হউক। এবং এই পরিদর্শনের জন্য যাতায়াতের খরচাদির বন্দোবস্ত সরকারের তহবিল হইতে করা হউক।

৭। এই সম্মেলন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের শিক্ষণের দ্রুত বন্দোবস্ত করিবার দাবী জানাইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য শিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মীদের সবেতন ডেপুটেশনে প্রেরণের দাবী জানাইতেছে।

৩ ॥ বাংলা পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কিত প্রস্তাব ॥

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাংলাদেশের প্রকাশক ও গ্রন্থকারদের নিকট অনুরোধ করিতেছে যে—

(১) তাঁহারা যেন গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাংলাগ্রন্থে পরিবেশন করেন।

(২) বাংলা বইয়ের আখ্যাপৃষ্ঠার সম্মুখপাতার বা আখ্যাপৃষ্ঠার অপর পার্শ্বে বইয়ের, লেখকের ও প্রকাশকের নাম, বইয়ের বিষয়, প্রকাশকাল ও মূল্য রোমান হরফে ইংরাজী ভাষায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত হউক।

(৩) বিষয় ও আকার নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বাংলা বই বাঁধাবার যে রীতি আছে, তার পরিবর্তে 'পেপার ব্যাক' গ্রন্থপ্রকাশনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) এই সম্মেলন কিভাবে অল্পমূল্যে সুমুদ্রিত বাংলা বই পাঠকদের দেওয়া যায়, এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তার জন্য বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং লেখক সমবায় সমিতির এক যৌথ অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করা হউক—বলিয়া দাবী করিতেছে।

(৫) এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প এবং বাংলা-ভাষার পাঠকদের পাঠরুচি বিষয়ে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে উপরের তিনটি পরিষদ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ও বঙ্গীয় লেখক সমবায় সমিতি) সম্মিলিতভাবে এই সমীক্ষা করুন।

৪ ॥ দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি, পুঁথি প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাব ॥

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে, আর্থিক সঙ্গতির অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন দলিল এবং পুস্তকাদি বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। এর ফলে বাংলা দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতীয় সম্পত্তির যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইতে হয়।

এই অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক সংরক্ষণ কেন্দ্র (Centralised Preservation Unit) স্থাপিত হউক। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য এবং অমূল্য পুস্তকাদি সংরক্ষণে সক্রিয় সংহায্য এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ লাভ করিতে পারবেন।

Recommendations of the Conference.

যাঁরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন—

স্বদেশ

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রধান মন্ত্রী।

২। শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য, উপাচার্য, বিশ্বভারতী।

৩। শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। শ্রী জে. এন. মল্লিক, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ্।

৫। শ্রী জি. বি. ঘোষ, অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক, ইয়াসলিক।

৬। শ্রী টি. কে. ঘোষ, সম্পাদক, অমৃত বাজার পত্রিকা।

৭। শ্রী বি, মালিক, উপাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। শ্রী ডাঃ জে. এন. মুখার্জী, ১০, পূরণচাঁদ নাহার এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

৯। শ্রী এস. আর রঙ্গনাথন্, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক।

১০। শ্রী এস্. বসিরুদ্দিন, গ্রন্থাগারিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

১১। শ্রীশোহন সিং, সভাপতি, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, নিউ দিল্লী।

১২। সাধারণ সম্পাদক, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সজ্ঘ।

১৩। শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জী, স্পীকার, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা।

১৪। শ্রী এন. সি. চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, অর্থমন্ত্রক, গ্রন্থাগার ও প্রকাশন বিভাগ, নিউদিল্লী।

১৫। শ্রী এ. পি. ত্রিপাঠী, সাধারণ সম্পাদক, ইউ, পি, লাইব্রেরী এসোসিয়েসন।

১৬। সাধারণ সম্পাদক, কেরালা গ্রন্থশালা সজ্ঘম।

১৭। ডিরেক্টর, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।

১৮। শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯। শ্রী বি বি মিশ্র, ইনসডক, নয়াদিল্লী।

বিদেশ

১। সি ভি. পেন্না, চীফ্ ডিভিশন অব ডেভেলপমেণ্ট অফ ডকুমেনটেশন লাইব্রেরী অ্যাণ্ড আরকাইভস সার্ভিসেস, ইউনেস্কো, প্যারিস।

২। এল, কুইনসি মামফোর্ড, লাইব্রেরীয়ান, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, ওয়াশিংটন।

৩। ডেপুটি ডাইরেক্টর, ষ্টেট অর্ডার লেনিন লাইব্রেরী, মস্কো, ইউ. এস. এস. আর।

৪। টমাস আর বুকম্যান, ডিরেক্টর, ইণ্টার ন্যাশনাল রিলেশনস অফিস, আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন।

৫। এফ, ই, ম্যাককেনা, প্রেসিডেণ্ট স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক।

৬। ডেভিড. এইচ. ক্লিফট, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টার, আমেরিকান লাইব্রেরীয়ান এসোসিয়েসন।

MESSAGES Received From
Individuals & Institutions

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা ঃ

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী—জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২৯ চৌরঙ্গী রোড, কলিঃ ১৬

অজিত কুমার ঘোষ—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ২৭

অজিত দাস—৫নং কম্বলিয়াটোলা লেন, কলিঃ ৫

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ, বোলপুর, বীরভূম

অর্ধেন্দু ঘোষ—ত্রিপুরাপুর, হাওড়া

অনাথ শরণ মুখোপাধ্যায়—লোকপাড়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী, কুলিয়াড়া, বীরভূম

অনিল কুমার দত্ত—হুগলী জেলা গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া

অনিল কুমার দেয়াসী—আমতা পাবলিক লাইব্রেরী, আমতা, হাওড়া

অনিল ঘোষ—বাণীমন্দির, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ

অবধূত কুমার সরকার—খয়রাশোল মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পোঃ+গ্রাঃ খয়রাশোল, বীরভূম।

অমর আচার্য— বাপুজীনগর সংঘ, যাদবপুর, কলিঃ ৩২

অমরেন্দ্র নাথ দাস— ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী, হুগলী

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়— ঘুরিয়া নির্মল সংঘ সাধারণ পাঠাগার, ঘুরিয়া, বীরভূম

অমলাংশু সেনগুপ্ত—২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর

অমিতা মিত্র—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ৩২

অমিতাভ বসু—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ৫৬

অমিয়ভূষণ রায়—পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১

অরুণকুমার গুপ্ত—সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দুর্গাপুর ৯

অরুণ কুমার দে—দুবরাজপুর রুর‍্যাল লাইব্রেরী, দুবরাজপুর, বীরভূম

অরুণ কুমার রায়—বি।১, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ, কলিঃ ৩২

অশ্বিনী কুমার বেরা—সারঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা

অশ্বিনী সেন—১৭নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি ৯

আশিস সেন—বাণীপুর, ২৪ পরগণা

উমানাথ ভট্টাচার্য—ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার, ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান

কমলাকান্ত কুমার, শেওড়াফুলি, হুগলী

কার্তিক সাহা—সি, আর, এল ; আই, এন, বি, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি ২৭

কালী প্রসাদ চন্দ—চাংরাবান্ধা ক্লাব লাইব্রেরী, চাংরাবান্ধা, কোচবিহার

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়—সি, আই, টি., ব্লক : ৭, ফ্ল্যাট : ৩৫, কলি ৫৪

কৌমুদিভূষণ ভট্টাচার্য—চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান

ক্ষেত্রনাথ দত্ত— বনকাপাসী সাধারণ গ্রন্থাগার, বনকাপাসী, বর্ধমান

গীতা মিত্র—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ৩২

গীতা ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা, কলিকাতা
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১এ, কলেজ রো, কলি ৯
গুরুশরণ দাশগুপ্ত—৬২ ফিডার রোড, বেলঘরিয়া কলি ৫৬
গোপালচন্দ্র পাল—ধ্রুব সংহতি, বালসী, বাঁকুড়া
গোপাল নারায়ণ চৌধুরী—জয়গঙ্গাস্মৃতি পল্লী পাঠাগার, ভদ্রকালী, হুগলী
গোপী হালদার—নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা
গোপীনাথ রায়—মাধব স্মৃতি পাঠাগার, ১৮ সালিখা স্কুল রোড, হাওড়া
গোবিন্দলাল মল্লিক—কানাই স্মৃতি পাঠাগার, কলি ৬
গোলকেশ মজুমদার—ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী হুগলী
চঞ্চল কুমার সেন—৩৩বি কালীঘাট রোড, কলিঃ ২৫
চন্দ্রনাথ মল্লিক—কানাই স্মৃতি পাঠাগার, ৩৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি ৬
চিত্তরঞ্জন মণ্ডল—রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, আমতলা, মুর্শিদাবাদ
জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়—প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
জয়দেব কুমার শোঁ—মগরা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী
জয়শংকর মুখোপাধ্যায়—ঘুরিয়া নির্মল মিলন সংঘ পাঠাগার, ঘুরিয়া, বীরভূম
জীতেন্দ্রনাথ চাঁই—নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা
জ্যোতি বসাক—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৫৬
তপন কুমার সরকার—৩৩নং তালপুকুর রোড, কলি ১০
তপন কুমার সেনগুপ্ত—ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, কলিকাতা
তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
তুষার সান্যাল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২
দিলীপ কুমার দত্ত—রবীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৮২ সুরেশ সরকার রোড, কলি ১৪
দিলীপ কুমার মিত্র—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি : ২৭
দিলীপ কুমার বসু—১।২এ বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলি ১৯
দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি ৩২
দীপক চন্দ্র দত্ত—আমতা পীতাম্বর হাইস্কুল; আমতা, হাওড়া
দাশরথি ভট্টাচার্য—আশুতোষ স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রাঃ জীরাট, হুগলী
দেবীমোহন গাঙ্গুলী—১০০/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা ৪
দেবেশ চন্দ্র রায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিঃ ৩২
দেবেশ্বর সাহা—১১বি, মোহনলাল মিত্র লেন, কলিঃ ৪
ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় যাদুঘর, কলিকাতা ১৬
নকুলচন্দ্র মণ্ডল—রহড়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, মুর্শিদাবাদ
নচিকেতা মুখোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ২৭

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা

নন্দলাল সাহা—সাঁইথিয়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী, সাঁইথিয়া, বীরভূম
নারায়ণ চন্দ্র দে—বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার, বর্ধমান
নারায়ণ চন্দ্র সাধু—মালোপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
নিতাইচাঁদ ঘোষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ১২
নির্মল চন্দ্র পোদ্দার—বাপুজীনগর প্রগতি সংঘ, যাদবপুর, কলিঃ ৩২
নির্মলচন্দ্র সান্যাল—পল্লীভবন সুভাষপল্লী, চন্দননগর, হুগলী
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা-১২
নৃসিংহ কুমার ঘোষ—প্রসন্ন কুমার মেমোরিয়াল লইব্রেরী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পাঁচকড়ি নাথ—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু সায়ার রোড, হাওড়া
পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাণী লাইব্রেরী, চুড়পুণী, বর্ধমান
প্রকাশ শংকর চৌধুরী—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা
প্রণত কুমার মুখোপাধ্যায়—গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরী, পুরুলিয়া,
প্রণব কুমার কুণ্ডু—জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ
প্রণব কুমার বক্সী—গুসকরা গ্রামীণ পাঠাগার, গুসকরা. বর্ধমান
প্রণবানন্দ জানা—১৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি ২০
প্রণয় কুমার পাল—জিতপুর পাবলিক লাইব্রেরী, জিতপুর, মুর্শিদাবাদ
প্রবীর রায়চৌধুরী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২
প্রবোধ কুমার দত্ত—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু সায়ার রোড, হাওড়া
প্রভাতকুমার ঘোষ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী
প্রমথনাথ সাহা- বাণী লাইব্রেরী, চুড়পুণী, বর্ধমান
প্রমীলচন্দ্র বসু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ১২
প্রাণগোপাল দত্ত—৩৭২/৫এ রসা রোড (সাউথ), কলি ৩৩
বঙ্কিম চ্যাটার্জী—জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন (বালকাশ্রম), ২৪ পরগণা
বাণী বসু—৩/এ ফরডাইস লেন, কলি ১৪
বাসুদেব লাহিড়ী—বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, কলিকাতা
বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ১২
বিমলকুমার বিশ্বাস—মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান
বিমলকুমার মাইতি—সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া
বিমলকুমার মিত্র—নর্থ ইন্টালী কমলা লাইব্রেরী, ৬ পামারবাজার রোড, কলি ১৫
বিশ্বনাথ কোলে—পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পুরুলিয়া শাখা।
বিশ্বনাথ ঘোষ—ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন যাদবপুর
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা

বিশ্বনাথ হালদার—কাশীরাম দাস পাঠাগার, সিঙ্গি, বর্ধমান

বিষ্ণু নারায়ণ পাল—মেমারী মিলন সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, মেমারী, বর্ধমান

বীণা সেনগুপ্ত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

বীরেন্দ্রনাথ দাস—৪/১বি, রাধাপ্রসাদ লেন, কলি ৯

বৈদ্যনাথ মাইতি—কলিকাতা

ব্রজদুলাল গোস্বামী—নিমতিতা মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

ভবানী প্রসাদ চন্দ্র—কাটোয়া আনন্দসংঘ লাইব্রেরী, কাটোয়া, বর্ধমান

ভবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আশুতোষ স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রাঃ জীরাট, হুগলী

ভারতী গাঙ্গুলী, ১০০।১ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলি ৪

মঙ্গলাপ্রসাদ সিন্‌হা—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ

মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—১৭ বোড়ালপাড়া লেন, কলি ৩৬

মদন আঢ্য—পুড়শূরা কিশোর গ্রন্থাগার, পুড়শূরা, হুগলী

মনোজকুমার ঘোষ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কলি ৩২

মনোরঞ্জন পাল—ভেটাগুড়ি, কোচবিহার

মানবমোহন মিত্র—সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া

মানবেন্দ্র মজুমদার—রবীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৮২ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি ১৪

মিহিরকুমার রায়—দক্ষিণগ্রাম, বীরভূম

মোহিনীমোহন দাস ঠাকুর—জ্ঞানদাস আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কান্দরা, বর্ধমান

মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়—দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, হাওড়া

রবীন্দ্রনাথ দাস—রবীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৮২ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি ১৪

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত—কলিকাতা

রমাপদ চক্রবর্তী—বান্ধব পাঠাগার, সারঙ্গাবাদ, ২৪ পরগণা

রমেন্দ্রমোহন দে—পি. ভি. এন. এন, লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী, কুচবিহার

রমেশচন্দ্র দেবনাথ—পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, গ্রাঃ ছোট বোয়ালমারী, পোঃ পেটলা, কুচবিহার

রাধানাথ রায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

রামকৃষ্ণ সাহা—৩৩ এইচ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি ৫

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর

লক্ষ্মীকান্ত পহাল—মাধব স্মৃতি পাঠাগার, ১৮ সালিখা স্কুল রোড, সালিখা, হাওড়া

লক্ষ্মীন্দ্র মাইতি —তুলীন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়—যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ সাটীনন্দী, বর্ধমান

শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল—অকালপৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার, অকালপৌষ, বর্ধমান

শম্ভুচরণ পাল—৩৭৪ গ্র্যাণ্ড টাঙ্ক রোড, হাওড়া
শম্ভুনাথ চ্যাটার্জী—চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান
শান্তিপদ ভট্টাচার্য—২ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলি ৯
শিবব্রত ঘোষ—জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২৯ চৌরঙ্গী, কলি ১৬
শিবেন্দু মান্না—৪৪/১১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া
শীলা গুপ্ত—১৭ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলি ৪
শুধাংশুশেখর চক্রবর্তী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা
শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মগরা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী
শোভেন্দ্রনাথ পাণ্ডে—ব্রাহ্মণগ্রাম, নয়নসুখ, মুর্শিদাবাদ
সত্যব্রত সেন—জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, ২৪ পরগণা
সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত—কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, কীর্ণাহার, বীরভূম
সত্যরাম চট্টোপাধ্যায় –বালিজুড়ি, বীরভূম
সনৎ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর, হুগলী
সরোজপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ২৭
স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ
সাধনকুমার মুখোপাধ্যায়—স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর, ২৪ পরগণা
সুচিত্রা ঘোষ—৭৯ জ্যোতিষ রায় রোড, কলিঃ ৫৩
সুদেব চট্টোপাধ্যায়—৩০ বলরাম বসু ঘাট রোড, কলি ২৫
সুধীরকুমার চক্রবর্তী—মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান
সুধীর ব্রহ্ম - ৫/বি অক্রুর দত্ত লেন, কলি ১২
সুনীলবিহারী ঘোষ—জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ, সি, আর, এল, কলি ২৭
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়—বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন
সুবীর ঘোষ—২৫বি রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, কলি ৩
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু মায়ার রোড, হাওড়া
সুশান্তকুমার হাজরা—জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া
সেখ আবদুল মহিত—বালক সংঘ পাঠাগার, গ্রাঃ+পঃ পাঁচলা, পোঃ, ধুনকী, হাওড়া
সেখ মুজিবর রহমান—বালক সংঘ পাঠাগার, গ্রাঃ+পঃ পাঁচলা, পোঃ, ধুনকী, হাওড়া
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা
হরেন্দ্রনাথ দাস—সেবায়তন বি, টি, কলেজ ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর
হারাধন ব্যানার্জী—হাইড রোড ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা
হিরণ দত্ত—৮/এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি ৯
হৃদয়রঞ্জন সিংহ—বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার, বহড়ান
হৃষীকেশ কুণ্ডু—১৩এ।১সি বীরপাড়া লেন, কলি ৩০

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

দেশবন্ধু পাঠাগার। শরৎ বসু রোড।

ক্যালকাটা রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি গ্রন্থ ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করা হয় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী।

বর্তমানে এই বুক-ব্যাঙ্কে ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রদের বিভিন্ন অনার্স বিষয়ের বই রাখা হবে এবং দরিদ্র ছাত্রদের সেগুলি দেওয়া হবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ শ্রী পি সি মল্লিক আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রন্থ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন। অধ্যক্ষ ডঃ এস কে মিত্রও বক্তৃতা করেন।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা সকল ছাত্রদের জন্য সবরকমের পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থ ব্যাঙ্কে রাখতে পারবেন।

রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। ৮২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলিঃ ১৪।

গত ৩০শে মার্চ রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের কার্য-নির্বাহক সমিতির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কলকাতার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা ও জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যহত রাখার অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রবীন্দ্র সদন। কলিকাতা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি রবীন্দ্র সদনে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা পরিকল্পে ৯৮,০০০ টাকা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ গ্রন্থাগারটি কেবলমাত্র রবীন্দ্র বিষয়ক হবে।

২৪ পরগণা

কিশোর ভারতী। সুখচর।

অন্যান্য বছরের মত এবারও কিশোর ভারতী শুভ নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীহারাধন গঙ্গোপাধ্যায়। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানান হয়। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দ্রানী গঙ্গোপাধ্যায়। সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। অভিনয়ে অংশে গ্রহণ করেছেন কুমারী গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, মধুমিতা ভৌমিক ও পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহযোগিতা করেন শ্রীবিপুল কুমার রায়।

বাণী ভবন। দক্ষিণপাড়া। পোঃ গাড়ুলিয়া।

গাড়ুলিয়া দক্ষিণপাড়ার বাণী ভবনের রজত জয়ন্তী উৎসব গত ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই চৈত্র, '৭৩ বিপুল উদ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। ৪ঠা চৈত্র সন্ধ্যায় এক বিরাট জন সমাবেশের উপস্থিতিতে শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য শ্রীঅনিলবরণ রায় এই অনুষ্ঠানের শুভ-সূচনা করেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও ও পলতা পি, এন দাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ। উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস একটি বিবৃতি দান করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজত জয়ন্তী উৎসব খুবই মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

দার্জিলিং

ব্লমফিল্ড মহকুমা লাইব্রেরী। কার্শিয়ং।

১৯১৬ সালে ব্লমফিল্ড সাবডিভিসনাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই এই গ্রন্থাগারের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ সালে ব্লমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী সাবডিভিসনাল লাইব্রেরীতে উন্নীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪৫,০০০ টাকা দান করেন এবং গ্রন্থাগার ভবনের সম্প্রসারণ, বই ও আসবাবপত্র কেনার জন্য আরো ১৩,৯০০ টাকা দান করেন। ব্লমফিল্ড লাইব্রেরী প্রতি মাসে ২৫০ টাকা পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিয়মিত সাহায্য স্বরূপ পেয়ে থাকে। কার্শিয়ং পৌরসংস্থার বাৎসরিক নিয়মিত সাহায্যের পরিমাণ ২৫০ টাকা। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটজনক অবস্থায় গ্রন্থাগার জনসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

নদীয়া

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার। চাকদহ।

বহুদিন যাবৎ গ্রন্থাগারটি 'বসন্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী নামেই অভিহিত ছিল। বেশ কিছুদিন আগে নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম 'বসন্ত-স্মৃতি পাঠাগার' গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। কাঁদোয়া।

গত ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৩ পাঠাগারের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনিল কুমার সাহা এবং পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীনিতাইচন্দ্র মণ্ডল। নূতন কার্যকরী সমিতিতে আছেন, সর্বশ্রী অনিলকুমার সাহা (সভাপতি), নিতাইচন্দ্র মণ্ডল (সহ-সভাপতি), ধর্মদাস বিশ্বাস (সম্পাদক), গোপালচন্দ্র বিশ্বাস (সহ-সম্পাদক), বিশ্বচরণ বিশ্বাস (গ্রন্থাগারিক), ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, সদানন্দ সরকার, সুশান্ত দাসগুপ্ত, ষষ্ঠীচরণ প্রামাণিক ও সমাজশিক্ষা সংগঠক, নাকশীপাড়া, (সদস্যগণ)।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। মানকর।

গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও মানকরের সুসন্তান শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের সম্মানার্থে গ্রামবাসিগণ মানকর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেলা ৯ টায় এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। গ্রামবাসী ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে মানপত্র দেওয়া হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিকাল ৪ টায় শ্রীভট্টাচার্য মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা সভায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

রাণীগঞ্জের শ্রীসুন্দরমল পার্টেসরিয়া মহাশয় শ্রীপবনকুমার সাকসেরিয়ার মাধ্যমে সম্প্রতি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে তিনশত কুড়ি টাকা মূল্যের ৭৫ খানি পুস্তক দান করেছেন। শ্রীপার্টেসরিয়া শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। পুস্তকগুলি শ্রীঅরবিন্দ দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত এবং পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে প্রকাশিত।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক জনজাগরণ এনেছে। বর্তমানে প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও শিক্ষা বিভাগের প্রচেষ্টায় নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভাপতি হলেন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক।

হাওড়া

ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী। ৪২/৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

গ্রন্থাগারের ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় বর্তমানে গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগে ১,৩৮১ ও কিশোর বিভাগে ১৫৭ জন সদস্য আছেন। গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা ২০,৭৭৪। এ বছরে আরো ৭১৩টি বই সংযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া বহুল প্রচারিত প্রায় প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকাই গ্রন্থাগারে রাখা হয়। আলোচ্য বছরে যথারীতি নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ও নেতাজী জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। গত আগষ্ট মাসে 'ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন' সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা হয়। নিখিল বংগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ডিসেম্বর মাসে। অমর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী নাটক 'সধবার একাদশী'র শতবার্ষিকী উপলক্ষে

একটি আলোচনা সভা হয়। গ্রন্থাগারের কিশোর বিভাগটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সামাজিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও অবৈতনিক নৈশ কোচিং ক্লাস সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ বছরের কার্যকরী সমিতিতে আছেন—সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকুমার দাস (সভাপতি), দিলীপকুমার টাট ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় (সহ সভাপতি), সন্তোষ বোস (সাধারণ সম্পাদক), সমরকুমার দত্ত (সহকারী সাধারণ সম্পাদক), পতিতপাবন মান্না, (কোষাধ্যক্ষ) রবীন্দ্র নাথ ভদ্র ও তপনকুমার রায় চৌধুরী (হিসাব রক্ষক), প্রণবকুমার সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শঙ্কর দাস কুণ্ডু (গ্রন্থাগারিক)।

লালবাবা কলেজ। ১১৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। বালী

শ্রীমতী উষারাণী পাল, তাঁর পরোলোকগত স্বামী অধ্যাপক ডি. এন. পালের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগারটি দীনদুঃখী লালবাবা টাস্টের মাধ্যমে বালী লালবাবা কলেজে দান করেন। বইগুলির অনুমানিক মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা।

হুগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া।

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার ১৮ই মার্চ থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি নিঃসন্দেহে যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয়েছে। ১৮ই ও ১৯শে মার্চ শিশু-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২২শে মার্চ মহিলাদিবস, ২৪শে মার্চ চিত্র প্রদর্শনী, ২৫শে মার্চ মার্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান, ২৬শে মার্চ গীতানুষ্ঠান, ২রা এপ্রিল শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা মুখ্য পরিদর্শক শ্রীঅমিয় কুমার সেনের বক্তৃতা, ৯ই এপ্রিল শিশুদের গল্পবলা প্রতিযোগিতা এবং ১৬ই এপ্রিল শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মান্দড়া উন্নয়ন সংসদ। মান্দড়া। ধনিয়াখালি।

মান্দড়া উন্নয়ন সংসদের নবম বার্ষিক কার্য বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বছরে (১৯৬৫-৬৬) গ্রন্থাগারে ৩৮টি নতুন বই কেনা হয়েছে। বর্তমানে মোট বই-এর সংখ্যা ১০৭৭। গ্রন্থাগারের সভ্য সংখ্যা ৭২ জন। একবছরে ১৭০৩টি বই পাঠকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

হুগলী জেলা পরিষদ উন্নয়ন সংসদকে বই কেনার জন্য ১২৫ টাকা দান করেছেন। নানা পত্রপত্রিকায় সম্প্রতি গ্রন্থাগারটি বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। তবে পাঠক মহলে গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি পাঠগৃহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে—যদিও পাঠগৃহ নির্মাণ সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় আর্থিক সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না। হুগলী জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী সম্প্রতি গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেন।

বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফল

ডিসেম্বর (১৯৬৬)

প্রথম শ্রেণী

গুণানুসারে

১। দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী
২। রবীন্দ্রপ্রসাদ রায়
৩। অশোক কুমার বসু
৪। ধন সিং গুরুং
৫। দুর্গাপদ মান্না

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়
২। শর্মিষ্ঠা মজুমদার
৩। মিনতি সরকার
৪। জহর দাশগুপ্ত
৫। দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
৬। চন্দ্রা বসু
৭। কালিদাস দে
৮। মাধবিকা ঘোষ
৯। লীলা সুর
১০। কল্যাণী সেন
১১। ভুপেন্দ্র কুমার কার্ণ

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং

জানুয়ারী—১৯৬৭

(১০ম কোর্স)

ডিস্টিংশন

১। জীবানন্দ বহুবলিন্দ্র
২। রতনকুমার খাঁ
৩। শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য
৪। অমূল্যধন মণ্ডল
৫। দুর্গাপ্রসন্ন রায়
৬। রামকৃষ্ণ তেওয়ারী
৭। শেখ আবদুল জব্বার

পাশ

৮। অশেষকুমার পাঠক
৯। শান্তিকুমার ঘোষ
১০। অনাথশরণ মুখোপাধ্যায়
১১। ব্যোমকেশ ঘোষ
১২। সঙ্কর্ষণ পান
১৩। হরিপদ বিশ্বাস
১৪। সত্যনারায়ণ উপাধ্যায়
১৫। বিশ্বনাথ মণ্ডল
১৬। প্রশান্ত কুমার দে
১৭। ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
১৮। কুমার সিংহ তামাং
১৯। পদম বাহাদুর গুরুং
২০। বিনয়কুমার ঘোষ
২১। মোহিনীমোহন দাসঠাকুর
২২। খগেন্দ্রচন্দ্র দাস

॥ শ্রীখণ্ডের সম্মেলন ॥

[বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মা কর্তৃক প্রেরিত]

শ্রীচৈতন্যদেবের স্পর্শধন্য শ্রীখণ্ডের পুণ্যভূমিতে একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনেকেই লক্ষ্য করেননি, এই শর্মা যথাসময়েই সম্মেলনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সম্মেলনের ক'দিন প্রতিটি কাজে প্রত্যেককে ছায়ার মতো অনুসরণ করাই ছিল তার কাজ। কিন্তু শ্রীখণ্ডের পুণ্যভূমিতে গিয়ে ভণ্ডুলের মন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল—কোনরূপ ভণ্ডুলবাজী করবার ইচ্ছেই তার আর ছিলনা। সুতরাং আপনাদের কারো কোন গোপন কথা ফাঁস করবার ইচ্ছেও ভণ্ডুলের নেই। শুধু সম্মেলনে যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের জন্য সম্মেলনের কয়েকটি টুকিটাকি নিবেদন করবার ইচ্ছেতেই ভণ্ডুল কলম ধরেছে।

শ্রীখণ্ডের এই সম্মেলনে উদ্যোগ-আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিলনা। গ্রামের স্কুলে সুদৃশ্য প্যাণ্ডেল ও তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। স্কুল ভবনটি বেশ বড়—সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বাগান, একপাশে একটি থিয়েটারের স্টেজও রয়েছে। পার্শ্ববর্তী বিজ্ঞান ভবনে হয়েছিল তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন।

২১ তারিখের সকালেই বেশ কিছু প্রতিনিধি এসে গিয়েছিলেন। পরিষদের অধিকাংশ কর্মকর্তা এবং কর্মীদের পরিচিত মুখও দেখা যাচ্ছিল। মূল সভাপতি ও বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতিরাও উপস্থিত আছেন দেখা গেল। সুতরাং গোলমালের যে কোন আশঙ্কাই নেই ভণ্ডুলের মতো অতি নিন্দুককেও তা স্বীকার করতে হল।

সম্মেলনের উদ্বোধন হবার কথা ছিল ২১ তারিখ বিকেল পাঁচটায়। কিন্তু সম্মেলনের উদ্বোধক জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত যাদব মুরলীধর মূলের গাড়ী সম্মেলন প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছাল ৫-১৫ মিনিটে। গাড়ী থেকে নামলেন তিন প্রধান—শ্রীযুক্ত মূলে, 'ইউ-এস-আই-এস'-এর শ্রীমতী ফ্ল্যানাগান এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নব নির্বাচিত সহঃ-সভাপতি শ্রীযুত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁরা কলকাতা থেকে সারাপথ প্রাইভেট কারে এসেছিলেন এবং কাটোয়া থেকে ভুল করে দশমাইল উল্টোদিকে চলে গিয়েছিলেন।

সভা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কালবৈশাখীর আভাস পাওয়া গেল ঈশান কোণে; দেখতে দেখতে সারা আকাশ মেঘে মেঘে গেল ছেয়ে। শ্রীযুত মূলে এবং আর দুই প্রধান বক্তৃতা করে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়লেন। ভণ্ডুল পরে জেনেছে ঐ রাত্রে কলকাতা পৌঁছুতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

এদিকে সভাস্থানে যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদের ওপর এসে পড়ল কালবৈশাখীর ঝড় এবং সেই সঙ্গে ফোটা ফোটা বৃষ্টি। স্থানীয় দর্শকবৃন্দ প্রথমে পালাতে আরম্ভ করলেন

তারপর প্রতিনিধিবৃন্দ উসখুস করতে আরম্ভ করলেন। সভা প্রায় পণ্ড হয় হয়। মূল সভাপতি কিন্তু তাঁর ভাষণটি পড়েই চলেছেন কোনদিকে দৃকপাত না করে।

এমন সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক (অ-মাইক) গলায় 'বন্ধুগণ' বলে হুংকার ছাড়তেই পলায়নোন্মুখ জনতা ফিরে দাঁড়াল। ভণ্ডুলের মনে হল, যেন কয়েক শতাব্দী পূর্বের কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এটি কোন বীর সেনাপতির হুংকার। এরপর স্কুলে হলঘরের স্বল্পালোকিত কক্ষে সকলে গিয়ে বসলেন এবং সভাপতি মশায় তাঁর অসমাপ্ত ভাষণটি শেষ করলেন। পরে ঐ স্থানেই শ্রীখণ্ডের কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের কীর্তন গান হচ্ছিল। কীর্তনগান চমৎকার জমেছিল। কিন্তু ভণ্ডুল লক্ষ্য করল, এক একজন করে মুখ নিচু করে উঠে চলে যাচ্ছেন। রহস্যটি ভণ্ডুলের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল কিছুক্ষণ পরে খেতে গিয়ে। ভণ্ডুল দেখল, প্রথম ব্যাচের খাওয়া তো অনেকক্ষণ হয়েই গেছে, দ্বিতীয় ব্যাচের খাওয়াও অর্ধেক হয়ে এল। পরবর্তী বিচিত্রানুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক তরজা গান শোনার আকর্ষণেই সম্ভবতঃ কীর্তনের আসর থেকে এঁরা ওভাবে উঠে এসেছিলেন।

গত দশ বছর ধরে যাঁরা নিয়মিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা এখন আর অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পাবেন না। আগের আগের সম্মেলনগুলির গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছে এবং সেগুলি বাঁধিয়ে রাখাও হয়েছে পরিষদের অফিসে। ভণ্ডুলের কথা বিশ্বাস না হয়তো মিলিয়ে দেখতে পারেন। কাকদ্বীপ সম্মেলন পর্যন্তও এইসব পুরানো কিছু মুখ অন্ততঃ দেখা গিয়েছিল।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে এক কোণে বসে নিস্পৃহভাবে প্রাতঃরাশ সারছিলেন 'হাওড়া বার্তা'র সম্পাদক শ্রীশম্ভুচরণ পাল। প্রায় প্রতি সম্মেলনেই তাঁকে দেখে ভণ্ডুল। এবারে যেন তাঁকে খুব বেশি নিঃসঙ্গ এবং ক্লান্ত দেখাল। যাঁদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছেন তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। নবীন যাঁরা সম্মেলনে আসছেন তাঁদের আলাপ-পরিচয় স্বভাবতঃই তাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকাল দেখি এই বৃদ্ধ এককোণে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। কথাবার্তা সব কান পেতে শোনেন, কিন্তু কারো সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলেন না।

প্রত্যেক সম্মেলনেই আপনারা তিনটি গোপালকে সর্বদা সর্বত্র একত্রে দেখতে পাবেন। এবারের সম্মেলনে দেখা গেল দুই গোপাল—বালসীর শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল এবং রসা রোডের শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত—উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় গোপাল অর্থাৎ মদন গোপাল কোন কারণে আসতে পারেন নি। সুতরাং দুই গোপালকেই সম্মেলনের তিনদিন খুব বিমর্ষভাবে কাটাতে দেখা গেল। জানিনা, বাড়ীতে বসে তৃতীয় গোপালের মনের অবস্থা কী হয়েছিল।

এবারের সম্মেলনে জেলা গ্রন্থাগারিকদের একটু প্রাধান্য দেখা গেল। তাঁরা দল বেঁধে এসেছিলেন, চলাফেরাও করেছেন দল বেঁধে। বয়সে প্রবীণ বলেই হয়তো তমলুকের

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যকে এঁদের দলে দেখা গেলনা। কিন্তু ভণ্ডুলের মনে হল, এবারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধিরা এসেছেন কম। বিশেষ করে, কোলাঘাটের শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভাব সম্মেলনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ভণ্ডুলের মনে হয়, সম্মেলন জমিয়ে দিতে তিনি একাই একশ। দুঃখের বিষয়, তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বর এই সম্মেলনে শোনা গেল না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই কিছু প্রতিনিধি কাটোয়ার পথে কেটে পড়েছিলেন—সম্ভবতঃ সম্মেলনের প্রথম দিনেই তাঁরা শ্রীখণ্ডের যা দ্রষ্টব্য তা দেখে ফেলেছিলেন।

পরিষদের প্রবীণ সহ-সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুকে সম্মেলনের তিনদিন নবীন যুবকের মতই চলাফেরা করতে দেখা গেল। একসময়ে তাঁকে দেখা গেল কাঁধে গামছা ফেলে স্নানের জন্য গ্রামের দীঘির উদ্দেশ্যে চলেছেন।

মূল সভাপতিকেও দেখা গেল বেশ হৃষ্টচিত্তে সম্মেলনের ক'দিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ করতে। ফেরার পথে ট্রেনে সভাপতি মশায় প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গেই চলেছিলেন, অবশ্য আলাদা কামরায়। জনৈক তরুণ প্রতিনিধিকে সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখা গেল। ভণ্ডুল দেখে সেই তরুণটি উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, "সরকার জনগণের জন্য খাদ্যের বন্দোবস্ত করা দূরে থাক—এক গ্লাস জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে পারেনি"—দেখা গেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই প্রবীণ অধ্যাপক হা হয়ে গেছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের জনৈক নবীন সহকারী গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের হুবহু বিবরণ টুকে এনেছেন—ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে বলে। সম্মেলনে কী কী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল এবং কে কি বলেছিলেন তার বিবরণী অন্যত্র নিশ্চয়ই থাকবে। ভণ্ডুল সে সম্পর্কে কিছু বলতে চায়না। সেসব প্রকাশ্য ব্যাপারে ভণ্ডুলের বিশেষ আগ্রহ নেই—নেপথ্য বিবরণ নিয়েই ভণ্ডুলের যত আগ্রহ। সম্মেলনের ক'দিন যে রীতিমত ভূতের উপদ্রব চলেছিল এটা হয়তো অনেকেই জানেন না। অনেকে অভিযোগ করেছেন, ছাদের ওপর ভূতের উপদ্রব চলেছিল বলে রাত্রে তাঁরা ঘুমুতে পারেন নি। কিন্তু এর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন তিনি হচ্ছেন শান্তি-নিকেতনের শ্রীযুত সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। তিনি যদি ভুশুণ্ডীর মাঠের ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানাদের আবাহন না জানাতেন—তাহলে ভণ্ডুল হলপ করে বলতে পারে, এ জিনিস কখনোই ঘটতো না। আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা যাঁরা গলা মিলিয়েছিলেন তাঁরাও এজন্য সমভাবেই দায়ী—অন্যে পরে কা কথা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক, এমন কি, পরিষদ প্রকাশিত একটি পুস্তকের লেখিকা জনৈকা খ্যাতনাম্নী মহিলা পর্যন্ত শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরের বারান্দায় বসে এই গানে গলা মিলিয়েছিলেন—

'ভুশুণ্ডীর মাঠ, জ্যোৎস্না উদার, হাসছে পূর্ণশশী'—ইত্যাদি—

মূল সভাপতির ঘরের পাশের ঘরেই ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের

ক্যাম্প। পাশের ঘরে সভাপতি মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মহাশয় এবং শ্রীযুত বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ দু'রাত্রি সুনিদ্রা হয়েছিল কিনা ভণ্ডুল জানেনা। কিন্তু ঐ ঘরের ঠিক নীচেই ছিলেন মহিলারা, তাঁরা সারারাত তাঁদের মাথার ওপর কাদের যেন দাপাদাপি করতে শুনেছেন।

এবারে মহিলারা অবশ্য প্রায় সকলেই ছিলেন পরিষদের সুপরিচিতা কর্মী শ্রেণীভুক্তা। অন্য কোন মহিলাদের দেখা গেলনা। এঁরা সবসময়ে দল বেধে বেড়াতেন। তবে তরজা গানের সময় এবং অন্যান্য বিচিত্রানুষ্ঠানে এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রীখণ্ডের বহু মহিলার উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়। পরিষদের কোন মহিলাকে উদ্যোগী হয়ে এইসব মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়নি।

কলকাতা থেকে সম্মেলনে আসবার পথে জনৈকা মহিলা প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মেয়েরা চিরকালই সেয়ানা হয়ে থাকে। মহিলাটি বিচ্ছিন্ন হয়েও কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে নির্দিষ্ট ট্রেনে চড়ে যথাসময়ে সম্মেলনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আর সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁর সন্ধানে সারা কলকাতা চষে ফেলেছিলেন। মহিলাটির বাড়ীতে গিয়ে বলতে বাড়ীর লোকজনও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং শ্রীখণ্ড থেকে বাড়ীতে ট্রাঙ্ক কল গেল, 'শ্রীমতী নিরাপদেই আছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।'

ভণ্ডুলের পক্ষে পুলকিত হবার মত সম্মেলনে আর বিশেষ কিছুই ঘটেনি। শুধু একদিন খাবার ঘরে ভাতে গন্ধ বলে জনৈক প্রতিনিধি হাত গুটিয়ে বসেছিলেন—প্রতিকার চাই বলে। কিন্তু পার্শ্বে উপবিষ্ট পরিষদের সম্পাদক মশাই বললেন, 'দেখুন আমরা বিয়ে বাড়ীতে আসিনি, এক আধটু ও রকম ত্রুটিবিচ্যুতি হবেই। এরপরেই সব শান্ত হয়ে যায়। সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসেও সকালবেলা নাটক একটু জমেছিল, ভণ্ডুলের মনেও খুব আশার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু তাও অল্পক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল।

সর্বশেষে যা উল্লেখযোগ্য, ফেরার পথে শ্রীখণ্ড থেকে বর্ধমান যাত্রাকালে ট্রেনে প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই ঘটনার বিবরণটি ভণ্ডুলকে চেপে যেতে হচ্ছে প্রাণভয়ে।

শ্রীযুত বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়ের চিরসাথী ইক্‌মিক্ কুকারটি কিন্তু এবারেও যথারীতি সম্মেলন ঘুরে এসেছে। কিন্তু সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ নিয়ে প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে এমন চেপে ধরেছিলেন যে, একফাঁকে উঠে গিয়ে তিনি ভাতে-ভাত সেদ্ধ চাপিয়ে রেখে আসতে ভুলে গিয়েছিলেন। স্বপাক-আহারী ব্রাহ্মণ সন্তানকে সেদিন ফলাহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

পরিষদের অন্যতম সহঃ-সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় শুধু এক রাত্রির জন্যই সম্মেলনে গিয়েছিলেন। উদ্বোধনের দিন ট্রেনের গোলমালে রাত আটটায় পৌঁছেছিলেন এবং পরদিন তাঁর গ্রন্থাগার খোলা রাখতে হবে বলে কাকপক্ষী জাগবার আগে ভোর চারটেয় কলকাতা রওনা হয়ে যান। দায়িত্বশীল কর্মীরা একযোগে ছুটি নিয়েছিলেন, কিন্তু অত হাঙ্গামা করে অফিসে গিয়ে দেখলেন, সবাই গ্রন্থাগার খোলা হবেনা ভেবে হাজির হয়েছেন।

The Conference at Shrikhanda ;
By Special Correspondent Shri Bhandulananda Sharma.

বাংলা শিশু সাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীমতী বাণী বসু সংকলিত

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল, দীর্ঘ ১৩৪ বছরে প্রকাশিত বাংলা শিশুগ্রন্থের প্রামাণ্য তালিকা।

বইয়ের লেখক, নাম, বিষয় ইত্যাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত এবং
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের পরিচায়িকা সংবলিত

গ্রন্থপঞ্জীটির আকার ঃ রয়াল আট পেজি। ৪৫০ পৃষ্ঠা। ২৭টি আর্ট প্লেট।
সুদৃশ্য আধা কাপড় বাঁধাই।

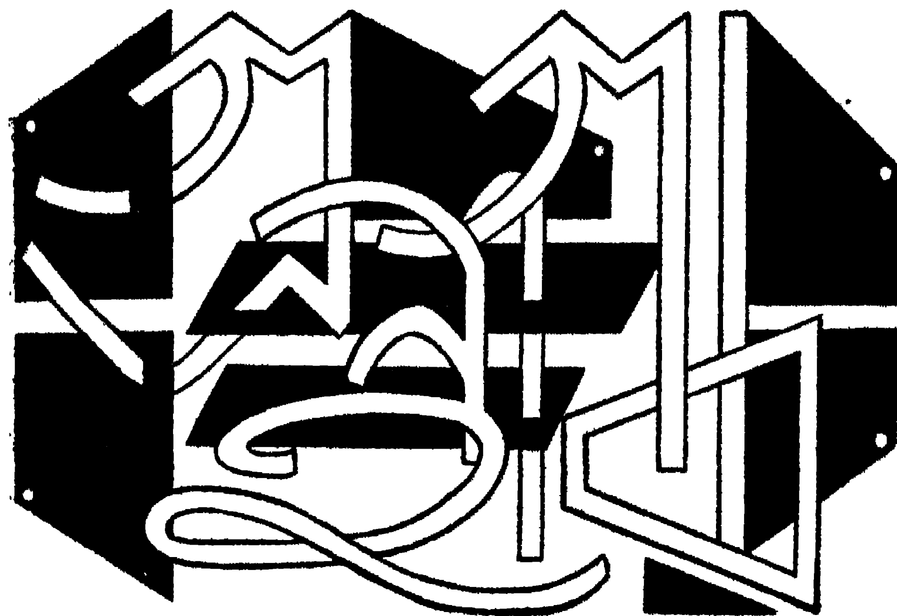
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই সুপরিকল্পিত, অতি প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধিত গ্রন্থপঞ্জীটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মূল্য সাত টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

গৃহনির্মাণ তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২ | ১৩৭৪, জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের নানাবিধ সমস্যা, বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সুবিচার প্রার্থনা করা হয়েছে। স্মারকলিপিটির পূর্ণ বিবরণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হল।

এই স্মারকলিপিটি একটু মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করলেই এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার চিত্রটি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই সব গ্রন্থাগার কর্মীর পদের গুরুত্ব, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা তথা অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি ক্রমাগতঃ মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে যে তাঁদের বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়নি একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের এই হারকে কোনমতেই যুক্তিপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায় না। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, একই শ্রেণীভুক্ত ও একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত সরকার পরিচালিত ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের কর্মীরা একই ধরনের বেতনের হার পান না। তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত দশ বছর যাবত গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানাপ্রকার আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে যা করা হয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে গত ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে রাজ্যসরকার পরিচালিত ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের জন্য যে নতুন বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয় তা নানা কারণে গ্রন্থাগার কর্মীদের হতাশ করেছে। নতুন বেতনক্রম প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই সকল গ্রন্থাগার কর্মীর খুব সামান্যই লাভ হয়েছে। এমন কি,

অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থই হয়েছেন। দীর্ঘকাল পরে বেতনক্রম প্রবর্তিত হওয়ায় এই সকল কর্মীরা বহুদিন যাবত বাৎরিক বেতনবৃদ্ধি, বেতন হারের পরিবর্তন ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করতে পারেন নি। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন কর্মচারীদের একাধিকবার ভাতা ইত্যাদি বাড়িয়েছেন, এমন কি, সরকারী কর্মচারীদেরও পর্যন্ত ভাতা অনেক পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে তখন গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐ বেতনক্রম অত্যন্ত নগণ্য ও হতাশাব্যঞ্জক ছাড়া বৈ কি!

গ্রন্থাগার কর্মীরা তাই সুবিচার প্রার্থী। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের ধরনের ভিত্তি এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের বেতনক্রমে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিবেচনায় বর্তমান বেতনক্রম নিম্নস্তরের। গ্রন্থাগারিকগণের বেতনক্রম নির্দ্ধারণের একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। আশা করি বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারে নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যেমন উচিত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীদেরও পরিষদকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিক সংখ্যায় পরিষদের সদস্য হতে হবে—সভা-সমিতি ও সম্মেলনে নিজেদের দাবীগুলি যাতে উত্থাপিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সুখের বিষয়, কিছুদিন থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসঙ্ঘ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যান্য যে সকল সঙ্ঘ সম্প্রতিকালে গঠিত হয়েছে, যেমন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী সঙ্ঘ, পলিটেকনিক কর্মী সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলেরই একযোগে এই আন্দোলনে শামিল হওয়া প্রয়োজন। কারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে রাখতে হবে ঐক্য এবং সঙ্ঘশক্তির বলেই তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন এবং তাঁদের দাবী আদায়ে সক্ষম হবেন—অনৈক্য ও বিভেদের সর্বনাশা নীতির শনি যে কোন রন্ধ্রপথে ঢুকে তাঁদের গত দশ বছরের প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দিতে পারে। এ সম্পর্কে তাঁদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

Editorial : The Neglected library workers :

রেখাচিত্র (৪) বইয়ের দোকানে

লেখক—ভিল্‌হেল্‌ম্‌ হাউফ

অনুবাদক ঃ শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

[মূল জার্মান থেকে অনূদিত]

·(Wilhelm Hauff : Skizzen. 4. Besech im Buchladen)

আমি ঠিক করে ফেললাম a la Walter Scott (—এর অনুকরণে) একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে হবে কারণ সকলের মতে এখখানি বই সাময়িক রীতি, অর্থাৎ মানুষের সাময়িক রুচি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন ; এ ছাড়া আর অন্য কোন ধরনের বইয়ের ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। মনের মধ্যে নানা সন্দেহ জাগল : কেবল যে আমাকে এই নাম করা লেখকের বইগুলি পড়তে হবে তা নয় তার বই নিয়ে রীতিমত গবেষণা করতে হবে, কারণ তা না হলে আমি তার বই-গুলির বিষয়বস্তু আমার কাজের উপযোগী করে নিতে পারবনা। দ্বিতীয় কথা, এবং তা সবচেয়ে বড় কথা, প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যাবেত' আমার বই ছাপবার জন্যে ? সেই জন্যে বইখানা শুরু করবার আগে, ঠিক করলাম, কিভাবে প্রকাশকের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারা যায় তার রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। প্রকাশক Salzer & Son-এর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ছিল প্রকাশক সংঘের দৌলতে। তাদের দোকানে গিয়ে একখানা বই কেনবার জন্যে এবং সেই সময় পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যে পকেটে ২ থালের ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

"দুই থালের-এর একখানা সুন্দর বই দিন তো" আমি বললাম।

"দুই থালেরে সুন্দর বই ?" সে নির্দেশ করলে "কি বই হবে ? কবিতার বই "?

"না না, গল্প, না হয় উপন্যাস, Herr Salzer"

"এ দামে ভালো কিছু পাবেন না—" সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল—"দেখুন খুঁজে, এই আমাদের পুস্তক তালিকা।"

"কি বললেন ? দুই থালের-এ কিছু ভালো বই পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমি তো জানি Walter scott-এর যে কোন উপন্যাস ২০ Groschen-এ পাওয়া যায়।"

"হ্যা পাবেন, যদি অনুবাদ চান—" সে বললে, "আমি ভেবেছিলাম আপনি মূল বই চাইছেন।"

"হায় ভগবান, যদি অন্য ভাষার একখানা অনুবাদ ২০ গ্রোসেন দাম হয়, তা হলে একখানা জার্মান বইয়ের দাম বেশী হবার কারণ কি ?"

"আপনি কি মনে করেন, আমরা একখানি আসল বই নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে পারি ? অনুবাদগুলো, আর এই কম দাম আমাদের ব্যবসা লাটে তুলবে। আমাদের নামকরা বইয়ের দোকানগুলির অবস্থা এখন কি হয়েছে ভাবুন তো! গুদাম সাবাড়

করবার জন্যে সব বই কম দামে বিক্রি করতে হয়। সব বই-ই কম দামে বিক্রী করতে হবে, ফলে সব বই হয়েছে বাজে বই আর জঞ্জাল। সহরের এক কোণে বসে একজন কমদামে এই জঞ্জালগুলো বিক্রি করে আর আমরা যারা কোনরকমে বেঁচে আছি, তাদের চাপে এবার লাটে ওঠবার অবস্থায় এসে পড়েছি।"

"কিন্তু ব্যাবসার এই পরিবর্তন, বইয়ের ব্যবসার উপর এবং আসল বইয়ের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করবে ?"

"কেমন করে ?—তা তো দিনের আলোর মত পরিষ্কার। জনসাধারণ কমদামী বই পড়বে তাদের রুচিও নিচে নামবে এবং ঐ সব বই-ই তাদের পড়া অভ্যাস হয়ে যাবে। আমি অবশ্য Scott আর দুজন আমেরিকানের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। তাদের বই যে খুবই ভালো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন মেয়ে যার শেলাই করে পেট চলে সেও ২ থালের-এ ক্লাসিক উপন্যাসের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারে। অসম্ভব তাড়াতাড়ি জনসাধারণের এই ধরনের বই পড়া একটা রোগে দাঁড়িয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই গ্রোসেন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মনে মনে একটা মাপকাঠি তৈরি করে ফেলে এবং সেই মাপকাঠি দিয়ে আমাদের জার্মান product-এর মূল্য মাপবার চেষ্টা করে।"

"কিন্তু তাতে তো পৃথিবীর উন্নতিই হবে, তাতে মানুষের জ্ঞানও বাড়বে এবং তাদের রুচিও প্রকাশ পাবে।"

"জ্ঞান, রুচি—এ কথা দুটোর মানে আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে মশাই ! সু-রুচি ! যেন খালপারের লোকেদেরই কেবল পাঠের সু-রুচি আছে। জ্ঞান ! অর্থাৎ আপনি বলতে চান, তাদের মতে Walter scott-এর মত ও Cooper-এর মত সুন্দর এবং Washington Irving-এর মত গভীর ভাবপূর্ণ বই আর হয় না। একবার ভাবুন তো, এইরূপ ধারণার বীজ যখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়বে তখন আমাদের সাহিত্যের এবং আমাদের পুস্তক ব্যবসায়ের অবস্থাটা কি হবে। এই ধারণা ও কয়েকটি বদ অনুকরণ (কথাটা বলতেও লজ্জা হয়) যত প্রচার হবে আমাদের দফা তত ঘোলা হ'বে। লেখকরা ক্রমশঃ বেশী পয়সা চাইবে এবং যে বইয়ের জন্যে মানুষ এক স্বর্ণমুদ্রা দিত সেই বইয়ের জন্যে এখন ৫ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় মানুষ বই কিনবেও কম তার উপর Scott-এর উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বইগুলি সংক্রামক ব্যধির মত ছড়িয়ে পড়বে। Scott-এর লেখার মধ্যে এখন আছে ভাবের পরিবর্তে ভাষা। আগে মানুষ একখানা মাত্র সঙ্কীর্ণ খণ্ডের মধ্যে ভাব, ভাষা, দৃশ্য, ছবি সব কিছুই পেত, এখন সে সব দশখানা খণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে মানুষকে খরচ করতে হবে বেশী। যে জিনিষ আগে ৪।৫টী ছোট কবিতার মধ্যে পাওয়া যেত, তা এখন পাওয়া যাবে বহু পৃষ্ঠার গল্পে।

"তা হলে কি মিত্রাক্ষর কবিতা অচল হতে চলেছে ?

"কে কিনবে বলুন ? সাধারণ লোকে, ব্যক্তিগত ভাবে ? বিদ্বান লোকেরা ?

তারাতো লেখকের কাছ থেকেই পাবে পুস্তক পরিচয় লেখবার জন্যে। লেণ্ডিং লাই-ব্রেরী? তার ব্যবসা হচ্ছে উপন্যাসের, কারণ গ্রন্থাগার তার জনসাধারণকে চেনে। আবার এই লেণ্ডিং লাইব্রেরীগুলো হ'লো আমাদের দুরবস্থার কারণ। জনসাধারণ ভাবে যখন গ্রন্থাগারে গেলে বই পড়তে পাওয়া যাবে তখন কেন অযথা পয়সা খরচ করা। সাধারণ লোকে এক গ্রোসেন সংস্করণের অনুবাদ বা সস্তা দামের পকেটবুক সংস্করণের বই কিনে নিজের নিজের গ্রন্থাগার গড়ে তুলবে ফলে প্রকাশকদের একখানা বই ছাপাতে হলে দেখতে হবে অন্ততঃ ৫০০ গ্রন্থাগার তা কিনবে কিনা। আজকের দিনে যদি গেটে বা শিলার জন্মায় তা.হলে তাদের কোন বই ৫০০ কপির বেশী ছাপা সম্ভব হবে না। জনসাধারণ মনে করবে আমাদের সাহিত্যের পতন ঘটেছে।

"এ সবের জন্যে কি Scott এবং পকেটবইগুলি দায়ী?"

"নিশ্চয়! আর এমনিভাবে একটি খণ্ডের মূল্য বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়াও কম ক্ষতিকর নয়। লেখকও তার চিন্তাধারা ও ক্ষমতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তারাও লিখতে শুরু করবে বিভিন্ন পত্রিকায়, কারণ তাতে তারা পয়সা পাবে বেশী। জনসাধারণের পত্রিকার জন্য তাদের খরচ ভাগ করে নেবে—যদিও পত্রিকা কেনা একটা বাড়তি খরচ ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও এই বাড়তি খরচ করতে হবে কারণ পত্রিকা কেনা হয়ে দাঁড়াবে সাময়িক রীতি। ফলে আমাদের ডুবতে হবে। এই পকেট ক্যানদার ক্রমশঃ আমাদেরও আক্রমণ করবে।

"কিন্তু Herr Salzer" আমি রাগত লোকটিকে বললাম, "তা আপনি স্রোতের বিরুদ্ধে ছুটছেন কেন? আপনি কেন পকেটবই ছাপতে শুরু করুন না? দু একখানা পত্রিকা ছাপা শুরু করুন। না, আপনি ঐ সব ধরনের বই বা পত্রিকা ছাপতে বুঝি লজ্জা বোধ করেন?

"সত্যিই যে লজ্জা হয় তা বলতে পারি না—" অনেক ভেবেচিন্তে সে বললে—"একজন প্রকাশক যা করতে পারে, Salzer & Son তা করতে লজ্জা পাবে কেন। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন পরে পত্রিকা ছাপতে একটু ভয় হয়। তার উপর কে লিখবে। আজকালকার যুগে নতুন কিছু চাই, না হয় রসাল কিছু চাই—তবেই পত্রিকা চলবে। অনেক দিন ধরে পত্রিকার একটা বেশ চমকপ্রদ নাম খুঁজে বার করবার তালে আছি, কারণ পত্রিকার নামটাই হয় অনেক সময় পত্রিকার উন্নতির কারণ। হাতে কয়েকজন ভালো লেখক থাকলে আর কয়েকজন সমালোচক পেলে আমি নিশ্চয় একখানা পত্রিকা বার করতাম। কারণ তখন আমি এই ঝুঁকি নিতে সাহস পেতাম।

The Sketches. 4. In the Bookshop
By Wilhelm Hauff tr. from the
Original German. by Rajkumar Mukherji.

ব্রটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা—(৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১০ খৃষ্টাব্দ

তামিল

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৪৯	ইণ্ডিয়া (তামিল সংবাদপত্র)	পণ্ডীচেরী
১৫০	স্থর্যোদয়ম্ (তামিল সংবাদপত্র)	পণ্ডীচেরী

হিন্দী

১৫১	হালত ই- শহীদ আওর প্রণেতা—লাড্ডারাম সন্ন্যাসী	এলাহাবাদ
	সন্ন্যাসী-কি-আওয়াজ "	"
১৫২	হিন্দুস্তান-কি-হালত মাজিয়া "	"
১৫৩	মরণা ভালা হায় (খণ্ডপত্র)	পঞ্জাব
১৫৪	মারো ফিরিঙ্গীকো	বাঙ্গালা
১৫৫	দেশ-কি-বাত প্রণেতা—বাবুরাও বিষ্ণু পরাড়কর	কলিকাতা
১৫৬	স্বদেশী আন্দোলন আওর বয়কট প্রণেতা—মহাদেও সাপ্রে	নাগপুর

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ

১৫৭	সন কামন কো ছোড়িসে পঢ়িয়ে প্রারম্ভে 'জাতিকা উন্নতি বা অবনতি' শেষে 'আরো কে দিল সে ভি দূর করনে কি চেষ্টা করো'	কলিকাতা
১৫৮	আনা লেইলা প্রারম্ভে 'পলিসি পসন্দ' শেষে 'স্বদেশ ভক্তি,	মাতবুয়া রাম প্রেস, আকাশপুর, যুক্তপ্রদেশ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

১৫৯	আর্য সমাজকে বাণী প্রণেতা—অমর সিং	লাহোর

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৬০	জাতীয় সেবা প্রারম্ভে 'মিতো সংসার মেঁ বিদ্যা এইসি চীজ হায়' শেষে 'আওর আপনে ভাইয়াকো হুশয়ার করো' প্রণেতা—জাতীয় সেবক গঙ্গা সহায় মুনসী দাস সেবা	বাঙ্গালা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ

১৬১	আল হিলাল (উর্দু সংবাদপত্র) ১৩ই আগষ্ট, ১৯১৩	কলিকাতা
১৬২	দর্দ জিগার প্রণেতা—রহমতুল্লা বদউই	কলিকাতা
১৬৩	আল হিলাল ১৭ই আগষ্ট, ১৯১৩	কলিকাতা
১৬৪	হাবলুল মতিন ১১ ও ১২ই আগষ্ট, ১৯১৩	কলিকাতা
	হাবলুল মতিন (বাঙ্গালা সংস্করণ) ১৩ ও ১৭ই আগষ্ট, ১৯১৩	কলিকাতা

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ

১৬৫	মুসলমানোঁকো কিসকা সাথ যানা চাহিয়ে	পঞ্জাব
১৬৬	আল ইত্তিকাম প্রারম্ভে 'রহনে রপাই'	কলিকাতা
১৬৭	বাঘওয়াত-ই-হিন্দ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৪	যুক্ত প্রদেশ
১৬৮	তারিখ হিন্দ্ প্রণেতা—ভাই পরমানন্দজী	ইউনিয়ন ষ্টীম প্রেস, লাহোর
১৬৯	জহিদ্রুফি সবিল—ইল-লাহ্	যুক্তপ্রদেশ
১৭০	ওয়া মা আলকোনা ই মা—আল্ন্ আলাগ	বিহার ও উড়িষ্যা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

১৭১	খরুজ-ই-দজ্জাল	পঞ্জাব
১৭২	জেহাদ—প্রারম্ভে 'আগর ফিরদৌস বারুইয়ে জমিনাস্ত'	বাঙ্গালা

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

১৭৩	ইসলাম	বাঙ্গালা
১৭৪	ফরমান	বাঙ্গালা
১৭৫	খুনী কাফন	বাঙ্গালা
১৭৬	আল্লা হো আকবর	বাঙ্গালা

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

মারাঠী

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
১৭৭	স্বাতন্ত্র্য—চতুর্থ খণ্ড, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪	বাঙ্গালা
১৭৮	গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, হুম চৈত্র—ভাগ পহেলা, প্রণেতা অজ্ঞাত —	অজ্ঞাত

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

ইংরেজী

১৭৯	Civil Disobedience Movement in Tamluk (1932—33) by Tamluk Subdivisional War Council	Tamluk
১৮০	Gandhi in South Africa. Author—Soumyendra Nath Tagore Printer—Calcutta Printing Works	29 Ramkanta Mistri Lane, Calcutta

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

১৮১	Can the Hindus Rule India ? Author—James Johnson Publisher—P. S. King & Son Ltd.	Orchard House, Westminster, London
১৮২	Lenin—God of the Godless Author—Ferdinhnd Ossendonski Printer—Richard Clay & Sons.	Suffolk Great Britain
১৮৩	Martyrs for Motherland Author—K. C. Acharya Printer—Phoenix Printing Works	29 Kalidas Singha Lane, Calcutta
১৮৪	Pamplet No 2 Published by the International Communist Opposition and Printed at the Bikram Printing Press.	Girgaon, Bombay
১৮৫	Trial of Srijut Jnananjan Niyogi Printed by P. C. Mitra at the Venus Printing Works.	Calcutta
১৮৬	What is Communism ? Author—Akrur Dutt Printer - Probhat Sen at the Ghosh Press.	38 Shibnaryan Das Lane, Calcutta

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৮৭	What the Students of other countries have done ? Auuhor—J. Simoniaolis Printer—Sree Saraswati Press.	Calcutta
১৮৮	Young Socialist League, Poona, Pamphlet No. 4 Author—M. N Roy Printer—Vikram Printing Press,	Girgaon, Bombay

১৯৩৬ খৃঃ

১৮৯	Comrade Muzaffar Ahmed Author—Soumyendra Nath Tagore Printer—Rabi Press,	27A Beadon Street Calcutta
১৯০	In India Author—A. M. Sahay Printer—Kinoshita Printing Company, Osaka, Japan Publisher—The Indian National Congress Committee of Japan	Kobe, Japan

১৯৩৪ খৃঃ

হিন্দী

১৯১	আঙ্গরেজী শিক্ষা সে ভারতীয় সভ্যতা কা নাশ প্রণেতা—গোবিন্দরাম হাসানন্দ,	বেদিক প্রেস, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্মী

১৯২	বর্মী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রাকর—সোয়েদাবো প্রেস,	২৭৫নং বার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বর্মা

সামুদ্রিক বাণিজ্যশুল্ক আইন অনুযায়ী ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ পুস্তকাদি

১৯৩৩ খৃঃ

১৯৩	Gandhi versus the Empire Author—H. J. Mazumder Universal Publishing Company.	New york. U. S. A

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৯৪	Speech by Subhas Chandra Bose read at the Political Conference at London on 10th June, 1933. Printed at the Utopia Press	London
১৯৫	New Asia Edited and Published by Rash Behari Bose, 79, Sanchome, Cnden, Shibuya-Ku, Tokyo,	Japan
১৯৬	India Marches Past Author—R. J. Minney Publisher—Janrolds Ltd., Paternoster House, Paternoster Row,	London

১৯৩৪ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৯৭	Bhupendra Singan (A Tamil publication)	
১৯৮	Condition of India (Report of the India League, 1932) Publisher—Essential News, 65 Portland	London
১৯৯	Fughan-i-Afghan (A paper)	

১৯৩৫ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
২০০	The Indian Struggle 1920—34 Author—Subhas Chandra Bose Publisher—Wishart & Co., 9 John Street,	London
২০১	Sh'ulah (A newspaper edited by Sanobar Hussain Lakarai	

১৯৩৬ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
২০২	How to make a Revolution Author—Raymond Postgate Printer—Garden City Press Ltd Letchworth, Herts. Publisher—Leonard and Virginia Woolf, 52 Tavistoch Square,	London

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
২০৩	The Face of the Mother India Authoress—Katherine Mayo Publisher—Hamist Halilton Ltd. 90 Great Russel Street.	London
২০৪	Old Soldier Sahib Author—Private Frank Richards Publisher—Faber and Faber Ltd.	London.
২০৫	The Left Book News Printer—Farleigh Press, London Publisher—Victor Gollancz Ltd. 14 Henrietta Street.	London

সমাপ্ত]

Proscribed books of the British
period—By Gurudas Bandyopadhyay

গ্রন্থমন ও গ্রন্থাগারমন

সুভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থমন ও গ্রন্থাগারমন পরস্পর নির্ভরশীল। গ্রন্থমন বিকশিত করে তুলতে গ্রন্থাগারের মাধ্যম অপরিহার্য।

ছাত্র, ছাত্রী ও দেশের যুবসমাজের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক সংযমবোধের অভাবের যে আভাস পাওয়া যায়, তার একটি প্রধানতম কারণ বোধহয় এই যে, ছাত্র, ছাত্রী ও যুবকদের অবসর মুহূর্তগুলির অপচয় হয় এমন পরিবেশে যেখানে সুসংস্কৃত জীবনবোধের অভাব। এই চিন্তাজগতের দৈন্য ও অভাববোধ থেকে গ্রন্থাগারের প্রভাব তাদের মুক্ত করতে অনেকখানি সক্ষম।

সৎ নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় করে সুন্দর জীবনে উত্তরণে গ্রন্থাগার অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ছাত্র, কৃষক, মজুর প্রত্যেকের জীবনেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা সম্বন্ধে অধিকাংশ জনসাধারণেরই ধারণা নেই।

এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করে তুলতে হবে। একাজ রাতারাতি সম্ভবপর নয়। বীজ যেমন একদিনে মহীরুহ হয়ে ওঠেনা, তাকে লালন-পালন করতে হয়, তেমনি গ্রন্থাগারমন সৃষ্টিও একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী সুষ্ঠু পরিকল্পনার।

গ্রন্থাগারমন গড়ে তুলতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসাধারণ। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আস্বাদ ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্লাসে শিক্ষকগণ যা পড়াবেন তার চেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিখে নিতে পারে, সেদিকে পথপ্রদর্শক হবেন গ্রন্থাগারিকগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে থাকে একটি বাধ্যবাধকতা, কিন্তু গ্রন্থাগারনির্ভর (Library-oriented) শিক্ষায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শুধু পুস্তকের সাহায্যই এখানে নেওয়া হবেনা, স্লাইড, ম্যাপ, ফিল্ম, রেকর্ড প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা একটি সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করবে এবং পাঠাগার হয়ে উঠবে, "Centre of intellectual life of the whole school and a means of evovling a new technique of teaching, a new conception of education".

স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী প্রণয়নকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে গ্রন্থাগারের সাহায্য শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করবেন কোন বিষয়ের ওপর অধিকতর জ্ঞান আহরণে। এই জ্ঞান আহরণের আগ্রহ ও প্রয়োজন থেকে তাকে গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য পত্র পত্রিকার সাহায্য নিতে হবে।

শুধু লিখিত পরীক্ষা বা গতানুগতিক ধারায় কোন শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা পরীক্ষা করলে ভুল করা হবে। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের ক্লাসের কার্যকলাপ এবং তার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ প্রকল্প (যাতে গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য), টিউটরিয়াল, বিতর্কসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সফলতা ও বিফলতার নির্ণয় করতে হবে।

স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচীতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের কতগুলি বিষয় অবশ্যপাঠ্য হিসাবে সংযোজিত করতে হবে, যেমন পুস্তক ব্যবহার প্রণালী, রেফারেন্স বই থেকে প্রয়োজনমত তথ্য সংগ্রহ করা, গ্রন্থসূচীর ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি। এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

গ্রন্থাগার শুধু জ্ঞান অন্বেষণেই সাহায্য করবেনা, আনন্দ পরিবেশনেও সাহায্য করবে। দৈনন্দিন কার্যধারায়, বিতর্কসভায়, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। কোন বিতর্কসভায় সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্যে কোন বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে জোরালো যুক্তির সংগ্রহ করে নিতে পারলে সেই বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে সাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বেলাতেও গ্রন্থাগারের সাহায্যে মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধরচনা অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

যে সব পাঠক সবচেয়ে বেশি বই পড়েছেন বা গ্রন্থাগারের সুব্যবহার করেছেন তাঁদের জন্য কোন পারিতোষিকের ব্যবস্থা করলে একটি নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে পারে যা গ্রন্থাগারমন সৃষ্টির সহায়ক হবে।

বর্তমান প্রসঙ্গ সম্বন্ধে প্রচার পুস্তিকা বা পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জনসাধারণ সহজেই আকৃষ্ট হন। একবার যদি কোন লোক গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে গ্রন্থাগার তার জীবনে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রচার ও জনপ্রিয় প্রবন্ধের মাধ্যমে গ্রন্থাগারমন গড়ে তুলতে হবে। প্রবন্ধগুলি কেবল বৃত্তিমূলক পত্র পত্রিকায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা, অন্যান্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

গ্রন্থাগারমন সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার আইন যথেষ্ট সাহায্য করবে। জনসাধারণ যখন গ্রন্থাগারের জন্য 'সেস' দিতে বাধ্য হবেন (যেমন বিজলীবাতির জন্য, জলের জন্য, পথের জন্য দিয়ে থাকেন), তখন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁরা ততটা উদাসীন থাকবেন না।

গ্রন্থাগারিকের সম্মান ও মর্যাদা গ্রন্থাগারমন সৃষ্টির পরোক্ষ সহায়ক হবে। গ্রন্থাগারিকের সম্মান ও পদমর্যাদা অন্যান্য দায়িত্বশীল বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের সমতুল্য হতে হবে। সেজন্য গ্রন্থাগারিকের উপযুক্ত বেতন ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র যদি গ্রন্থাগারিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য না করেন, তবে জনসাধারণের

মধ্যে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল্যমান সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দেবে। তবে একথাও সত্য যে, গ্রন্থাগারকর্মী নিজের স্বধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সমাজে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নেবেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, গ্রন্থাগারমন সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা নগণ্য নয়। গ্রন্থাগার পরিষদ উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপনে সুপরামর্শ দিয়ে, নানাপ্রকার সভা-সমিতি, ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনজীবনে গ্রন্থাগারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারেন।

গ্রন্থাগারমন সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চিন্তার দৈন্য ও নৈতিক অধঃপতন থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে এবং সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হলে, গ্রন্থাগারমন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। সেজন্য গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমনা ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তথ্যপঞ্জী

1. Chattrjee (Amitabha). Initiation in reference work. (IASLIC bull. 11, 4 , 1966 ; 245-50.

2. Wood (DN) and Barr (KP). Courses on the Structure and use of Scientific literature. (J doc. 22, 1 ; 1966; 22-32).

Book-mindedness and library-mindedness
By Subhas Chandra Mukhopadhyay

ডকুমেণ্টেশন কোর্স

জনেক

"To be without books is worse than being without food." (১) তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কোন পণ্ডিতম্মন্য প্রতিনিধি শ্রীনীরোদ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে এই মন্তব্য প্রকাশ করলে নীরোদবাবু উত্তর দিয়েছিলেন যে, যিনি জীবনে কখন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করেননি, তার মুখেই এই কথা সাজে। যাঁদের পেট বোঝাই, "খেতে পাচ্ছি না" বা "খেতে দাও" এই সব ছেঁদো কথা শুনলে তাঁরা ভয়ানক চটে যান। তাঁরা তখন বলেন ভাতের বদলে রুটি খাও, রুটির বদলে কেক, ডিম, কলা, আলু ইত্যাদি। এই পর্যন্ত আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু ভাতের বদলে বই একথা যিনি বলেন তিনি যে ভীষণ, প্রকাণ্ড, বিরাট পণ্ডিত তাতে আর সন্দেহ কি ?—

কিন্তু বই (বিভিন্ন documents) যে ভারতবর্ষের বর্তমান খাদ্য সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারে এ কথাটা সত্যি। কোন দেশের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের অব্যবহার এবং অপব্যবহার সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে এক চরমতম অপরাধ। যথাযোগ্য যোজনা ও গবেষণাই এই অব্যবহার ও অপ-ব্যবহার বন্ধ করতে পারে এবং গবেষণা কার্যের সহায়তার জন্য ও সাফল্যলাভের জন্য documentation work হ'ল একান্ত জরুরী।

বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের জন্য জনসংখ্যার বাড় বাড়ন্ত অবস্থাই একমাত্র দায়ী একথা সমাজতাত্ত্বিকরা মানতে রাজী না হলেও জাতীয় নেতারা দিবারাত্রি এ কথা ঘোষণা করে চলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নানান সম্পদের অব্যবহার এবং অপব্যবহার বর্তমান অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়।

ভারতবর্ষে জমির পরিমাণ ৭২১ মিলিয়ন একর। বর্তমানে এই জমির মাত্র শতকরা ৪৬ ভাগ জমিতে চাষাবাদ করা হয়। সুতরাং বাকি অনাবাদী ২০৫ মিলিয়ন একর জমির বেশীর ভাগ অংশকে যতশীঘ্র সম্ভব আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সারের সাহায্যে আবাদ করে সোনা ফলানোর চেষ্টা করা আশু কর্তব্য।

শুধু জমি নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে জমি ছাড়া নদনদীর জল, মাটির তলার জল, সামুদ্রিক সম্পদ, ধাতব সম্পদ এবং ভারতবর্ষের বিরাট জনসম্পদ প্রভৃতিকে কাজে লাগাতে হবে এবং তার জন্য চাই যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণাগার। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত সরকার এই খাতে খুব সামান্য অর্থই ব্যয় করে থাকেন প্রয়োজনের তুলনায়। সুতরাং সকলেই স্বীকার করেন যে, এই সামান্য অর্থের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে শাখা গবেষণা কার্যে সহায়তা করবার গুরু দায়িত্ব পালন করে তার নাম Documentation Service। গবেষণায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের যাবতীয়

প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য চাওয়ামাত্র পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব এই বিভাগের প্রতিটি কর্মীর। কিন্তু এই কাজের কতগুলি সমস্যা আছে। যেমন :

(ক) Documents-এর প্রাচুর্য। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষজ্ঞ কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে যত documents ছাপা হয় সেগুলিকে যদি কেবলমাত্র পড়ে শেষ করতে চান তাহলে দশভাগের মাত্র একভাগ তিনি পড়ে শেষ করতে পারবেন।

(খ) ভাষার সমস্যা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় নানা documents ছাপা হচ্ছে। কতগুলি ভাষা একজন বিশেষজ্ঞ শিখবেন ?

(গ) প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে সমস্ত documents পাওয়া আর এক দুর্ভাবনা।

বিশেষজ্ঞদের আর এই সব দুর্ভাবনার কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। সমস্ত বাধা দূর করে বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় সাহায্য করবার জন্য Documentalist এর দল এগিয়ে এসেছেন। এঁদেরকে তাই বলা হচ্ছে "Partners in Progress"। ভারত সরকার যে এই কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত তার প্রমাণ দিল্লীর Indian National Scientific Documentation Centre-সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি INSDOC।

যাঁরা এই কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত তাঁরা সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন যখন প্রফেসর এস আর রঙ্গনাথনকে জাতীয় গবেষক-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হ'ল। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা Documentation-এর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করছেন, বাঙ্গালোরে অবস্থিত Documentation Research Training Centre নামক প্রতিষ্ঠানে যার সংক্ষিপ্ত নাম D.R.T.C.। ভারত সরকার Indian Statistical Institute-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ করে দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করব যে, মহীশূর সরকার এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ও অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আকাদেমিক স্বীকৃতি দানে বিলম্ব করবেন না।

আমাদের দেশে যত নতুন নতুন গবেষণার কাজ শুরু হবে ডকুমেণ্টেশনের প্রয়োজনীয়তা তত বেশী করে উপলব্ধি করবেন বিশেষজ্ঞগণ। ডকুমেণ্টালিস্টদের চাহিদাও ততই বাড়বে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সর্বপ্রথম বাঙ্গালোরে D.R.T.C নামক প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর ডকুমেণ্টেশন—বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খুবই আনন্দের কথা যে এখানে শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে এখানকার শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আছে তাদের সঙ্গে বাঙ্গালোরের শিক্ষণ পদ্ধতির পার্থক্যের কথাও জানতে পারা যায়। তার প্রধান কারণ বোধহয় প্রফেসর রঙ্গনাথনের মত ব্যক্তির

উপস্থিতি এবং যার ফলে "পরীক্ষা পাশ করার জন্য পড়া" এই নীতির পরিবর্জন।

দিল্লীর INSDOC-এ ডকুমেণ্টেশন বিজ্ঞান শিক্ষণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ভারতবর্ষে এই শিক্ষণের সেটি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রথমটি ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং দ্বিতীয়টি উত্তরে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের শরিক বাঙাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন উচ্চতর কোর্স প্রবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘকাল। কারণ কিছু ভাল চাকরীর বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে মুদ্রিত হলেও বাঙলাদেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীরা সেসব পদের জন্য আবেদন করতে পারেন না, এমন কি, দিল্লী বা বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের M. lib. Sc. কোর্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরীয়ানশিপ পাশ কর্মীরাও, Colon Classification এবং Classified Catalogue Code-এর সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্য।

এমনই কিছু গ্রন্থাগার কর্মীর আগ্রহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থির করেছিলেন একটা বিশেষ শিক্ষণব্যবস্থা পরিচালনা করার কথা, যার উদ্দেশ্য হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রফেসর রঙ্গনাথনের উল্লেখযোগ্য কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস থেকে এই কোর্স শুরু করা যায় কিনা পরিষদের কর্মীরা এই কথা ভাবছিলেন। এমনই সময় ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি IASLIC (Indian Association of Special Libraries and Information Centre) স্থির করলেন Special Librarianship and Documentation Course শিক্ষণ ব্যবস্থার শুরু করবেন ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এবং কিছু দেরী হলেও নভেম্বর মাসের ১৫ই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। IASLIC-এর এই কোর্স এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থার তৃতীয় প্রচেষ্টা। IASLIC একটি সবভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতায় এর কার্যালয়। বহুমুখী কার্য-প্রণালীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে কোনরকম আর্থিক সাহায্য করেন না। প্রতিষ্ঠানটির নিজের বাড়ী এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও আর এক দুর্ভাবনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক উপযুক্ত গ্রন্থাগার ক্লাশঘরের কাছেই না থাকলে পঠনপাঠনের বিশেষ অসুবিধা হবার কথা। DRTC-তে শুনেছি প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি ক্লাশঘরে নিজের নিজের ডেস্কেই থাকে। এই অসুবিধা সম্বন্ধে সাধারণ সম্পাদক মহাশয় যে সম্পূর্ণ সজাগ তার প্রমাণ পাওয়া গেল উদ্বোধনের দিন যখন তিনি অসুবিধাগুলির কথা একে একে আলোচনা করলেন।

কোর্সের এটী প্রথম বছর। যে সিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে তা যথেষ্ট বিস্তারিত

নয় এবং ঠিক কি জিনিস কতখানি পড়ান হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে শিক্ষকদের ওপর। প্রথম দল শিক্ষার্থীদের পড়ান শেষ হলে তবেই মোটামুটি বোঝা যাবে সিলেবাসের আসল চেহারাটি কি? অর্থাৎ বর্তমান সিলেবাসে যে কাঠামোটা দেওয়া হয়েছে তাতে রক্ত মাংস লাগবে এক দুই বছর পড়ানোর পরে।

বর্তমান বছরে মোট ২৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে মাত্র ৫ জন ছাত্রী। ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ন্যূনতম মাপকাঠি দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র স্নাতক হলেই চলে। ন্যূনতম যোগ্যতা কি হওয়া প্রয়োজন পরবর্তী বছরে কর্তৃপক্ষ হয়তো নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন।

যে ২৯ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বছরেই ভর্তি হয়েছেন তাঁরাই এই কোর্সকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন। সকলেই আশা করবেন যে, সংশ্লিষ্ট সকল তরফ থেকেই এই কোর্সের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু এর জন্য কর্তৃপক্ষকে যে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে তা হল শিক্ষকতার মান। এই বিষয়ে কোনরকম চক্ষুলজ্জার অবকাশ যেন না থাকে। প্রথম থেকেই যদি এ ব্যাপারে কোন দুর্বলতা থেকে যায়, ভবিষ্যতে তা অত্যন্ত অমঙ্গলের কারণ হয়ে দেখা দেবে। সুতরাং শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের জন্য অপেক্ষা করছেন ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীরা।

কর্তৃপক্ষ এই কোর্স প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সৎসাহস এবং এই ধরনের বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার্হ। সুতরাং আমরা আশা করব এই কোর্সের সমস্ত দিক সম্বন্ধেই তাঁরা সচেতন এবং কোন বিষয়েই কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় তাঁরা নিশ্চয়ই দেখাবেন না। IASLIC-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে আরও একটি নতুন দায়িত্ব সংযোজিত হল। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হোক এবং এই কোর্সের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই আমাদের একান্ত কাঙ্ক্ষিত কামনা।

References :

(১) J'accuse the starvers of the people—Nirad Chandra Chaudhuri. (Now-V3, No 11, Dec. 16, 1966).

(২) Natural Resources and Documentation – G. Bhattacharyya (Library Service for All : Mysore Library Association series : 2, Library Week Souvenir, 1966).

Documentation Course
By Janeka.

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার

কুণাল সিংহ

চব্বিশ পরগণা আর নদীয়ার সীমানায় একটা ছোট্ট ব্রীজ। সেটা ছাড়িয়ে কল্যাণীর দিকে অল্প পথ এগুলেই 'রথতলা'। এরই সন্নিকটে ছিল কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্তের বাসস্থান। "প্রভাকর পত্রিকা"র এই সম্পাদকের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সন্ধানের আশায় একদিন এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখা গেল এখন ঈশ্বরগুপ্তের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষটুকু মাত্র আছে। আর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে একটি প্রস্তর ফলক। এর অল্প দূরে ঈশ্বরগুপ্তের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারটিকে এখন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে সচরাচর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির যে ধরণের আকৃতি দেখতে পাই তার তুলনায় ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার সত্যিই সুন্দর বলতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঈশ্বরগুপ্তের কোনও স্মৃতিচিহ্ন বা তার লেখা কোনও উল্লেখযোগ্য পুরাতন পুস্তক এখানে পাওয়া যাবে না।

একসময়ে গঙ্গার কাছাকাছি বাংলাদেশের এইসব জায়গাগুলির বিশেষ সমৃদ্ধির কথা শোনা যেত। তারপর মহামারীর প্রকোপে সব কিছুই বিলুপ্তির অতল তলে তলিয়ে যায়। কাঁচরাপাড়ার পূর্বতন নাম ছিল কাঞ্চনপল্লী। অনতিদূরে হালিসহরের নামও কারো কাছে অপরিচিত নয়। কল্যাণীর 'ঘোষপাড়া'র মেলাটিও সর্বজনবিদিত। তবু বর্তমানের আর একশো বছর আগেকার ইতিহাসের মধ্যে যে সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগ বিরাজ করেছে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও এখানে বিদ্যমান। এই তো সেদিনও এখানকার পথঘাট ছিল শ্বাপদ-সংকুল, দস্যুর ভয়ে রাতের অন্ধকারে পথচলা ছিল বিপদজনক।

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগারটির জন্ম বেশীদিন নয়। তবে বহুকাল আগে থেকে কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রথম সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার নামানুসারে এই গ্রামে বিভিন্ন সংস্থা ছিল। তার মধ্যে "প্রভাকর লাইব্রেরী", "প্রভাকর ড্রামাটিক পার্টি", "প্রভাকর কনসার্ট ক্লাব", "প্রভাকর স্পোর্টিং ক্লাব" প্রভৃতি অন্যতম। কিন্তু অর্থাভাবে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর দমননীতির প্রকোপে এই সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। সর্বশেষে "প্রভাকর স্পোর্টিং ক্লাব"টিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই সময় ক্লাবের খেলার মাঠটিও ভারত সরকার অর্ডিনান্স বলে অধিকার করে নেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের এক বৃহৎ অংশও তখন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেই শূণ্যস্থান পূর্ণ করলে USA Arms and Ammunition Department.

স্বাধীনতালাভের পর কল্যাণী নগরীটি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জায়গার উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা করা হ'ল। সেই পুনর্গঠনের সময়েই গ্রামের বালকদের উৎসাহে এবং শ্রীমিহিরকুমার রায়চৌধুরীর পরিচালনায় তাঁর গৃহে "আদর্শ পাঠাগার" নামে একটি

ছোট্ট পাঠাগার বালকবালিকাদের জন্য স্থাপন করা হয়। পরে এই পাঠাগারটি মদনপুর কল্যাণী মণ্ডল কংগ্রেস সেবাদল কার্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কবি ঈশ্বরগুপ্তের নামানুসারে তার "ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার" নামকরণ করা হয়। এর পর কাঁচরাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, ডাঃ কালিপদ সেনগুপ্ত, পাঠগৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। উক্ত জমির উপরই বর্তমান পাঠাগারটি ১৩৬৪ সালে নির্মিত হয়।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রবেশ মূল্য ১৲ টাকা এবং মাসিক চাঁদা ৩৭ পয়সা। জমা লাগে ৫৲ টাকা। পূর্বে পাঠাগার থেকে ১ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে একই স্থানে ন্যূনতম চারজন সদস্য থাকলে এখান থেকে প্রতি সপ্তাহে বই সরবরাহ করা হ'ত। বর্তমানে, বিশেষ করে প্রচুর বই ক্ষয়ক্ষতির পর, এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। পাঠাগার প্রতিদিন (শনিবার ও সাধারণ ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল সাতটা থেকে নয়টা এবং বিকেলে চারটে থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের কোনও গ্রন্থাগারিক নেই। তবে যিনি এখন গ্রন্থাগারটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন তার নাম শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী। যে কয়দিন গ্রন্থাগারটিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল সে কয়দিনই আমি গুটিকয় লোককে সর্বদাই বই নিতে বা লাইব্রেরীর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। অন্য অনেকক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ঘর যেমন পাড়ার লোকেদের খোসগল্পের জায়গা হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে। এটা নিশ্চয়ই ভাল লক্ষণ বলতে হ'বে। এখানে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৩০০। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। বই কেনার জন্য সরকারের কাছ থেকে মাসে ৫০৲ টাকা করে পাওয়া যায়। তবে কর্মচারীদের মাইনে আসার ব্যাপারে অকারণ বিলম্ব আজও একটা পীড়াদায়ক সমস্যার সৃষ্টি করে আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'নিখিল বঙ্গ ঈশ্বরগুপ্ত জয়ন্তী উৎসব কমিটি' কর্তৃক পাঠাগার সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিমন্দির ও তাঁর বাস্তুভিটার অবশিষ্টাংশ এখন কল্যাণীর অন্তর্গত। তবে সংস্কারের অভাবে এ সবই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

Libraries of Bengal :
Iswar Gupta Pathagar
By Kunal Sinha.

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি পেশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী এই রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের নিকট বিগত ২৬শে এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এবং ইহার অন্যান্য সদস্য ছিলেন ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার (মুখ্য-গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ), অমলাংশু সেনগুপ্ত (গ্রন্থাগারিক, ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর), সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), প্রবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদক, বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিমণ্ডলীর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং বলেন যে, নীতিগতভাবে তিনি মনে করেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও পদমর্যাদা হওয়া উচিত। তিনি আশ্বাস দেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহা অনুধাবন করা হইবে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি যথাসাধ্য সুবিচারের চেষ্টা করা হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মীদের নানাবিধ সমস্যা ও দাবী শিক্ষামন্ত্রীর নিকট তুলিয়া ধরেন। নিম্নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বয়ান দেওয়া হইল।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে স্মারকলিপি

১। কোন দেশের সামাজিক—অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুসমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। সব উন্নত দেশেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথোচিত বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উপযোগিতা ও মান নির্ভর করে গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে শুরু করিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে সব গ্রন্থাগার কর্মী নিজেদের গ্রন্থাগারের সেবায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন তাহাদের বেতন ও পদমর্যাদার অবস্থা খুবই শোচনীয় ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

২। গত দশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অন্যান্য বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলির সহিত মিলিতভাবে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট— যথা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ডি. পি. আই, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষর নিকট স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীতও বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পরিষদ সম্মেলন, সভা, ডেপুটেশন ইত্যাদির আয়োজন করিয়াছে। এক কথায় পরিষদ শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক সকল পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক অবস্থা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। মূল্যবৃদ্ধিও মুদ্রাস্ফীতির চাপে এই অবস্থা বর্তমানে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। পরিষদ আশা করে যে, কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিশীল কার্যের দ্বারা গ্রন্থাগার কর্মীদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ ও কষ্টের লাঘব হইবে।

৩। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক অ-স্বাচ্ছল্যের কথা বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাহাদের বেতন ও পদমর্যদার প্রশ্নটি তুলিতে চায়না, সমুন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র, সমগ্র দেশ ও জাতি যাহাতে উপকৃত হয় তাহার জন্যও পরিষদ এই প্রশ্নটি তুলিয়া ধরিতে চায়। উপযুক্ত বেতনপ্রাপ্ত এবং চাকুরীজীবনে নিরাপত্তা আছে এই ধরনের সন্তুষ্ট কর্মীদের নিকট হইতে আমরা গ্রন্থাগারের উন্নততর ও সন্তোষজনক কার্যকলাপ আশা করিতে পারি। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যদি তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হয়, তাহাদের সর্বপ্রকার সুবিচার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্তরে নৈরাশ্যের ভাব দানা বাঁধিবেই এবং এই মনোভাবই অবশেষে জাতীয় অপচয়ের দিকে লইয়া যাইবে। কেননা, হতাশাগ্রস্ত নৈরাশ্যময় কর্মীদের উদ্যোগবিহীন কার্যকলাপ শুধু যে জাতীয় উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীতে কোন ভূমিকাই পালন করিতে পারে না তাহাই নয়, ইহা জাতীয় অগ্রগতিকেও ব্যাহত করিতে পারে। যদি এই নৈরাশ্যজনক মনোভাবকে অবিলম্বে প্রতিরোধ করা না যায়, তাহা হইলে অবস্থা আরও অবনতির দিকে এবং আয়ত্তের বাইরে চলিয়া যাইবে। এই অবস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন মতেই চায়না এবং সর্বতোভাবে তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

(ক) রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত (স্পনসর্ড) গ্রন্থাগারগুলির বেতনের হার ইত্যাদি

(ক ক) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত (স্পনসর্ড) সাধারণ গ্রন্থাগার

১। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের উদ্যোগে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। প্রায় ১৫০০ গ্রন্থাগার কর্মী ৬০০ গ্রামীণ

আঞ্চলিক, মহকুমা, সহর এবং জেলাগ্রন্থাগারগুলিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। যেহেতু এই স্মারকলিপিতে আমাদের কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইবে, সেহেতু এই গ্রন্থাগারগুলির কার্যবিধি সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা হইতে আমরা বিরত থাকিব। রাজ্য সরকার যদি আমাদের অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা একটি পৃথক স্মারকলিপি পেশ করিয়া জানাইতে পারি যে কিভাবে এই গ্রন্থাগারগুলি জাতির সেবায় ও কল্যাণে আরো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে।

২। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এইসব গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দকে বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া অতি নগণ্য নির্দিষ্ট (Consolidated) বেতন দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময় অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট হইতে মৌখিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহাদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্যের বীজ দানা বাঁধিতে শুরু করে। অবশেষে ১-৪-১৯৬৪ তারিখ হইতে একটি বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এই বেতনক্রম সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের আশাতীতভাবে হতাশ করিয়া দেয়; কারণ, বহু বৎসর ধরিয়া গ্রন্থাগার কর্মীরা যে ন্যায্য বেতনক্রম আশা করিয়া আসিতেছিল তাহার তুলনায় নূতন বেতনক্রম অত্যন্ত নগণ্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বপুর্ণ কার্যবলী, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের সামাজিক—অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যাহাতে ন্যায্য ও সুপরিকল্পিত বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয় তাহার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ বিভিন্ন সময়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে অনুধাবন করা যাইবে যে নূতন বেতনক্রম হইতে গ্রন্থাগার কর্মীরা অতি সামান্যই লাভ করিয়াছে।

(ক) জিলা, মহকুমা, সহর, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম— ১লা এপ্রিল ১৯৬৪-র আগে ও পরে।

গ্রন্থাগার	কর্মীর পদ ও যোগ্যতা	৩১।৩।১৯৬৪ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বেতন	১।৪।১৯৬৪ হইতে নূতন বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
জিলা গ্রন্থাগার	(১) গ্রন্থাগারিক		
	(১) অনার্স বা মাষ্টারস ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি	২৫০ টাকা	(১) ২১০-১০-৪৫০ টাকা এবং ২৫ টাকা ভাতা
	(২) ব্যাচিলর ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি।	ঐ	(২) ১৬০ ৭-২২৩-৮-২৯৫ টাকা এবং ২৫ টাকা ভাতা।

গ্রন্থাগার	কর্মীর পদ ও যোগ্যতা	৩১।৩।১৯৬৪ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বেতন	১।৪।১৯৬৪ হইতে নূতন বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
জিলা গ্রন্থাগার	(১) গ্রন্থাগারিক		
ঐ	(২) সহকারী গ্রন্থাগারিক (কেবল মাত্র পশ্চিম দিনাজপুর জিলায়) ব্যাচিলর ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি।	১২৫ টাকা	১৬০-৭-২২৩-৮-২৯৫ টাকা
ঐ	(৩) লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট	৭৫ টাকা	৮০-১-৯০-২-১১০-৩ ১২৫ টাকা (ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত আণ্ডার গ্রাজুয়েটরা ২টি অগ্রিম ইনক্রিমেণ্ট পাইবে। (খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এইচ. এস. সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মীরা একটি অগ্রিম ইনক্রিমেণ্ট পাইবে।
ঐ	(৪) লাইব্রেরী এ্যাটেনডেণ্ট	৬০ টাকা	৬৫-১-৮৫ টাকা
ঐ	(৫) ড্রাইভার	১২৫ টাকা	১০০-৩-১৩৬-৪-১৪০ টাকা
ঐ	(৬) ক্লিনার, পিওন, দারওয়ান, নাইট ওয়াচম্যান	৪৫ টাকা	৪৫-½-৫৫ ১-৬০ টাকা
মহকুমা/সহর গ্রন্থাগার	(১) গ্রন্থাগারিক ব্যাচিলর ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি		১৬০-৭-২২৩-৮ ২৯৫ টাকা
ঐ	(২) লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল ফাইনাল ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত।		৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২৫ টাকা
	(৩) পিওন		৪৫-½-৫৫-১-৬০ টাকা

গ্রন্থাগার	কর্মীর পদ ও যোগ্যতা	৩১।৩।১৯৬৪ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বেতন	১।৪।১৯৬৪ হইতে নূতন বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	(১) গ্রন্থাগারিক স্কুল ফাইনাল ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত	৫৫-৮০ টাকা এবং ২৫ টাকা ভাতা	৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২৫ টাকা
ঐ	(২) সাইকেল পিওন	৪৫ টাকা	৪৫-½-৫৫-১-৬০ টাকা
গ্রামীণ গ্রন্থাগার	(১) গ্রন্থাগারিক স্কুলফাইনাল এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত	৭৫ টাকা	৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২৫ টাকা
	(২) সাইকেল পিওন	৪৫ টাকা	৪৫-½-৫৫-১-৬০ টাকা

(খ) টাকী, কালিম্পং ও বাণীপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (জিলা গ্রন্থাগারের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সরকারের পরিচালনাধীন) কর্মীদের বেতন :

পদ :	বেতন ও ভাতা
(১) গ্রন্থাগারিক	২৫০-১৫-৫৫০ টাকা এবং ৪০ টাকা ভাতা
(২) সহকারী গ্রন্থাগারিক	১৭৫-৭-২৪৫-৮-৩২৫ টাকা এবং ২৮ টাকা ভাতা
(৩) লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট	১২৫-৩-১৪০-৪-২০০ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৪) লাইব্রেরী অ্যাটেণ্ডেণ্ট	৬০-½-৬৫-১-৭৫ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৫) পিওন, দপ্তরী, মালি-কাম-গার্ড, ক্লিনার, নাইট ওয়াচ ম্যান।	৬০-½-৬৫-১-৭৫ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৬) ড্রাইভার	১০০-৩-১৩৬-৪ ১৪০ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা

[উপরোক্ত কর্মীদের ভাতা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

৩। প্রবর্তিত বেতনের হারগুলি নানা কারণে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এই কারণগুলির মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(ক) বর্তমানের ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু এই বেতনক্রম অতি নগণ্য নহে ; গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের গুরুদায়িত্ব, তাহাদের অভিজ্ঞতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সমাজের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অগ্রগতিতে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিচার করিলে এই বেতনের হারগুলি অত্যন্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে।

(খ) এই সকল বেতনের হার চালু হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার কর্মীরা শুধু যে লাভবান হন নাই তাহা নহে, সর্বক্ষেত্রেই তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। যখন হইতে এই

বেতনক্রম প্রবর্তিত হয় (১৯৫১ সাল হইতে) তখন হইতে তাহাদের নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে সরকার নূতন বেতনক্রম প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু এই সব কর্মীরা যদি প্রথম হইতে কোন বেতনের হার পাইতেন তাহা হইলে তাহারা ইনক্রিমেণ্ট' ভাতা, বেতনের হারের পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে অন্ততপক্ষে কিছু আর্থিক সুবিধা পাইতেন। কিন্তু এই সব প্রশ্নের প্রতি অবহেলা দেখাইয়া বর্তমানের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এমন একটি বেতনক্রম সরকারের পক্ষ হইতে প্রবর্তন করা হইয়াছে যাহা অত্যন্ত নগন্য ও হতাশাব্যঞ্জক। উপরোক্ত বেতনের হারগুলি হইতে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে এই নূতন বেতনক্রম চালু হইবার পর তাহারা শুধু লাভবানই হন নাই, তাহা নয়, তাহারা ক্ষতিগ্রস্থও হইয়াছেন।

(গ) এই বেতনের হার নির্ধারণের সময় কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাত-মুক্ত সঙ্গতিপূর্ণ নীতি অনুসৃত হয় নাই। একই শ্রেণীভুক্ত ও একই প্রকার কার্যে ও দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রন্থাগার কর্মীরা সরকার পরিচালিত ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারে একই ধরনের বেতনের হার পান না। আনন্দের কথা যে টাকী, বানীপুর এবং কালিম্পংএর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কিছুটা উন্নতধরনের বেতনক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু কেন যে সমপদে থাকিয়া এবং একই ধরণের কাজ করিয়াও অন্যান্য গ্রন্থাগারের কর্মীরা সমতুল্য বেতনের হার হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা আমাদের নিকট বোধগম্য নহে। একই শ্রেণী ও মর্যাদাসম্পন্ন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বেতনের হারের পার্থক্য নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হইতে বোধগম্য হইবে :—

পদ	জিলা গ্রন্থাগার	টাকী, কালিম্পং ও বানীপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
১) গ্রন্থাগারিক	(ক) ১৬০-২৯৫৲ +২৫৲ ভাতা (ব্যাচিলর ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি) (খ) ২১০-৪৫০৲ +২৫৲ ভাতা (এম. এ./অনার্স এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি)	২৫০-৫৫০ টাকা + ৪০ টাকা ভাতা + পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অপরাপর সুবিধা।		

টাকী, কালিম্পং ও বানীপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

পদ	জিলা গ্রন্থাগার	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
২) সহকারী গ্রন্থাগারিক	১৬০-২৯৫ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর)	১৭৫-৩২৫ টাকা+ ২৮ টাকা ভাতা+ ঐ		
৩) লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টেন্ট	৮০-১২৫ টাকা	১২৫-২০০ টাকা+ ভাতা ১৫ টাকা+ ঐ		
৪) লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেন্ট	৬৫-৮৫ টাকা	৬৫-৭৫ টাকা+ ১৫ টাকা ভাতা। ঐ		
৫) ড্রাইভার	১০০-১৪০ টাকা	১০০-১৪০ টাকা+ ১৫ টাকা ভাতা+ ঐ		
৬) পিওন, ক্লিনার, দারোয়ান, প্রহরী, দপ্তরী, ইত্যাদি।	৪৫-৬০ টাকা	৬০-৭৫ টাকা+ ১৫ টাকা ভাতা+ ঐ	৪৫-৬০ টাকা	৪৫-৬০ টাকা

(ঘ) যদিও গ্রন্থাগারিকদের কাজের দায়িত্ব সাধারণ কেরানীদের অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং যদিও অধিকাংশ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেণ্টদের স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ও গ্রন্থাগারের কাজের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তথাপি তাহাদের অতি নগণ্য বেতনের হার (৮০—১২৫ টাকা) দেওয়া হইয়াছে। এই বেতনের হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোয়ার ডিভিসন কেরানী (যাহাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা হইল স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেট) তাহাদের বেতনের হার (১২৫—২০০ টাকা) অপেক্ষাও কম।

(ঙ) রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে সব সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন, যথা, মহার্ঘ্যভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি, তাহা হইতে সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের কর্মীরা বঞ্চিত।

(চ) এমনকি এই নগণ্য বেতনও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীরা যথাসময়ে পান না। কর্মীদের মাসিক বেতন দুই মাস বা তিন মাস বা আরও অধিক কাল অন্তর দেওয়া

এখন স্বাভাবিক নিয়মের মত হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে বেতন যদি যথাসময়ে না পাওয়া যায় তাহা হইলে পরিবার পালন করা যে কত কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তাহা বলা বাহুল্য।

(কখ) **প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার**

প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে যথা, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, আইনসভা গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন অত্যন্ত শোচনীয় ও নগণ্য। তাহাদের বেতন যে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইল গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা। ইহার ফলে তাহাদের যে বেতন স্থির হইয়াছে তাহা তাহাদের কাজের দায়িত্ব, কাজের মান, অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার তুলনায় ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

৪। **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত দাবী পেশ করিতেছে:**

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নপ্রদত্ত যে বেতনের হার দাবী করিতেছে তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে করে এবং তাহা যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

পদ	গ্রন্থাগার (১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	ক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খ) সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার	(ক) জেলা গ্রন্থাগার (খ) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (টাকী, কালিম্পং, বানীপুর) (গ) বিধানসভা গ্রন্থাগার	(ক) মহকুমা/সহর গ্রন্থাগার (খ) বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার	(ক) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (ঘ) গ্রামীণ গ্রন্থাগার	ফিডার গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগারিক	সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস (সরকারী কলেজের প্রফেসর)	সরকারী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস (সরকারী কলেজের লেকচারার)	জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক	আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক
সহকারী গ্রন্থাগারিক	সরকারী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক	জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক		

বৃত্তিকুশলী কর্মী সরকারী ও সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বিভিন্ন পদের মধ্যে সুসঙ্গতি আনিতে হইবে এবং তাহাদের নিম্নপ্রদত্ত পদ ও বেতনক্রম দিতে হইবে :

(ক) সিনিয়র টেকনিকাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (ডিপ. লিব. এমসি/বি. লিব. এমসি) : বেতনের হার সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের তুল্য।

(খ) জুনিয়র টেকনিকাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট) : জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতনের হার।

অ-বৃত্তি কুশলী কর্মী লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট ও লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেন্টদের বিভিন্ন পদের মধ্যে সুসংগতি আনিতে হইবে। এবং নিম্নপ্রদত্ত বেতনক্রম ও পদ দিতে হইবে :

(ক) সিনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতনের অনুরূপ।

(খ) জুনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়র এ্যাসিষ্ট্যান্টদের বেতনের অনুরূপ।

পিওন, দপ্তরী, নাইট ওয়াচম্যান, ক্লিনার ও ড্রাইভার। এই সকল পদের কর্মীদের পদ ও বেতনের হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐ সব শ্রেণীর কর্মচারীদের অনুরূপ করিতে হইবে।

বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যাবলী, তাহাদের কাজের মান ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া এই ধরনের বেতনের হার চালু করিবার দাবী করা হইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিচার করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষক সম্প্রদায়ের সমতুল্য করা হইয়াছে। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়ের মতই গুরুদায়িত্বভার বহন করিয়া থাকেন। এই দাবী ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের অনুরূপ।

(খ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের রাজ্যসরকারের কর্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্পনসর্ড প্রথা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

(গ) রাজ্য সরকারের কর্মীদের যে মহার্ঘ্যভাতা, চিকিৎসাভাতা, ছুটির সুযোগ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও দিতে হইবে।

(ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্যসরকারের কর্মীদের অনুরূপ সার্ভিস রুল প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঙ) মাসিক বেতন নিয়মিত ঠিক সময়ে দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(চ) যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত শিক্ষা নাই তাহাদের পূর্ণ বেতনসহ ডেপুটেশন দিয়া শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যে সব গ্রন্থাগারে মহিলা গ্রন্হাগার কর্মী আছে তাহাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

(ছ) শিক্ষক সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের অনুরূপ গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে।

(জ) গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও পদ্ধতি এবং সুসঙ্গতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে, গ্রন্থাগারিককে পদাধিকার বলে এই সব কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলে যে শীতকালীন ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে, ঐ সব অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঐরূপ ভাতা দিতে হইবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের বেতনের হার ইত্যাদি ঃ

১। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করিয়া গত ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কতকগুলি বেতনের হার চালু করিবার জন্য সুপারিশ করেন (F63–2/60 (SS) dt. 18. 1. 1961) এবং পরে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন সার্কুলারে সুপারিশগুলি বারবার উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনের হারগুলি সুপারিশ করেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অধ্যাপক, রীডার ও লেকচারারের এবং কলেজের ক্ষেত্রে লেকচারারের বেতনের অনুরূপ (F. 63—2 61 (SS) dt. October, 1962। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আরও সুপারিশ করেন যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর (বর্তমানে কর্মরত) ইউ জি সি নির্দিষ্ট যোগ্যতা নাই অথচ দীর্ঘদিন ধরিয়া নিষ্ঠা সহকারে তাহারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের সম্পর্কে নিজ নিজ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করিলে তাহারাও ইউ জি সি বেতন-ক্রম পাইবেন (F. 63–2/61 (SS) dt. 1. 5. 62)। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই বেতনক্রম প্রবর্তন করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহার শতকরা ৮০% ইউ জি সি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন যদি শতকরা ২০% বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন। ছাত্রদের প্রাইভেট কলেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৫০% ভাগ এবং মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৭৫% ইউ জি সি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন যদি বাদবাকী ব্যয়ের দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন।

২। কেন্দ্র পরিচালিত বিশ্বভারতী বিশ্বালয়ের কথা বাদ দিলে এই রাজ্যের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করা হয় নাই। কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু সর্বোচ্চ পদটির (মুখ্য গ্রন্থাগারিক) ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন অধ্যাপকের বেতন দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কলেজের ক্ষেত্রেও এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকমাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নূতন বেতনক্রম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির গ্রন্থাগারের যোগ্য কর্মীরা যাহাতে পান তাহার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় ম্যাচিং গ্রাণ্ট চাহিয়া একটি পত্র রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু বাহ্যতঃ রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই। ইহাও জানা গিয়াছে যে, রাজ্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় ম্যাচিং গ্রাণ্ট (অতিরিক্ত ব্যায়ের শতকরা ২০%) দেন, তাহা হইলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করিতে প্রস্তুত আছেন।

৩। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির যে সব গ্রন্থাগার কর্মী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ইউ জি সি-র নূতন বেতনক্রম পাইবার আশায় আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাদের মনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদিত বেতনক্রম যে কতখানি আশার সঞ্চার করিয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, আরও কিছু কর্মী ইতিমধ্যে অবসরও গ্রহণ করিয়াছেন। ইউ জি সির এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী না হওয়ার ফলে অনেকেই হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফলে শিক্ষা জগতে গ্রন্থাগারিকতা-বৃত্তি একটি বিষাদময় হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং ইহা সহজে অনুমেয় যে, গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু উন্নয়নের পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করে। দীর্ঘ ছয় বৎসর পরেও কোন কিছুই আদায় হয় নাই এবং আমরা একই অবস্থায় আছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা পুনরায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন ও আয়ত্তের বাহিরে না চলিয়া যায়।

৪। কলেজ, পলিটেকনিক এবং ডে স্টুডেন্টস্ হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা অতীব শোচনীয়। একই ধরনের কোন সুসঙ্গতিপূর্ণ বেতনক্রম তাহাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় নাই। বেসরকারী কলেজগুলিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন নীতির উপর ভিত্তি না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত বেতনক্রম চালু করিয়াছেন। সরকারী ও স্পনসর্ড কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বেতনক্রম চালু করিয়াছেন। বর্তমান জগতে ইহা একটি অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয় নীতি। ইহা অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। গ্রন্থাগার কর্মীদের

বেতনক্রম নির্দ্ধারণের এই পরিত্যক্ত নীতি অবিলম্বে বর্জন করিয়া ইউ জি সি যে যুক্তি-প্রসূত ও সুসঙ্গতিপূর্ণ নীতি সুপারিশ করিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বেসরকারী কলেজগুলিতে একই বেতনক্রম চালু করা হয় নাই এবং কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলীর গুরুত্বের কথা চিন্তা করা হয় নাই। বড় বড় কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বৃত্তিকুশলী কর্মীদের খুবই নগণ্য বেতন দেওয়া হইয়া থাকে।

৫। অনার্সমানের কলেজ এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলির (যথা, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ভেটারিনারী কলেজ, আইন কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ ইত্যাদি) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ইউ জি সি-র সার্কুলারে বলা হয়েছে যে কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজের লেকচারারের অনুরূপ বেতন দিতে হইবে। কিন্তু এই সার্কুলারে অনার্সমানের কলেজ এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীরা যে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন, বিশেষ ধরনের কার্যাবলী সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং সর্বোপরি যে বিশেষ ধরনের পাঠকদের বিভিন্ন চাহিদা তৃপ্ত করিয়া থাকেন তাহার স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। তদুপরি ইউ জি সি সার্কুলারে সর্বধরনের কলেজগুলিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

৬। সরকারী, স্পনসর্ড এবং বেসরকারী কলেজগুলির গ্রন্থাগার কর্মীদের যে মহার্ঘ্য-ভাতা এবং অন্যান্য ভাতাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সম্প্রদায় ও ডেমোনেষ্ট্রেটারদের চেয়ে অনেক কম। এই অসঙ্গতি অবিলম্বে দূর করিতে হইবে।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি দাবী করিতেছে ঃ

(১) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক এবং ডে-ষ্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত দাবী পেশ করিতেছে :

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি সুপারিশ অবিলম্বে সুপারিশের দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

(খ) কলেজগুলির সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রেও ইউ জি সি-র বেতনের হারের সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও সুপারিশের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণের যে সর্বত্র পরিত্যক্ত নীতিটি আজও প্রচলিত আছে তাহা

অবিলম্বে বর্জন করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(ঙ) পলিটেকনিক এবং ডে-ষ্টুডেন্টস্ হোমের গ্রন্থাগারিককে কলেজের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বৃত্তি-কুশলী কর্মীদেরও তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সুসঙ্গত বেতনের হার দিতে হইবে।

(চ) যে সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার ইউ জি সি এবং রাজ্য সরকারের সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য বর্তমান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ধারণের উপযোগী সুসঙ্গতিপূর্ণ বেতনের হার চালু করিতে হইবে। এই সব কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীসঙ্ঘ, কলেজ কর্মীসঙ্ঘ এবং পলিটেকনিক কর্মীরসঙ্ঘের দাবীগুলি অনুমোদন করিতেছে এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

(ছ) অনার্স মানের এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলির গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিককে যথাক্রমে অধ্যাপক ও লেকচারারের বেতন দিতে হইবে।

(জ) কলেজে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ করিতে হইবে।

(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্বার্থে নিম্নলিখিত দাবীগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে :

(ক) কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ টীচার্স কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

(খ) কলেজ গ্রন্থাগারিককে পদাধিকার বলে কলেজ লাইব্রেরী কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

(গ) কলেজগুলি হইতে অবিলম্বে গ্রন্থাগারের প্রফেসার-ইন-চার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

(ঘ) বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোন প্রগতিশীল দেশে গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে "সিকিউরিটি ডিপোজিট" দাবী করা হইবে ইহা চিন্তা করা যায়না। 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' তাই দাবী জানাইতেছে যে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া হইয়া থাকে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। ইহা ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি এবং ভারত সরকারের অর্থদপ্তরেরও সুপারিশ।

(খ) স্কুল গ্রন্থাগারগুলির বেতনের হার ইত্যাদি

১। যদিও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইল যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক দ্বারা পরিচালিত একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে আমরা আমাদের এই প্রত্যাশার

বিপরীত চিত্র দেখিতে পাই। অনেক উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অদ্যাবধি স্থাপিত হয় নাই। অথচ সব শিক্ষাবিদই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

২। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া কিছু উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব গ্রন্থাগারের কর্মীদের অবস্থা অতি শোচনীয় এবং এই অবস্থার শীঘ্র প্রতিকার প্রয়োজন। আমরা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতে চাই। রাজ্যসরকার স্কুল শিক্ষকদের জন্য কিছু নূতন বেতন হার প্রচলন করিয়াছেন, যাহা ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সাল হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে। এই নির্দেশ অনুয়ায়ী এম. এ/এম. এস. সি. বা অনার্স গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ শিক্ষকগণের বেতন হার হইয়াছে—২২০৲—১০৲—৩২০৲—১৫৲—৪৭০৲ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ও বি. টি. ডিগ্রী থাকিলে শিক্ষকের বেতন তৃতীয়স্তর অর্থাৎ ২৪০৲ টাকা হইতে শুরু হইবে। সেইক্ষেত্রে একজন অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা এম. এ. ট্রেনড্ (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা) গ্রন্থাগারিকের বেতন হার হইল —১৬০৲—৭৲—২৩৩৲—৮৲—২৯৫৲ টাকা। এই সব গ্রন্থাগারিকদের এমনকি একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ শিক্ষকের বেতন হার—যথা, ১৬৭৲—৭৲—২৩৭৲—৮৲—৩১৭৲টাকা+২৫৲টাকা ভাতা পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এইরূপ বিভেদমূলক ব্যবস্থা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকার আজ অবধি স্কুল গ্রন্থাগারগুলির জন্য কোনরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। অতএব কেমন করিয়া আশা করা যায় যে স্কুলের গ্রন্থাগারিকগণ বৎসরের পর বৎসর ঐ নগণ্য বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং এই অবস্থায় তাহারা শিক্ষকতা বা অন্য কোন বৃত্তি অনেক বেশী পছন্দ করিবেন না? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারত সরকার নিয়োজিত সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশেও স্কুল গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

৩। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দাবী :

(ক) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষক কর্তৃক গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। যে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে মঞ্জুর করিতে হইবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার ও ভাতাসমূহ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল্য করিতে হইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্কুল-গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার সম্বন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ দেওয়া হইল :

গ্রন্থাগারিক	বেতনের হার, পদমর্যাদা, ভাতাসমূহ সমতুল্য হইবে	শিক্ষক
১) এম.এ./এম. এসসি./এম. কম. বা অনার্স গ্র্যাজুয়েট বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা/বি.লিব.এসসি.)		এম.এ./এম. এমসি./এম,কম বা অনার্স গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ শিক্ষক
২) পাশ গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ গ্রন্থাগারিক (ডিপ.লিব.এসসি /বি,লিব.এসসি)		পাশ গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ শিক্ষক।
৩) পাশ গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ গ্রন্থাগারিক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট সহ)	”	তাঁহারা পাশ গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ শিক্ষকদের বেতন হার (একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেণ্ট সহ) পাইবেন। কারণ তাঁহাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট আছে। যতদিন পর্যন্ত না তাঁহারা ডিপ.লিব. এসসি. বা বি. লিব. এসসি. ডিগ্রি অর্জন করিবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা ঐ বেতনের হারই পাইবেন।
৪) আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ট্রেনড্ গ্রন্থাগারিকগণ (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত)		আণ্ডার গ্রাজুয়েট ট্রেণ্ড শিক্ষক।

গ) যে সকল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের কোনরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হারের সর্বনিম্নে নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল গ্রন্থাগারিকদের যত শীঘ্র সম্ভব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন সহ ডেপুটেশনে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতে তাঁহারা নিয়মিত ইনক্রিমেণ্ট পাইতে পারেন।

ঘ) শিক্ষকগণ যে সকল ভাতাসমূহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পাইয়া থাকেন সেইগুলি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণকেও দিতে হইবে।

ঙ) শিক্ষকদের সন্তানদের ন্যায় গ্রন্থাগারিকদের সন্তানদেরও বিনা বেতনে শিক্ষা-লাভের সুযোগ দিতে হইবে।

চ) সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারণের যে পদ্ধতি আছে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিতে হইবে।

সরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-সনদপত্র

ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে যুক্তিসঙ্গত বেতনক্রম দাবী করিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করা হউক। (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইয়াছে)।

খ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের রাজ্য সরকারের কর্মী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্পনসর্ড প্রথা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

গ) রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের যে মহার্ঘ্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ছুটির সুযোগ, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও দিতে হইবে।

ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকারের কর্মীদের অনুরূপ সার্ভিস-রুল প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঙ) মাসিক বেতন ঠিক সময়ে নিয়মিত দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

চ) যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত শিক্ষা নাই তাহাদের পূর্ণ বেতনসহ ডেপুটেশন দিয়া শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যে সব গ্রন্থাগারে মহিলা কর্মী আছেন তাঁহাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

ছ) শিক্ষক সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের অনুরূপ গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে।

জ) গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও পদ্ধতি এবং সুসঙ্গতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। গ্রন্থাগারিককে পদাধিকার বলে এই সব কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

ঝ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলে যে শীতকালীন ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে, ঐ সব অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঐ রূপ ভাতা দিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে

ক) ইউ, জি, সি, সুপারিশ অবিলম্বে সুপারিশের দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

খ) কলেজগুলির সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য বৃত্তিকুশলীকর্মীদের ক্ষেত্রেও ইউ, জি, সি-র বেতনের হারের সুযোগ দিতে হইবে।

গ) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইউ জি সি বেতনক্রমের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও সুপারিশের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

ঘ) সরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণের যে সর্বত্র পরিত্যক্ত নীতিটি আজও প্রচলিত আছে তাহা অবিলম্বে বর্জন করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণ করিতে হইবে।

ঙ) পলিটেকনিক ও ডে-স্টুডেণ্টস হোমের গ্রন্থাগারিককে কলেজের শিক্ষক-দের অনুরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীদেরও তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সুসঙ্গত বেতনের হার দিতে হইবে।

চ) যে সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার ইউ জি সি এবং রাজ্য সরকারের সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাঁহাদের জন্য বর্তমান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ধারণের উপযোগী সুসঙ্গতিপূর্ণ বেতনের হার চালু করিতে হইবে। এই সব কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী সঙ্ঘ, কলেজ কর্মী সঙ্ঘ এবং পলিটেকনিক কর্মী সঙ্ঘের দাবীগুলি অনুমোদন করিতেছে এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

ছ) অনার্স মানের ও বৃত্তিমূলক কলেজগুলির গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থা-গারিককে যথাক্রমে অধ্যাপক ও লেকচারারের বেতন দিতে হইবে।

জ) কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের মহার্ঘ্যভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি শিক্ষকদের অনুরূপ করিতে হইবে।

ঝ) কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ টীচার্স কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

ঞ) কলেজ গ্রন্থাগারকে পদাধিকার বলে কলেজ টীচার্স কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

ট) কলেজগুলি হইতে অবিলম্বে গ্রন্থাগারের প্রফেসর-ইন-চার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

ঠ) গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে সিকিউরিটি ডিপোজিট লওয়া হইয়া থাকে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে

(ক) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষক কর্তৃক গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। যে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের নিকট নিকট আবেদন পত্র পেশ করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে মঞ্জুর করিতে হইবে এবং প্রতি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার ও ভাতাসমূহ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল্য করিতে হইবে। (বিস্তারিত সুপারিশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

(গ) যে সকল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের কোনরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হারের সর্বনিম্নে নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল গ্রন্থাগারিকদের যত শীঘ্র সম্ভব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন সহ ডেপুটেশনে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতে তাঁহারা নিয়মিত ইনক্রিমেণ্ট পাইতে পারেন।

(ঘ) শিক্ষকগণ যে সকল ভাতাসমূহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পাইয়া থাকেন সেইগুলি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণকেও দিতে হইবে।

(ঙ) শিক্ষকদের সন্তানদের ন্যায় গ্রন্থাগারিকদের সন্তানদেরও বিনা বেতনে শিক্ষা-লাভের সুযোগ দিতে হইবে।

(চ) সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারণের যে পদ্ধতি আছে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিতে হইবে।

২। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের অনুরূপ এবং স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা দাবী করিয়া শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র প্রেরণ :

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা দিবার এক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের এই বর্দ্ধিত মহার্ঘ্যভাতা দিবার অনুরোধ জানাইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২০।৫।৬৭ তারিখে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক চিঠি দেওয়া হয়। এই চিঠিতে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরূপ' স্কুল গ্রন্থাগারিকদের স্কুল শিক্ষকের অনুরূপ এবং কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা এবং অন্যান্য ভাতাদি দিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

৩। কলিকাতায় এম. লিব. এস সি কোর্স খোলা, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ. জি. সি বেতনক্রম চালু করা এবং গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের নিকট পত্র প্রেরণ :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের নিকট ২২।৫।৬৭ তারিখে এক চিঠি দেওয়া হয়। ঐ চিঠিতে কলিকাতায় অবিলম্বে এম, লিব. এস. সি কোর্স না খোলা হইলে পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হইবে তাহা উল্লেখ

করা হয়। কলিকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এম. লিব. এস. সি কোর্স খোলার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন একটিতে এম. লিব. এস. সি খোলার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ জানান হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম (ইউ জি সি বেতনক্রম) ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবেচনাধীন, অথচ চতুর্থ পরিকল্পনার এক বৎসর ইতিমধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষাদপ্তর যাহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন তাহার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানান হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে অবহেলিত হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি কি ভূমিকা পালন করিতে পারে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিবার জন্য একটি গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানান হয়।

৪। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের সমতুল্য বেতনের হার প্রবর্তনের অনুরোধ জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা অধিকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ ঃ

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (শ্রীখণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সমাজশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীঅমিয় সেন মহাশয় ঘোষণা করেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে বিস্তারিত তথ্য তাঁহাকে জানান হইলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী যাহাতে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন পান তাহার চেষ্টা তিনি করিতে পারেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২২।৫।৬৭ তারিখের এক চিঠিতে শ্রীঅমিয় সেন মহাশয়কে বিস্তারিত তথ্য জানান হয় এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা যাহাতে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন পান এই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে তাঁহাকে অনুরোধ জানান হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জন্য পরিষদ যে দাবী পেশ করিয়াছে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ. জি. সি'র বেতনক্রম অবিলম্বে প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়া ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিকট পত্র প্রেরণ ঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর-এর (ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সেকসন) নিকট ২০।৫।৬৭ তারিখে দুইটি চিঠি দেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার এক বৎসর শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ইউ. জি. সি'র সুপারিশ প্রকাশিত না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ইউ. জি. সি'র পক্ষ হইতে যে পত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জানান হইয়াছে যে, ইউ. জি. সি'র সুপারিশ ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত বিবেচনাধীন। এই সুপারিশ

অদ্যাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় যে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঐ পত্র দুইটিতে উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়।

৬। কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিভিন্ন বেতনক্রম সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ইউ জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নিকট পত্র প্রেরণ :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২২।৫.৬৭ তারিখে ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নিকট দুইটি চিঠি পাঠান হয়। ঐ চিঠিতে চতুর্থ পরিকল্পনা-কালীন ইউ. জি. সি সার্কুলারে যাহাতে গ্রন্থাগারের সর্বস্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের জন্য সুপারিশ থাকে (শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিক নয়) তাহার অনুরোধ জানান হয়। ঐ চিঠি দুইটিতে পাশমানের কলেজের গ্রন্থাগারিকের জন্য লেকচারারের অনুরূপ এবং অনার্স মানের কলেজের গ্রন্থাগারিকের জন্য অধ্যাপক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের জন্য লেকচারারের অনুরূপ বেতনক্রম সুপারিশ করিবার অনুরোধ জানান হয়।

৭। অবিলম্বে কলিকাতায় এম. লিব এস. সি কোর্স শুরু করিবার অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়া ইউ. জি. সি'র নিকট পত্র প্রেরণ :

পূর্বাঞ্চলের চাহিদা পূরণের জন্য অবিলম্বে কলিকাতায় এম. লিব. এস. সি কোর্স শুরু করিবার অনুমতি দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে ২২।৫।৬৭ তারিখের এক চিঠিতে ইউ জি. সি'কে অনুরোধ জানান হয়। ঐ চিঠিতে আরও বলা হয় যে, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ কোর্স খুলিতে বিশেষ ইচ্ছুক। ঐ কোর্স কলিকাতায় শুরু করা হইলে পূর্বাঞ্চলের একটি দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করা হইবে বলিয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

Librarians in the news.

Pay, Status and Service conditions of Librarians :
Memorundum Submitted to the State Government.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গৃহ-নির্মাণ তহবিল

এবছর জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে যারা অর্থ সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

শ্রীতারকদাস সুর	৫'০০	শ্রীদীপক রঞ্জন চক্রবর্তী	৫'০০
„ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	১০১'০০	„ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	১০'০০
শ্রীমতী প্রীতি মিত্র	৭৫'০০	শ্রীমতী গীতা মিত্র	২৫'০০
„ কৃষ্ণা দত্ত	৫'০০	„ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫'০০
„ আশা চৌধুরী	৫'০০	„ মীনা সেনগুপ্ত	৫'০০
„ প্রতিমা সেনগুপ্ত	৫'০০	„ জলি বাগচী	৫'০০
„ শোভা ঘোষ	৫'০০	„ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫'০০
„ মঞ্জু দে	৫'০০	„ অমিতা মিত্র	৫'০০
„ অসীমা ঘোষ	৫'০০	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	৯৯'০০
শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী	৫'০০	„ সুধীর ব্রহ্ম	৫'০০
„ অমল সেনগুপ্ত	১০'০০	„ বিনয়ভূষণ দত্ত	৫'০০
„ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী	৫'০০	„ বাণেশ্বর মাইতি	৩'০০
„ অ. রা.	৫'০০	„ পূর্ণেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য	২৫'০০
„ মঙ্গলা প্রসাদ সিংহ	৫'০০	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শুভানুধ্যায়িবৃন্দ	৩২'০০

দক্ষিণগ্রাম পি, ইউ, এস রুরাল লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দের দান

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দক্ষিণগ্রাম পি, ইউ, এস রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় নিজে এবং তাঁর গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ২৫৲ টাকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্যে পাঠিয়েছেন। পরিষদের গৃহনির্মাণ বিষয়ে দক্ষিণগ্রামের এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারটির আগ্রহ ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। আমরা দক্ষিণগ্রাম গ্রন্থাগারকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

রবীন্দ্র গ্রন্থাগার। সি, আই, টি বিল্ডিংস। ক্রিষ্টোফার রোড। কলিঃ-১৪

রবীন্দ্র গ্রন্থাগার সি আই-টি টেনান্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের একটি বিভাগ। এই পরিষদের সাধারণ সভা গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি সপ্তাহে ২ দিন খোলা থাকে—রবিবার সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা ও বুধবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে এ বছর একশত টাকা দান করেছেন।

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র লাইব্রেরী অ্যাণ্ড ফ্রী রীডিং রুম। ২-বি রামমোহন রায় রোড।

সম্প্রতি গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। এই নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন:—শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ (সভাপতি), শ্রীবিজয়লাল দে (অবৈতনিক সম্পাদক), অধ্যাপক নির্মলকান্তি বসু (অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক), শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাস (অবৈতনিক সহ-গ্রন্থাগারিক) এবং সর্বশ্রী নন্দদুলাল শ্রীমানী, সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস, প্রভাতকুমার মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দেব, বটু লাহিড়ী, সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস, ও শিশিরকুমার বিশ্বাস।

চব্বিশ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে সাধু-পাঠ-মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মজয়ন্তী এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিভূতিণভূষণ বিশ্বাস। শিক্ষাব্রতী শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে নেতাজী জয়ন্তীও উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে নেতাজীর সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মজয়ন্তী শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পালন করা হয়। সম্প্রতি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকীও পালন করা হয়েছে।

"গণ অনশন খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় নয়" এই বিষয়ে পাঠাগারে একটি চিন্তামূলক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (গ্রামীণ পাঠাগার)। জাড়গ্রাম

গত ১লা বৈশাখ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে শুভ নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। পাঠাগার প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। শহীদস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত মাখনলাল দে মহাশয়ের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী গত ২রা বৈশাখ এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপন করা হয়। দেশ-প্রেমিক ও উদারচরিত্র মাখনলাল দে'র স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রন্থাগারটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারটিকে স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাই-ব্রেরীতে পরিণত করেছেন।

বীরভূম

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর

গত ২৫শে বৈশাখ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। বিশ্বভারতীর দর্শনবিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্র জীবনী ও কাব্য পর্যালোচনা করেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউনহল। সিউড়ী।

গত ২৫শে বৈশাখ রামরঞ্জন পৌর ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন শ্রীতারকচন্দ্র ধর ও অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্যমান ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। অনার্স গ্র্যাজুয়েট অথবা এম, এ ডিগ্রীধারীদের জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল "প্রাচীন তাম্রলিপ্তে কৃষি ও শিল্প" এবং গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নির্দ্ধারিত বিষয় ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ভৌগলিক অবস্থান"। পরে নির্ধারিত ৩১শে জানুয়ারীর পরিবর্তে প্রবন্ধ জমা দেবার শেষ তারিখ ৩১শে মে নির্দিষ্ট করা হয়।

ঝাড়গ্রাম বাণীতীর্থ। ঝাড়গ্রাম।

ঝাড়গ্রাম বাণীতীর্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দেবেন্দ্রমোহন-স্মৃতি ভবনে। সুচিন্তিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক রাধারমণ দাস ও শ্রীশিবপদ রায়। একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি সার্থক হয়ে ওঠে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'গুপ্তধন', 'তাসের দেশ, 'শেষ রক্ষা' প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ।

রবীন্দ্র পাঠাগার। মহিষাদল।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মহিষাদলের রবীন্দ্র পাঠাগার গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মতিথি পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমানবেন্দ্র পাল। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্র জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে অলোচনা করেন যথাক্রমে শ্রীসুনীলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও শ্রীঅনাদি ভূষণ হালদার।

শহীদ পাঠাগার।

গত ৭ই মে শহীদ পাঠাগারের সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীত্রিলোকেশ সামন্ত গত ২ বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

আগামী গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে একটি ১৫দিন ব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। খরাগ্রস্ত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে বীজধান সংগ্রহ করে সাহায্য করার একটি প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়।

সবুজ সংঘ। বাসুদেবপুর।

সবুজসংঘ গত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭৪ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্ম বার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করেন।

হাওড়া

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী। ৪২।৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক সমিতিতে, ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন:

সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকুমার দাস (সভাপতি), হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার বোস (সহঃসভাপতি), সমরকুমার দত্ত (অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক), শ্যামলকুমার গুপ্ত (অবৈতনিক সহঃ-সাধারণ সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র চায়না (কোষাধ্যক্ষ), অনিলকুমার ঘোষ ও বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় (হিসাব পরীক্ষক), শঙ্করদাস কুণ্ডু, বলরাম মিত্র ও উমাপদ

দাস ঘোষ (গ্রন্থাগারিক) এবং সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার সিংহ, তপনকুমার রায় চৌধুরী, অরুণকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা রায়, চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, মুরারীমোহন ভট্টাচার্য ও হাওড়া পৌরসংস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীসুবুদ্ধিভূষণ নন্দী (সদস্যগণ)।

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া। পাতিহাল।

চতুর্দশ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মার্কাস স্কোয়ারে "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার" নামে চিত্র প্রদর্শনীটির আয়োজন করে 'সবুজ গ্রন্থাগার' প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছেন। প্রদর্শনীটির নির্দেশনায় আছেন—শ্রীনির্মলেন্দু মান্না। প্রযোজনা করেছেন সবুজ গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—শ্রীখণ্ডে একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও প্রদর্শনীটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫।৪ মহাত্মা গান্ধী রোড।

পরিষদের উদ্যোগে গত ৬ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত একটি বিরাট পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসুধাংশু কুমার বসু। প্রদর্শনীতে প্রায় ৬০ টি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা যোগদান করেন। ১৩দিন ব্যাপী প্রদর্শনীকালে কমিশন বাদে প্রায় ৩৩,০০০ টাকার মত বই বিক্রয় হয়। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, যোগদানকারী পুস্তক ব্যবসায়ীদের কোনরকম ষ্টল ভাড়া দিতে হয় না।

হুগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীটি এস্টেট অ্যাকুইজিশন আক্টের বলে দখল করে নিয়েছেন। উত্তরপাড়ার জনসাধারণ দীর্ঘকাল যাবত এই গ্রন্থাগারটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। অবশেষে গত ২রা জুন সরকার লাইব্রেরীটির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এই উপলক্ষে গত ২রা ও ৩রা জুন গ্রন্থাগারে বিজয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং গ্রন্থাগার ভবনটি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। এই গ্রন্থাগারটি ১৮৫৯ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থাগারটিতে বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার। গরলগাছা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগার প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। ব্রজ দত্ত লেন। শ্রীরামপুর।

গত ১লা বৈশাখ স্থানীয় কিশোর ও তরুণ সমাজের উৎসাহ ও উদ্যোগে শ্রীরামপুর কালীতলা এলাকায় বিবেকানন্দ পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন হয়। স্থানীয় এম. এল. এ তথা পৌরপ্রধান ডাঃ গোপালদাস নাগ গ্রন্থাগারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ। সভাপতি শ্রীষষ্ঠীচরণ সেন ও গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দান করেন।

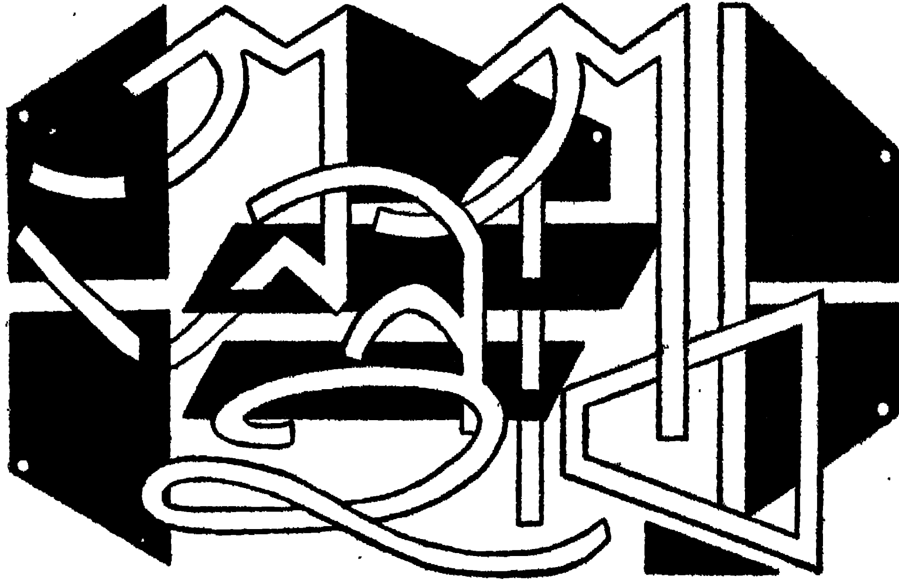
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার। শ্রীরামপুর।

গত ২৩শে মে 'বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী ভবনে' মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভাপতি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ। প্রাক্তন সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেএকটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

News from Libraries

ভ্রম সংশোধন

গত 'বৈশাখ' সংখ্যায় ৩০ পৃষ্ঠায় ৪নং প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীসুধাংশু শেখর চক্রবর্তীর নাম ভুলক্রমে সুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় ছাপা হয়েছে এবং প্রতিনিধিদের নামের তালিকায় পুনরায় ঐ নামটিই 'সুধাংশু'র বদলে 'শুধাংশু' ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। প্রতিনিধিদের নামের তালিকায় আরো কয়েকটি ভুল হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জনৈক বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় ছাপা হয়েছে। ঐ নামে ঐ গ্রন্থাগারের কোন কর্মী নেই। আসলে ঐ নামটি পরিষদের যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়ের। নামের তালিকায় শ্রীহৃষিকেশ গুপ্তের উপাধি 'কুণ্ডু' ছাপা হয়েছে। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমুরলী সেন এবং পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, যে কোন কারণেই হোক তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। —সঃ গ্রঃ



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭৪

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেন কলিঃ-১৪, কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৩ | ১৩৭৪, আষাঢ়

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী সপ্তাহ' পালন

গত ১০ থেকে ১৬ই জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির যুক্ত আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার কর্মীরা যে 'দাবী সপ্তাহ' পালন করেছেন তা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। 'দাবী সপ্তাহে'র কর্মসূচী অনুযায়ী এই রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা দাবী ব্যাজ ধারণ করেন, বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য, রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া জেলায় জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও প্রতিনিধিমণ্ডলী গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। মফঃস্বলেও এই 'দাবী সপ্তাহ' উপলক্ষে কোন কোন জেলায় সভার আয়োজন করা হয়; কোন কোন জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে মিছিলও বার করা হয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, বনগায় এবং মহিষাদলে জনসভা হয়েছে—পুরুলিয়া ও তমলুকে নীরব মিছিল হয়েছে। আন্দোলনের জন্য ২৫০৲ টাকারও বেশী এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসে জমা পড়েছে।

কলকাতায় এই উপলক্ষে দু'টি কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত দুই সভার একটিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানান। অপর সভাটিতেও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুরূপভাবেই গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

কলকাতার প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলিও এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন। কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁদের ধন্যবাদ। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী পূরণে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্যদের আশ্বাস পাওয়া গেছে ঠিকই কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আন্দোলনের এখানেই শেষ নয়। আন্দোলনের এ কেবল শুরু হল বলা যায়। সাম্প্রতিক আন্দোলন বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নতুন পথের ইঙ্গিত বহন করে। গ্রন্থাগার উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা

উন্নয়নের যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে সরকার খুব সচেতন ছিলেন না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি প্রবর্তনের সময়েই গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ঘটেছে ঠিকই—সরকারী উদ্যোগে জেলা, গ্রামীণ, আঞ্চলিক, সহর ও মহকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন যে সকল কর্মীরা তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে চলেছেন, বেতন বৃদ্ধি, মহার্ঘ্য ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত হচ্ছেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বহুদিন পূর্বেই গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বেতন ও মর্যাদার সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘকাল কেটে গেছে তবুও ঐ বেতনক্রম চালু করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ২৫০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই পূর্ণ সময়ের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় গ্রন্থাগার আছে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন এবং বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশ এক্ষেত্রেও কার্যে পরিণত করা হয়নি। এছাড়া পলিটেকনিক, ডে-স্টুডেণ্টস্ হোম ও বিভিন্ন বিভাগীয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মীরাও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মিলিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারের দাবীগুলি। এই সকল বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার চাঁদার স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন জনসাধারণের সেবা করে চলেছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থাগার এখন তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। এগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে ও রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালন ও সম্প্রসারণে জনসাধারণেরও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীটির দায়িত্বভার ওখানকার জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল নিঃশুল্ক পাঠাগার থাকার পর যখন গত ১লা জুলাই থেকে চাঁদার প্রবর্তন করতে যাচ্ছিলেন তখন প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। ঐ জেলা গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দ পাঠক সমিতি গঠন করেন এবং পাঠাগারের সম্মুখে পিকেটিং চালাতে থাকেন। অবশেষে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ চাঁদা প্রবর্তনের সংকল্প পরিত্যাগ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন তথা গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন এবং রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী পূরণের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা চালিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলন পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এবং মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণও এর পেছনে আছেন। তাছাড়া এ আন্দোলন গ্রন্থাগার কর্মীদের বাঁচার আন্দোলন ; এ আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই।

Editorial : 'Demand week' observed by library workers.

রেখাচিত্র (৫)—অজানা

লেখক—ভিল্‌হেল্‌ম্‌ হাউফ

অনুবাদ—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(Wilhelm Hauff : Du Bucher und du Lesewelt
Der Unter nehmende Geist)

"আজকাল সকালে সন্ধ্যায়, দিন-দুপুরে রাত-দুপুরে পত্রিকার সংস্করণ বার হয়। ভগবানের নামে এবং ভগবানের চেলা-চামুণ্ডাদের নামে পত্রিকা বার হচ্ছে—কোন নামই এখন আর পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে পরিত্রাণ পায়না। এখন প্রয়োজন হচ্ছে কি জানেন, একখানা পত্রিকা বার করে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে গেলে নতুন নাম খুঁজে বার করতে হ'বে—যা করলে কাজ হবে। পত্রিকার নাম এ ধরনের না হলে তা পুরান ও চালু পত্রিকার নাম ডোবাতে সক্ষম হবে না। তবে বুদ্ধিমান যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে, পত্রিকা নতুন বলেই যে তা ভালো হয় তা নয় কারণ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা, যেমন পুরাতন পত্রিকায় থাকে তেমনি নতুন পত্রিকাতেও থাকে, তবে পত্রিকার নাম দেখেই কেবল ভালো লেখকরা তাদের লেখা দিতে রাজী হয়না।"

"কিন্তু herr Salzer, মানুষ তবে কেন পুরাতন প্রচলিত পত্রিকা ছেড়ে হঠাৎ নতুন পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ কিনতে থাকে।"

"ওটা হচ্ছে কালের রীতি। মানুষ পরিবর্তন চায়, আর জানেন তো, "নতুন ঝাঁটা ঝাঁট দেয় ভালো", বললেন herr Salzer". আমাদের পাঠক সমাজই এই রকম আবহাওয়ার মত তাদের পরিবর্তন হয়—কিন্তু তার কারণ যে কি তা কেউ জানে না। মানুষ নতুন পোষাক বার করে তা লোক-সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, তেমনি একটা চমকপ্রদ নাম ও একটা ছোট্ট সুন্দর নক্সা—পত্রিকার প্রচ্ছদপটে ছাপা হ'লে সে পত্রিকাও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মানুষের এই চরিত্রকে যে ঠিক মত নিজের কাজে লাগাতে পারে, সে আজকাল কার যুগে এখনও কিছু করতে পারে। হায়রে! যদি একটা ভালো নাম পেতাম!

"এখনকার কোন পত্রিকায় সব কিছুই থাকা প্রয়োজন তা আপনি অস্বীকার করেন না তো—তা হ'লে "Literarisches Huhnerfutter" অর্থাৎ "মুর্গির সাহিত্য খোরাক" নামটা আপনার কেমন মনে হয়।"

"মন্দ নয়। ছবিতে একদল মুর্গি যেন আমাদের জনসাধারণ, আর একজন কবি তাদের টুকর টুকর করে সাহিত্যের খোরাক ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তা চলবে বলে মনে হয়না। আমাদের জনসাধারণ তাতে অপমান বোধ করবে। তারা মনে করবে পাত কুড়ান এঁটো-কাঁটা যেমন মুর্গিদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি তাদের সাহিত্যের এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। না মশাই, এ ধরনের নামকরণ চলবে না।"

"কিংবা এই রকম.........সন্ধ্যা পূজার ঘন্টা" (Abendglocke)

"সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা? ঠিক বলছেন! কানে বাজে বটে! বেশ একটা শান্ত, কোমল শব্দ, সত্যি কানে বাজে বটে, কিন্তু সে জন্য আমার একখানা সমালোচনামূলক ক্রোড়পত্রের প্রয়োজন হবে। আমার মাথায় কিন্তু বহুদিন থেকে একটা নাম ঘুরছে—আচ্ছা বলুন তো, পত্রিকার নাম "Destillateur", অর্থাৎ "ছাঁকনি" রাখলে কেমন হয়"।

"আপনার Idea-টায় কিছুটা সত্যি রয়েছে বইকি", আমি বললাম, "আজকালকার বইকে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিশ্রুত করা হয়। পরিশ্রুত করতে করতে, জনসাধারণ যা চায়, অর্থাৎ x-Geist, অজানা বস্তু জলীয় পদার্থ হ'য়ে দেখা দেয়; না হয়; রাসায়নবিদ যতক্ষণ না জনসাধারণকে দেখাতে পারে কি মাল মশলা দিয়ে মিশ্রিত বস্তুটি তৈরী হয়েছে ততক্ষণ তা পরিশ্রুত করতে থাকে। কিন্তু বইয়ের পাতায় মশলার দোকানের গন্ধ না হয়পোড়া জলের গন্ধ বার হ'বে। আচ্ছা একজন Critical chimney sweeper থাকলে কেমন মনে হয় বলুন তো।"

"প্রকাশক আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে", এ একটা আবিষ্কার! একেবারে নতুন!" এই কথা বলে সে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরল। "এ একটা কথার মধ্যে কি নেই বলুন তো। জার্মান সাহিত্য হলো উন্থন আর আমাদের সমালোচক হলেন chimney sweeper। তাদের কাজ হবে চিমনির ভুষোগুলো চেঁচে চেঁচে বার করা যাতে সারা বাড়ীটায় আগুন না ধরে যায়। Critical chimney sweeper! আর কলা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি ছাপা হবে "Artistic night watchman" শীর্ষে। এ নামটা তো আজ কাল খুবই চালু।" তাড়াতাড়ি নামটা লিখে নিয়ে সে বললে, "মশাই আপনি দেবদূত—ভগবান আপনাকে আজ আমার দোকানে পাঠিয়েছেন। আমি একা একা যখন থাকি মনে হয়, কে যেন আমাকে চেয়ারের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখে দেয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, যখন আমি প্রাণ খুলে কথা কইতে পাই, তখন Idea-গুলো নদীর স্রোতের মত আসতে থাকে। আপনি এসে আমাকে যেই Walter Scott ও তার প্রভাবের কথা আমায় শোনালেন অমনি আমার Idea'র ঝড় বয়ে গেল। আমি একজন জার্মান Scott-এর সৃষ্টি করবো"।

"কিরকম! আপনি কি একখানা উপন্যাস লিখবেন?"

"Ich, আমি! আমার অনেক কিছু ভালো করবার আছে। আর একখানা? না, বিশখানা! কেবল Idea'র স্রোতে যদি মাথা ঠিক রাখতে পারি। আমি একজন "অজানা"কে খুঁজে বার করব। আর এই অজানা হবে একদল উপন্যাস লেখক, আর কেউ নয়। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

"ঠিক বুঝতে পারিনি এখনও। আপনি কেমন করে………"

"টাকা থাকলে মানুষে সব কিছু করতে পারে, উপন্যাসে হাত পাকিয়েছে এরকম ছয় জন বা আটজন লোক জড় করব। তাদের এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে আমার আইডিয়াটা তাদের কাছে প্রস্তাব করব—তারা সকলে Walter Scott-এর সৃষ্টি করবে। তারাই ইতিহাস থেকে মাল মশলা আর চরিত্র খুঁজে বার করবে এবং তার পর………"

"ও! তাই বলুন, এইবার আমি আপনার সুন্দর পরিকল্পনা বুঝতে পারছি। তাহলে আপনি churan' এর মত একটা কারখানা খুলবেন। জার্মানীর নানা জায়গায় যা কিছু রোমান্টিক তার Copper-plate নিয়ে আসবেন। পুরাকালের পোষাক Berlin-এ লিখলেই পাওয়া যাবে। Knaben Wunderchone ও অন্যান্য রচনাবলী থেকে অনায়াসে উপকথা আর কাহিনীর সংগ্রহ করা যাবে। দুই ডজন যুবককে আপনার কারবারে নিযুক্ত করবেন। এরাই হবে আপনার "অজানা"। এরা উপন্যাসের খসড়া তৈরি করবে, এখানে ওখানে সংশোধন করে এবং অদল-বদল করে একটা বিরাট চরিত্রের সৃষ্টি করবে। আরও চব্বিশজন বা ত্রিশজন লোক থাকবে, তাদের কাজ হ'বে, কথোপকথন লেখা, দৃশ্য পটের সৃষ্টি করা, এবং প্রাসাদের বর্ণনা দেওয়া, কিন্তু এ সবই হবে প্রকৃতির অনুকরণে"।

"আর" herr Salzer বললে, "সকলের talent সমান নয়, কারুর talent দৃশ্যপট সৃষ্টির দিকে কারুর সাজ পোষাকের দিকে, তৃতীয়ের কথোপকথনের দিকে আবার কারুর কারুর Tragedy'র দিকে… …"।

"ঠিক বলছেন, আপনার কলাকাররা কেউ হবে দৃশ্যশিল্পী, কেউ হবে কথোপকথন কুশলী, কেউ হবে হাস্যরস এবং কেউ হবে বিয়োগরস শিল্পী এবং প্রত্যেক উপন্যাসখানি প্রতি হাত ঘুরবে ……"।

"এই ভাবে উপন্যাসের মধ্যে আসবে সমতা, যে সমতা Scott-এর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়, মনে হয় যে, সব চরিত্রগুলি এক বংশের, সকলের মুখে যেন বংশগত ছাপ রয়েছে। এ ধরনের একখানা উপন্যাস আমরা খুব কম দামে পকেটবুক সংস্করণে ছাপব, তা হলে যে অন্ততঃ ৫০,০০০ কপি বিক্রি হবে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

"এবং এই সংস্করণের নাম হবে Hermann dem cherusker থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত উপন্যাসে জার্মানীর ইতিহাস।" এ ধরনে একশত উপন্যাসের এই পুস্তক মালা সমাপ্ত হবে।"

ভাবাবেগে herr salzer-এর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর তার Idea-টা আর একবার আগাগোড়া বলে নিয়ে আমার দু'হাত চেপে ধরে বললে—"এখন বলুন তো আমি কি আর একজনের মত ঝুঁকি নিতে পারিনা। কিন্তু মশাই, আপনি আমাকে ছাড়বেন না। আমার এই ধারণার পাহাড়ের যাতে জন্ম হয়, সে জন্যে আমায় সাহায্য করবেন। আপনি আজ এসেছিলেন আমার দোকানে একখানা সুন্দর বই কিনতে পরিবর্তে আপনি আজ থেকে হলেন আমার চব্বিশ জনের একজন"।

এমনি ভাবে বরাতক্রমে আজ আমি আমার লক্ষ্যপথে এসে পৌছালাম এতদিন কেবল স্বপ্নই দেখেছিলাম। আর আমার Lending Library'তে গিয়ে জনসাধারণের রুচির বিশ্লেষন করতে হবে না, উপন্যাস কি ধরনের হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে না, কিংবা Idea খুঁজে বেড়াতে হবেনা। এখন আমি লেখক সঙ্ঘের একজন, সেই 'অজানা'র একটি অঙ্গুলি। এখন আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী লিখব, আমার লেখা

ছাপা হবে, আমার লেখা লোকে পড়বে। Herr Salzer এর এই গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির ফল জনসাধারণের উপর কত দূর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আর জগতের কাছে অজানা ছিলনা এবং এই "অজানা"র অস্তিত্বের রহস্যও সকলের কাছে ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছিল। প্রথম দিকে আমরা নাম-করা সাহিত্যিকদের পরামর্শ নিয়েছিলাম, সে জন্য আমরা গর্বিত; এই সব সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক Lux, যিনি ইতিমধ্যে তাঁর অনুবাদ করবার মন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, নাম-করা কবি T. Kempler ও অন্যান্য কয়েকজন এবং আমরা ঐতিহাসিক Willibald Alexis-এর কথাও চিন্তা করে রেখে রেখেছিলাম। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে আমি ছিলাম একজন।

জার্মানীর কিছুটা অংশ আমার খুব ভালো ভাবে জানা ছিল, সে জন্য আমার উপরে ভার পড়েছিল দৃশ্যপটের এবং স্থানের বর্ণনা দেওয়া। একবার "Concilium in Konotanz" নামক একখানি উপন্যাসের মধ্যে লিখলাম "ঝোঁপ-ঝাড়ে ভরা ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে তারা Basel থেকে Konstaz পর্যন্ত নৌকা বেয়ে চলল।" সমালোচকদের ও জনসাধারণের চোখ পড়ল এ অংশটার উপর। তারা বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তখন পর্যন্ত Rhine নদী বেয়ে উপর দিকে Konotanz পর্য্যন্ত কেউ যায়নি। আমিও শাস্তি পেলাম এবং আমার উপরে ভার পড়লো কথোপকথন লেখার—হাটে বাজারে, সরাইখানায়, রাস্তায়। এই কাজটাই আমি করছিলাম, এমন সময়ে সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সাহসী, অনুভূতিশীল ব্যক্তি লিখলেন "মেঘের দল কখন চাঁদের উপর দিয়ে, কখনও বা চাঁদের পিছন দিয়ে উড়ে যাচ্ছে"—এ ধরনের বর্ণনা Common Sense বিগর্হিত। চাঁদের পিছন দিয়ে মেঘ উড়ে যায়, তা কেউ কখন শোনেওনি বা দেখেওনি। ফলে সেই লেখকের পতন হলো এবং তার কাজের ভার পড়ল আমার উপর। এই কাজটায় আমি বেশ উন্নতি করেছিলাম। Der Dom zu Aachen নামক উপন্যাসের বেশির ভাগটাই আমি লিখেছিলাম। Barbarossa oder die Hohenstaufen নামক উপন্যাসের দশটি পরিচ্ছদ লিখেছিলাম এবং এই কারখানা প্রস্তুত শেষ উপন্যাসের, ৮, ৯ এবং ১৫ দশ পরিচ্ছেদ লিখেছিলাম।

এ ধরনের পুস্তক প্রকাশনার বিরুদ্ধে লোকের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি এই ধরনের পুস্তক প্রকাশক মণ্ডলীর একজন হয়েছিলাম, লিখেছিলাম এবং কথা বলেছিলাম। তবে কেউ যদি একবার চিন্তা করে দেখে যে এই ধরনের পুস্তক প্রকাশনায় কারখানা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ২৫ খানি উপন্যাসের ৭৫ খানি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলে এই প্রকাশনার ঝুঁকি যে নিয়েছিল তার যত্ন, পরিশ্রম এবং ধৈর্যের প্রশংসা তাকে করতেই হবে। অনেক বলেছিলেন, কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সময়োপযোগী রূপ ফুটে ওঠেনি কিন্তু সত্যই এ কথার কোন মূল্য নেই কারণ চরিত্র গুলি, স্বাভাবিক না হ'লেও সেগুলি সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী হয়েছিল একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। এ কথা কি সত্যি নয় যে আমাদের সামনে ছিল ইউরোপের দেশ-বিদেশের রঙ্গালয় থেকে আনানো, স্ত্রী ও পুরুষের সাজ পোষাকের ছবি?

বহু অর্থ ব্যয় করে Herr Salzer ইউরোপের নানা দেশ থেকে পুরাকালের ঘর সংসারের বাসন-কোসন এবং আসবাব-পত্র কিনে আনিয়েছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সব কিছুই চোখে দেখে যেন বর্ণনা দেওয়া হয়।

এইটাই হলো ঐতিহাসিক সত্য, জনসাধারণও এই চায়। চরিত্রটা হলো দ্বিতীয় স্তরের। জুতো, জামা, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্রের, ২৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে তো কোন ত্রুটি ছিলনা। বছর দুয়ের মধ্যে চরিত্র বর্ণনার এইই হয়ে দাঁড়াল রীতি, সে জন্যে আমরা মোটেই দায়ী ছিলাম না। কিন্তু জনসাধারণের রুচির হাওয়ার পরিবর্তন হলো, ফলে এই কারখানারও পতন হলো। সামাজিক রীতির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে এবং আমরা এই রীতির অনুকূলেই আমাদের প্রকাশনার তরী বেয়ে চলেছিলাম। আমাদের প্রকাশনার সূত্রই হয়েছিল "গল্পের মধ্যে সত্যের ত্রুটি থাক, কিন্তু সমস্যানুযায়ী রীতির মধ্যে যেন কোন দোষ না থাকে, এবং জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে যেন কিছু লেখা না হয়।"

Du Bucher und du Lesewelt
Der Unter nehmende Geist
By Wilhelm Hauff tr. from the
Original German. by Rajkumar Mukherji.

['রেখাচিত্র' পর্যায়ের রচনাগুলির অনুবাদ এখানেই শেষ হল। —স. গ্র.]

ভারতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত

পঙ্কজ কুমার দত্ত

তন্তুময় বস্তু থেকে কাগজ তৈরীর কৌশল চীনাদেরই আবিষ্কার। লিখিত তথ্য যা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৎসাই-লুন (Tsai-Loon) নামে জনৈক রাজকর্মচারী প্রথম কাগজ তৈরী করেন। স্যার অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ার চৈনিক মহা-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের অন্তরাল থেকে অতি প্রাচীন কিছু কাগজ উদ্ধার করেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেভাগেই ঐ কাগজ তৈরী হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ই ঐ কাগজের মূল উপাদান। পরবর্তীকালে অবশ্য তুঁতগাছের বাকল অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কাগজ তৈরীর কৌশল চীনারা বহুদিন খুব সতর্কতার সঙ্গেই গোপন রেখেছিল। তবে প্রতিবেশী দেশসমূহে কিছু কিছু কাগজ রপ্তানী হত। অষ্টম শতকের গোড়ায় সমরখন্দ আরবদের দখলে যায়। ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন কর্তৃক সমরখন্দ আক্রান্ত হয়। আরবগণ এই আক্রমণ প্রতিহত ত করেনই এমনকি কিছু চীনাকে বন্দীও করেন। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন কাগজ তৈরীর কায়দা অবগত ছিলেন। এদের কাছ থেকেই আরবগণ পরম আকাঙ্খিত গুপ্ত তথ্যটি জানতে পারেন এবং ক্রমে তা সমস্ত আরব উপনিবেশেই ছড়িয়ে পড়ে। আরব দেশসমূহে প্রাপ্ত মধ্যযুগে কাগজে লেখা আরবী পুঁথির সংখ্যাধিক্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ সমস্ত দেশে কাগজ খুবই সমাদৃত হয়েছিল। আরব কাগজের প্রধান উপাদান ছিল ফ্লাক্স বা লিনেন (Linum usitatissimum)। খোরাসান অঞ্চলে ফ্লাক্স জন্মাত প্রচুর। এজন্য আরবদের দ্বারা নিয়োজিত পারসীক কারিগরগণ কাগজ তৈরীতে ফ্লাক্স ব্যবহার শুরু করেন। চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ও তন্তুময় বিভিন্ন বস্তু ব্যবহৃত হতে থাকে, তবে আরবদের মধ্যে কাগজ তৈরীতে তুলার ব্যবহার ছিল না বললেই চলে।

বহুবছর পার হয়ে এলেও 'হ্যাণ্ডমেড' কাগজ প্রস্তুতের মূল নীতির কৌশলগত বিশেষ তারতম্য হয়নি—কেবল প্রয়োগগত অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনকালে বড় বড় হামানদিস্তা, উদূখল বা ঢেঁকির সাহায্যে প্রথমেই তন্তুময় বস্তুগুলি বেশ ভালভাবে পিষে নেওয়া হত। তারপরে প্রয়োজনমত জলে ভিজিয়ে ও চুন সহযোগে ফুটিয়ে মণ্ডে পরিণত করা হত। চুন ও জলের ক্রিয়া তন্তুগুলিকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। যখন কাগজের উপাদানরূপে ছেঁড়াকাপড়ের ব্যবহার শুরু হল তখন আরবরা লক্ষ্য করেন যে 'পচন-ক্রিয়া' (fermentation) তন্তু বিচ্ছিন্ন করার কাজ ত্বরান্বিত করে। এজন্য মণ্ড প্রস্তুতের পর অল্প কিছু পচিয়ে নিয়ে তবে কাথ প্রস্তুত করা হত। বাঁশের 'চিক্' বা ঘাস থেকে তৈরী 'মাদুর' ধরনের বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত 'কাঠাম' (Paperlifting frame) দিয়ে পাত্র থেকে কিছু কাথ তুলে নেওয়া হ'ত। (কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য কাথ ঢেলে দেওয়া হত)

জল ঝরে গেলেই কাঠামের উপর যে পাতলা আস্তরণটি রয়ে যেত সেটিই হচ্ছে কাগজের আদিরূপ। এই কাগজ এরপর শুকিয়ে, মাড় মাখিয়ে মসৃণ পাথর, শাঁখ, কড়ি বা হাতির দাঁত দিয়ে ঘষে পালিশ করা হ'ত। কাগজ তৈরী প্রথম যুগে বিশেষত চীনদেশে মাড় মাখানর চলন ছিল না। কারণ তুলির সাহায্যে চৈনিক লিখন রীতির পক্ষে ও কাঠের ছাঁচ থেকে ছাপাইয়ের কাজে সচ্ছিদ্র বা শোষক নরম কাগজই ছিল অধিকতর উপযোগী। প্রাচ্যদেশের মধ্যযুগীয় কাগজ কিন্তু বেশ শক্ত ও চক্‌চকে হত। প্রাচী কাগজে কোন সময়েই জলছাপ থাকত না। জলছাপ দেয়ার প্রথা উদ্ভূত হয় প্রতীচ্যে (এয়োদশ / চতুর্দশ শতকে) এবং প্রাচ্যে উনবিংশ-বিংশ শতকের আগে তার প্রচলন হয়নি বললেই চলে (বিশেষতঃ হাতে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে)।

ভারতবর্ষে কাগজ ঃ

'শ্রুতি'র যুগের শেষে ভারতে যখন ব্যাপকভাবে লেখার চলন হল তখন লেখার কাজে নানা ধরনের গাছের ছাল বা বাকল আর পাতার ব্যবহারই হ'ত বলে পণ্ডিতদের অনুমান। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Q. Curtias লিখে গেছেন আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে ভারতে গাছের বাকলে লেখার চলন ছিল। কার্টিয়াস উল্লিখিত এই গাছ ভূর্জ বৃক্ষ বলেই মনে হয়। ভূর্জ গাছের বাকলের ভিতর দিকের অংশ থেকে প্রস্তুত এই লিখন দ্রব্যই সাধারণ ভাবে ভূর্জ বা ভূর্জপত্র নামে পরিচিত। [হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে ভূর্জবৃক্ষ জন্মায় প্রচুর—লিখন বস্তু হিসাবে ভূর্জের ব্যবহার ছিল খুবই ব্যাপক। এমনকি এখনও হিমালয় অঞ্চলের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকদের তাবিজ-কবচ মাদুলি তৈরীতে, মন্ত্র তন্ত্রের পুঁথি লেখায় এর ব্যবহার আছে। লিখন বস্তু হিসাবে ব্যাপক ব্যবহারের জন্য কালে কালে ভূর্জ বৃক্ষের আর এক নাম দাঁড়ায় 'লেখন' আর লিখিত দলিল-দস্তাবেজের প্রতিশব্দ হয় "ভূর্জ"।]

প্রাচীন ভারতে তালপাতার উপর লেখার চলন ছিল খুবই ব্যাপক। লিখন সামগ্রী হিসাবে তালপাতা উত্তর ভারতেও এতই জনপ্রিয় ছিল যে প্রাচীন ভূর্জ পুঁথি ও তাম্রশাসন-গুলির আকারও হত তালপাতার পুঁথিরই মত। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত **'শক'** নেতা **পতিকের** ২১ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রশাসনের আকার (১৪″ × ৩″) [Corpus Inscriptionum Indicarum Vol II, Pt i, pp 23 ff, Plate V, I.] এবং Bower ভূর্জ পুঁথির (খৃঃ পূঃ পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী) আকার এই মত সমর্থন করে।

শুধু তালপাতা নয়, লেখার কাজে নারিকেল পাতাও ব্যবহৃত হত বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু এসবই প্রকৃতির দেওয়া জিনিষ। কাগজ মানুষেরই তৈরী—এর ব্যবহার প্রাচীন ভারতে ছিলনা বললেই চলে। মাড় মাখান কাপড়ের উপর চিঠিপত্র লেখার রেওয়াজ হিন্দুদের মধ্যে ছিল বলে গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ার্কস (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক) তার বিবরণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তের মধ্যেও এই ধরনের বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ যাত্রা কালে রাজা

যে পরিচয়পত্র এবং প্রতিবেশী অন্য রাজাদের কাছে যে সব অনুরোধপত্র লিখে তাঁর হাতে দেন সে সমস্তই এক ধরনের সাদা পাতলা (মাড় মাখান) কাপড়ে লিখিত ছিল বলে হিউয়েন সাঙ লিখে গেছেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদের এক শিলালিপির পাঠে শিলালিপিটিকে 'ক্রয় চীরিকা' অর্থাৎ চীর বা বস্ত্রখণ্ডে লিখিত ক্রয়-কোবালা (deed of purchase) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় বস্ত্রখণ্ডে লিখিত মূল দলিলটি পরে পাথরে উৎকীর্ণ হয়। আলবেরুণীর বিবরণীতেও (খ্রীঃ একাদশ শতক) লেখার কাজে কাপড় ব্যবহারের কথা জানা যায়। তবে এইসব কাপড়ের রঙ ছিল কাল। প্যাটারসন সাহেবের রিপোর্টে আহ্নিলওয়ড়-পাতনের এক জৈনপুঁথিশালায় সংরক্ষিত উদয়সিংহের টীকাসহ শ্রীপ্রভ-সূরি রচিত 'ধর্মবিধি'র এক অনুলিপির কথা জানা যায়। পুঁথিটি ১৩" × ৫" আকারের ৯৩টি বস্ত্রখণ্ডে ১৩৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত। [vide Paterson's 5th Report, 1916, pp 18, 113]।

১৪৪১ খৃষ্টাব্দে পারস্যদূত আবদুর রজাক বিজয়নগরে এসেছিলেন—তাঁর বিবরণীতে কাল কাপড় ও নারিকেলপাতা লিখন বস্তু হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। হিসাবের খাতাপত্র তৈরীতে কানাড়ী বণিকদের মধ্যে কালকাপড়ের ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিল। 'কড়িতম' বা 'কড়তম' [Kaditam or Kadatam] নামে অভিহিত এগুলির উপর সাদা খড়ি [Chalk] বা ষ্টিয়াটাইট [Steatite] দ্বারা লেখা হত বলে অনুমান করা হয়। কয়েক শত বছরের পুরাতন এই ধরনের হিসাব-বহি শৃঙ্গেরী মঠে সংরক্ষিত আছে। [Annual Report of the Archaeological Dept., Mysore State, 1916, Page 18]

কাপড়কে লেখার উপযোগী করার প্রক্রিয়াটি মোটেই জটিল নয়। এক ফের (ক্ষে-ত্র বিশেষে দু-তিন ফের) কার্পাসজাত পাতলা কাপড়ের উপর তেঁতুলবীচি থেকে তৈরী মাড় বা আঠা মাখিয়ে কাঠের মুগুর পিটিয়ে কাঠ কয়লার সাহায্যে কালো করে নেওয়া হয়। একেবারে শেষে মসৃণ শাঁখ বা কড়ি দিয়ে পালিশ করা হত। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস এইভাবে তৈরী কাপড়ের উপরই আঁকা হ'ত। প্রক্রিয়াটি সারা ভারতেই বহুল প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য নানান কাজে ব্যবহৃত হত। উনবিংশ শতকেও রাজপুতানায় 'জন্মপত্রিকা' বা 'কোষ্ঠী' এই ধরনের মাড়-মাখান কাপড়ের উপর লেখা হ'ত। এই মাড় অবশ্য চাল বা গম থেকে তৈরী করা হ'ত।

প্রাচীন ভারতে কাগজের ব্যবহার ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে কাগজ সেকালের ভারতীয়দের অজ্ঞাত ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। পি. কে. গোড়ে প্রমুখ পণ্ডিতদের বিশ্বাস অন্ততঃপক্ষে সপ্তম শতাব্দী থেকে কাগজের কথা ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের জানা'ত ছিলই এমন কি, সাধারণ মানুষেরও এর সঙ্গে পরিচয় ছিল। এই সময় চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। কাজেই এই চৈনিক বস্তুটি ও তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ই-সিঙের ভারত ভ্রমণের আগেই ভারতে কাগজের ব্যবহার অল্প

মাত্রায় শুরু হয়েছিল—তবে মনে হয় তা ছিল খুবই মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য, কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রয়োজনেই উহা ব্যবহৃত হ'ত। ই সিঙ তার বিবরণীতে এক জায়গায় লিখেছেন—'ভারতে বৌদ্ধ শ্রমণ ও সাধারণ মানুষ মাটি দিয়ে ছোট ছোট চৈত্য মূর্তি তৈরী করত। কাগজের ও রেশম কাপড়ের উপর ছাপ মেরে (Blockprint) আলেখ্যও তৈরী করত। যেখানেই যাক না কেন, সঙ্গে করে এগুলি তারা নিয়ে যেত এবং নৈবেদ্য সহযোগে পূজা করত। J. Takakusu অনূদিত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত I. tsing's Record গ্রন্থের ১৫০তম পৃঃ দ্রষ্টব্য] ই-সিঙ তাঁর ভারতীয় গুরুর প্রসঙ্গে একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। "নির্মীয়মান বৌদ্ধ দেব বিগ্রহ 'বজ্র' মূর্তির নিমিত্ত প্রস্তুত মণ্ডের মধ্যে একদিন গুরুদেবকে তাঁর সব পুঁথিপত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে দেখা গেল। শিষ্যকুল যখন বলিলেন মূর্তির জন্য কাগজের যদি একান্তই দরকার থাকে তবে লেখাহীন কাগজ ব্যবহার করা যাইতে পারে, পুঁথি ছিঁড়িবার দরকার নাই, তখন গুরুদেব জবাব দেন যে ঐ সব ছিন্ন পুঁথির বিষয়বস্তুর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন।" [Takakusu অনূদিত I. tsing's Record ২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য] ই-সিঙের সময় ভারতে কাগজ প্রস্তুত হত না বলেই মনে করা যেতে পারে। কারণ তিনি তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন যে সংস্কৃত পুঁথি নকল করার জন্য কাগজ ও কালি চেয়ে চীনা বণিকদের মারফৎ তাঁকে দেশে চিঠি পাঠাতে হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর 'সংস্কৃত চীনা' অভিধানে 'শয়' [Saya] শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, কাগজবোধক চৈনিক শব্দ 'ৎসিএ' [tsie] পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতে 'শয়' শব্দে পরিণত হয়েছে। ঐ সব অভিধানে উল্লিখিত ককলি [Kakali] বা ককরি [Kakari] কাগজবোধক পারসী শব্দ 'কাগদ' এরই সংস্কৃত প্রতিরূপ। (চতুর্দশ শতকের কয়েকটি মারাঠী পুঁথিতেও 'কাগদ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই 'কাগদ' থেকেই 'কাগজ' শব্দের উদ্ভব।) এই সব পরোক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয়দের কাগজের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবে মনে হয়, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য তালপাতা ও ভূর্জপত্র কাগজের বহুল প্রচলনের ও কাগজ তৈরীর অন্তরায় হয়েছিল। কারণ দেখা যায় সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে নেপালেও কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। তিব্বতের মারফতেই কাগজ তৈরীর কৌশল নেপালে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু নেপাল আর তিব্বত নয়, ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দে, ৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে, দশম শতকে কায়রো ও দামাস্কাসে কাগজ তৈরী আরম্ভ হয়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সকল দেশের সঙ্গেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ছিল যথেষ্ট। এ সব সত্বেও কাগজ 'উৎপাদন'ত দূরের কথা, ভারতে কাগজের ব্যাপক প্রচলন যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণস্বরূপ ভূর্জ ও তালপাতার সুলভতা ও সহজপ্রাপ্যতা উল্লেখ করা খুবই সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত।

স্থলে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের দরুণ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে কিছু কিছু কাগজ যে আসত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমের গিরিপথের মধ্য দিয়েও কিছু কাগজ আসত বলে অনুমান করা যেতে পারে। একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে কাগজে লেখা যে অল্প কয়েকটি ভারতীয় পুঁথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির কাগজ ঐ সব পথেই ভারতে এসেছিল। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা তিব্বতের মারফতেই ভারতে (কাশ্মীর অঞ্চলে) প্রথম কাগজের প্রচলন হয়েছিল—এমন কি, তিব্বতীয় যোগাযোগ থেকেই কাশ্মীরে কাগজ তৈরীরও সূত্রপাত ঘটে। সুপ্রাচীনকাল থেকে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। নেপাল-ভুটান থেকে কাগজ এবং কাগজ তৈরীর জ্ঞান আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চৈনিক দোভাষী মহুয়ানের বিবরণী ভারতের কাগজ তৈরীর ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গৌড় লক্ষণাবতীর শাসক সুলতান গিয়াস-উদ্-দিন আজমশাহের দরবারে অবস্থানকারী চৈনিক দূতের দোভাষী হিসাবে মহুয়ান ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। মহুয়ানের বিবরণী থেকে বাংলা দেশে উৎপন্ন কাগজের কথা জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, বাঙ্গালীরা একরকম গাছের ছাল থেকে এক ধরনের অতি মসৃণ ও (হরিণের চামড়ার মত) চক্চকে কাগজ তৈরী করত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কাগজ' ও 'পটে'র উল্লেখ বাংলাদেশে কাগজ-শিল্পের প্রতিপত্তি ও ব্যাপকতার আভাস দেয়। মনে হয়, কাগজ ও পট ছিল ঐসময়ে বাংলার বিশিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত এক শিল্প।

"মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যায়—

"পট বেচিয়া [পাঠান্তর : বুলিয়া) কেহ ফিরয়ে নগরে

....

কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগজী [কাগচী]।"

মহুয়ানের বিবরণের সত্যতা স্বীকার করলে একঝাঁক প্রশ্ন প্রথমেই ওঠে: কাগজ তৈরীর কৌশল কি বাঙ্গালীর নিজস্ব আবিষ্কার না বিদেশ থেকে আহরিত জ্ঞান? কবে এবং কোন পথেই-বা সে জ্ঞান বাংলায় পৌঁছায়? তিব্বত-ভুটান-নেপাল হয়ে না সমুদ্রপথে চীন-কোরিয়া-ইন্দোচীন থেকে? কোন-সে গাছ যা বাংলাদেশে কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হত? নেপালে Daphne Papyracea Wall গাছ কাগজ তৈরীর কাঁচামাল যোগাত। [ঐ গাছের ছালের ভিতরের অংশ থেকে কাগজ তৈরী হত]। কিন্তু বাংলা দেশের সমতল ভূমিতে'ত ঐ গাছ বা অনুরূপ কোন গাছ জন্মায় না; কাজেই কাগজ তৈরীতে ঐ গাছ ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই কম। তুঁত জাতীয় কোন গাছের এই কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনা কিন্তু খুবই বেশী। গৌড় অঞ্চলের রেশম কাপড়ের খ্যাতি খুবই প্রাচীন। রেশমের প্রয়োজনে তুঁত গাছের চাষ এ অঞ্চলে যথেষ্ট হত এবং কালক্রমে

তা থেকে কাগজ তৈরী হওয়া খুবই সম্ভব। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম যে মুসলমান-'কাগজী'দের উল্লেখ করেছেন, বিংশ শতকেও তাদের দেখা গেছে। বাংলা দেশে মালদহ, চব্বিশপরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু কাগজী বিংশ শতকেও তাদের কাগজ তৈরীর ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয় নি। এই মুসলমান কাগজীরা আজ প্রায় হারিয়ে গেছে, কেবলমাত্র পুঁথিপত্র ও সেন্সাস রিপোর্টগুলি তাদের বিবরণ ধরে রেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, এই কাগজীদের উদ্ভব কি মুসলমান যুগে, না তারও বহু আগে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে একমাত্র বাঙ্গালী কাগজীরাই বাঁশের তৈরী 'কাঠাম-আচ্ছাদন' ব্যবহার করত—এদিক দিয়ে চৈনিক কারিগরদের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাগজীদের 'কাঠাম আচ্ছাদন' হত বিভিন্ন ধরনের ঘাস থেকে। এই ঘাসের তৈরী আচ্ছাদন পারসীক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ Dard Hunter তাঁর 'Handmade papermaking in India' গ্রন্থে লিখেছেন 1420-70 খৃঃ নাগাদ কাশ্মীরের শাসক জানুলাবিন [Zanulabin] কাশ্মীরে কাগজ তৈরীর সূত্রপাত করেন। তবে মনে হয়, উহা ঐ সময় মোটেই প্রসার লাভ করে নাই। মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বকালে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের নূতনভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ঐশ্বর্যশালী মুঘল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষণার জন্য শিশু-শিল্পটি সহজেই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মুঘল আমলেই ভারতে কাগজের জয়যাত্রার সূচনা হয়। মুঘলযুগে কাগজের ব্যাপক প্রচলনে ভূর্জ ও তালপাতার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় বটে তবে তারা একেবারে হতগৌরব হয়নি। কাগজের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও সমান কদর ও চলন ছিল। বৃটিশ যুগে কলে তৈরী কাগজই ভূর্জ ও তালপাতার মৃত্যু পরোয়ানা সঙ্গে নিয়ে আসে আর মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন এদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত করে।

মুঘল যুগের কাগজের কথা শুরু করার আগে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে লেখা কাগজের পুঁথির একটি বিবরণী দেওয়া খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য এখানে একটি বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বিবরণী মোটেই সম্পূর্ণ নয়। বিদেশী শত্রুর আক্রমণকালে বহু ধর্মকেন্দ্র ও বিদ্যানিকেতন ধ্বংস হওয়ায় অনেক অমূল্য পুঁথিই নষ্ট হয়ে গেছে। তবু এখনও ভারতে অসংখ্য মন্দির, মঠ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুঁথির যে বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে, (বহু পুঁথি বিদেশেও চালান গেছে) সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে কাগজের পুঁথির বিশদ তালিকা আজও তৈরী করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন মনীষী ও প্রতিষ্ঠান বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কাজ করেছেন। অথচ কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির সমূহের পুঁথিশালাগুলিতে ও পশ্চিম ভারতের 'জৈন-ভাণ্ডার'গুলিতে এবং নেপালে যদি ব্যাপক সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণা-অনুসন্ধান চালান যায়, তা হলে নূতন আলোক পাওয়া যাবে বলে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস।

কাগজে লিখিত ভারতীয় পুঁথির তালিকা

1089 খৃষ্টাব্দ : প্রখ্যাত প্রত্নবিদ অরেলষ্টাইন 1089 খৃষ্টাব্দে লিখিত 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে এক পুঁথির উল্লেখ করেছেন।

[Catalogue of Jammu Mss., 1894, p. 8]

1124 খৃষ্টাব্দ : 'ভাগবত পুরাণ' (ভাষা সংস্কৃত) পুঁথিটিতে রচনাকাল 1181 সংবৎ (=1124 A.D) উল্লিখিত হয়েছে লিপির ছাঁদও দ্বাদশ শতকের, কিন্তু মার্জিনে টোকা আছে রচনাকাল 1381 খৃষ্টাব্দ।

1223 খৃষ্টাব্দ : প্রাচ্যবিদ বুলার উল্লেখ করেছেন তারিখ সংবলিত প্রাচীনতম গুজরাটি পুঁথির তারিখ হচ্ছে 1223-24 A.D.

[Buhler : Indian Paleography. English translation published in Indian Antiquary Vol. XXXIII, 1904, p. 97.]

1231 খৃষ্টাব্দ : 'ভট্টিকাব্যম' উত্তর-পশ্চিম ভারতে লিখিত, হরফ—নাগরী ভাষা। আয়তন 6″×4″ সংগ্রহ—সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

1293 খৃষ্টাব্দ : 'শান্তিনাথ কলস' গ্রন্থকার—জিনেশ্বর সূরি [1275-1300 A.D] অনুলেখক বিনয়সমুদ্র, অনুলিখনকাল 1350 সংবৎ (=1293 A.D), হরফ দেবনাগরী, ভাষা অপভ্রংশ, সংগ্রহ লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃত বিদ্যামন্দির। আহমেদাবাদ।

1310 খৃষ্টাব্দ : Gough উল্লিখিত 'ভাগবত' পুঁথি।

[Gough : 'Papers' 16 & 24.]

1310 খৃষ্টাব্দ : 'শ্রুতিবিকাশ' ঋগবেদ (অষ্টম) অষ্টকের প্রাক্ সায়ন ভাষ্য। ভাষ্যকার (গ্রন্থকার) শ্রীগোবিন্দ ভট্ট। দেবনাগারী হরফে সংস্কৃত ভাষায় 1376 সংবতে রচিত।

সংগ্রহ সরস্বতী ভবন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী।

1320 খৃষ্টাব্দ : 'চিকিৎসা-সার সংগ্রহ' গ্রন্থকার : বাণগদত্ত (দ্বাদশ শতাব্দী)। অনুলেখক—রণসিংহ। দেবনাগরী হরফে, সংস্কৃত ভাষায় 1376 সংবতে বিজাপুরে (?) অনুলিখিত।

সংগ্রহ—ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুণা।

1323 খৃষ্টাব্দ : The Avesta Codex K5. 1379 সংবতে স্তম্ভতীর্থে [খমবায়ত] কাগজে অনুলিখিত।

[Reproduced by the Uuiversity Library, Copenhagen]

1334 খৃষ্টাব্দ : 'উত্তর পুরাণ' (ঋষভদেবের পরবর্তী জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী)—

গ্রন্থকার—পুষ্পদন্ত (দশম শতাব্দী), অনুলেখক—বাহদরাজ দেব, দেবনাগরী হরফে, অপভ্রংশ ভাষায় 1391 সংবতে দিল্লীতে অনুলিখিত।

সংগ্রহ—শ্রীদিগম্বর জৈন অতিশয়ক্ষেত্র, শ্রীমহাবীরজী, জয়পুর।

1354 খৃষ্টাব্দ : কাগজে লিখিত প্রাচীনতম মৈথিলী পুঁথি।

[Diringer, David : The Hand Produced Book. p. 364]

1374 খ্রীষ্টাব্দ : 'কুমারসম্ভব' (কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব) কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথি : অনুলেখক—অজ্ঞাত (অংশটুকু পোকায় খেয়ে গেছে) দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত ভাষায় 1431 সংবতে অনুলিখিত।

সংগ্রহ—রাজস্থান ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যোধপুর।

1378 খ্রীষ্টাব্দ : 'কাদম্বরী' (তৎসহ কবিপুত্র পুলিন্দের) সংযোজন। গ্রন্থকার—মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট (৭ম শতাব্দী), অনুলেখক—মণ্ডন। দেবনাগরী হরফে, সংস্কৃত ভাষায় 1435 সংবতে অনুলিখিত।

সংগ্রহ : বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব)।

1387 খ্রীষ্টাব্দ : 'নিরুক্ত' (ভাষ্যসহ), গ্রন্থকার : নিরুক্ত-যাস্ক। ভাষ্য—দুর্গাচার্য— দেবনাগরী হরফে, সংস্কৃত ভাষায়, 1444 সংবতে লিখিত।

সংগ্রহ বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। হোশিয়ারপুর, পাঞ্জাব।

1404—কাগজে লিখিত প্রাচীনতম বাংলা পুঁথি।

[Diringer, David : The Hand produced Book. p. 374]

(ক্রমশঃ)

History of Papermaking and introduction of paper in India
By Pankaj Kumar Datta.

গ্রন্থাগারের পটভূমিকায় গ্রামোফোন রেকর্ড

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার কথাটির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত। সাধারণের পাঠের জন্য বই যেখানে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয় সেই স্থানকেই আমরা সাধারণতঃ গ্রন্থাগার বলে বুঝি। কিন্তু এই বই ছাড়া আরও যে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে পারে তারই একটির দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনায় বই সম্পর্কে অনেক আলোচনাই হয়েছে। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডও যে গ্রন্থাগারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে, তা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অথচ সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি আজও।

বই সাজিয়ে রাখার জন্য ডিউই (Dewey), কোলন (Colon), ইউনিভার্সাল ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেসন (U.D.C) প্রভৃতি অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে এবং এর মধ্যে সুবিধার ভিত্তিতে মেলভিল ডিউই প্রবর্তিত পদ্ধতিই পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডকে গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করে উপযুক্ত কার্যপ্রণালীর রূপ দিতে খুব অল্প কয়েকটি গ্রন্থাগারই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে Luton Central Library'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগারের জন্য এক কাযপ্রণালীর কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু সুষ্ঠু এক কাযপ্রণালী কেউই স্থির করতে পারেন নি। তাই গ্রামোফোন রেকর্ড নিয়ে কাজ করতে যেয়ে যে বিবিধ অভিজ্ঞতা জন্মে তার সাহায্যে এক কাযকরী পদ্ধতিকে স্বীকার করে চলাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী যেমন জটিল তেমনি এক সুচিন্তিত পন্থার অনুসরণ এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

বিভাজন—(Classification)

Dewey পদ্ধতি অনুযায়ী বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন সমস্ত জ্ঞানকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, গ্রামোফোন রেকর্ডের বেলাতেও তাকে কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। বিষয় অনুযায়ী ভাগ করার আগে গ্রামোফোন রেকর্ডগুলিকে আকার অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। যেমন, 78 R.P.M. Extended Play (45 R.P.M.) ও Long Playing records. এর মধ্যে সাধারণতঃ দ্বিতীয়টি আকারে সবচেয়ে ছোট, প্রথমটি মধ্যম ও তৃতীয়টি আকারে সবচেয়ে বড়। একত্রে বিভিন্ন আকারের রেকর্ড রাখা অসুবিধা বলে আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন, যে বর্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড সম্পর্কেই প্রবন্ধের সীমা গণ্ডিবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন দেশের ও বিষয়ের রেকর্ড নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

রেকর্ডের প্রথম পর্যায়ের ভাগ হবে দুই রকম :

১। কণ্ঠস্বর (vocal music)

২। যন্ত্র (Instrumental music)

এর পর ভাগ হবে এই রকম :

কণ্ঠস্বর (Vocal)

১। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (classical)

২। ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান (Devotional)

৩। পল্লীগীতি, বাউল, ভাটিয়ালী (Folk)

৪। (ক) আধুনিক—পুরুষ শিল্পী (Modern—Male)

(খ) আধুনিক—মহিলা শিল্পী (Modern Female)

৫। চলচ্চিত্র (Film Songs)

৬। রবীন্দ্র সঙ্গীত (Tagore Songs)

৭। নজরুল গীতি. দ্বিজেন্দ্র গীতি, অতুলপ্রসাদী ইত্যাদি (Nazrul, Dwijendra, Atulprasad)

৮। জীবনী, আবৃত্তি ও সমবেত কণ্ঠ (Life, Recitation, Chorus)

যন্ত্র (Instrumental)

১। যন্ত্র সঙ্গীত—উচ্চাঙ্গ (Instrumental—Classical)

২। যন্ত্র সঙ্গীত- লঘুসুর (Instrumental—Light)

সাধারণতঃ কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ডগুলিকে যথাক্রমে ৮ ও ২ ভাগে ভাগ করার পর প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগের আবার উপ-বিভাগও করা যায় রেকর্ড বেশী থাকলে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ডগুলিকে আলাদা করার পর সেগুলিকে প্রথমে শিল্পীর নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে। একই শিল্পীর সমস্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড পাশাপাশি আসার পর ওগুলিকে প্রচলিত রাগের নাম অনুযায়ী রাখা ভাল কিন্তু একই রেকর্ডের দুই পিঠে দুই রকম রাগ থাকায় এতে একটু অসুবিধা দেখা দেবে। আবার রেকর্ডের আকার অনুযায়ী ভাগের ফলে একই গানের রেকর্ড বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে—। এই সকল অসুবিধা দূর করতে গ্রন্থসূচীর (Catalogue) সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে ঐ বিশেষ রাগের গান কোন কোন রেকর্ডে পাওয়া যাবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

এরপর ভক্তিমূলক গানের রেকর্ড। এতে থাকবে শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, রাগপ্রধান প্রভৃতি। যদিও সব রাগপ্রধান গানই ভক্তিমূলক হবে এমন কথা নেই তবুও যেহেতু

অধিকাংশ গানই ঐ পর্যায়ের বলে একে ভক্তিমূলক গানের ভিতর রাখাই সুবিধাজনক। এখানেও গানের প্রকৃতিগত বিভাগ অর্থাৎ ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান প্রভৃতি ভাগের পর শিল্পীর নাম অনুযায়ী সাজাতে হবে। পল্লীগীতি, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানের রেকর্ড'ও ঠিক এই ভাবে ভাগ করা হবে।

আধুনিক গানের রেকর্ড'গুলিকে পুরুষ ও মহিলা শিল্পীর জন্য দুই ভাগ করে তারপর শিল্পীর নাম অনুযায়ী ভাগ করতে হবে। রেকর্ডের প্রাচুর্য থাকলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড-গুলিকেও পুরুষ ও মহিলা শিল্পীর জন্য দুই ভাগ করে পরে শিল্পীর নামানুসারে সাজাতে হবে। নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্র গীতি প্রভৃতি রেকর্ড প্রথমে গানের ভাগ পরে শিল্পীর নামের বানান অনুযায়ী ভাগ করতে হয়।

ছায়াছবির (Film Song) গানের রেকর্ড'গুলিকে চলচ্চিত্রের নাম অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন। কারণ ছায়াছবির নামেই অধিক গানের প্রসিদ্ধি।

সমবেত কণ্ঠে গান (Chorus), আবৃত্তি ও জীবনী আলেখ্যের জন্য প্রথমে মূল বিভাগ করে পরে সমবেত কণ্ঠ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নামে, আবৃত্তির ক্ষেত্রে আবৃত্তিকারীর নামের ও জীবনী আলেখ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে।

যন্ত্র সঙ্গীতের বিভাগ একটু আলাদা। উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যন্ত্রের নাম অর্থাৎ সেতার, সরোদ, বেহালা, বাঁশী, সারেঙ্গী প্রভৃতির নামানুযায়ী পর পর ভাগ করার পর প্রত্যেক যন্ত্রের শিল্পীর নামের বানান অনুযায়ী সাজাতে হবে।

লঘু যন্ত্র সঙ্গীতের বিভাগও ঠিক একই প্রকার। সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নাম অনুযায়ী পর পর সাজাতে হবে।

মোটামুটি এইভাবে ভাগ করে রাখাই হল গ্রামোফোন রেকর্ডের বিভাজন (classification). তবে আলোচ্য অংশে কেবল মাত্র বাঙলা বা আংশিক হিন্দী গানের রেকর্ডের কথাই বলা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার রেকর্ডের জন্য প্রয়োজন আলাদা ব্যবস্থা। বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ড'ই সাধারণতঃ বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। কিন্তু অন্যান্য ভাষার রেকর্ডের জন্যও একই ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। লঘু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ড'গুলি আলাদা থাকলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইভাবে আলাদা করার প্রয়োজন নেই। কারণ অধিকাংশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই হিন্দীতে রচনা করা হয়েছে।

রেকর্ডসূচী (Catalogue)

রেকর্ড বিভাজনের পরেই আসবে রেকর্ড'সূচীর (catalogue) প্রশ্ন। বইয়ের মতই গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যও কার্ড ক্যাটালগ করা সুবিধাজনক। এতে থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :—

১। শিল্পীর নাম।

২। সঙ্গীতের উৎস (Medium of performance) যেমন, কণ্ঠস্বর/যন্ত্র।

৩। (ক) সঙ্গীতের প্রকৃতি (কণ্ঠ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে)—উচ্চাঙ্গ, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পল্লীগীতি, ভজন ইত্যাদি।

(খ) যন্ত্রের পরিচয় (যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে)—সরোদ, সেতার, বাঁশী, গীটার, তবলা ইত্যাদি।

৪। গানের প্রথম কলি। সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথম কলির কোন প্রয়োজন নেই।

৫। রেকর্ডের প্রকৃতি (Type of record) – 78 RPM, Extended Play বা Long Playing.

৬। রেকর্ডের পিঠ ও অংশ (Side & cut)—extended বা Long playing হলে রেকর্ডের কোন পিঠ লেখা ছাড়া ও কোন অংশ (cut) তা লিখতে হয়। extended play-তে সাধারণতঃ (২ + ২) চারটি অংশ থাকে আর long playing record-এ (৬+৬) বারটি অংশও থাকতে পারে। তাই বিশেষ গান ন্ট Long playing record-এর কোন পিঠের কোন অংশ আছে তা লিখে রাখা প্রয়োজন।

৭। প্রস্তুতকারকের নাম ও রেকর্ড সংখ্যা (Manufacturer's name & record number)—যে সংস্থা রেকর্ড তৈয়ারী করেছে রেকর্ডের উপর দেওয়া সেই সংখ্যা। এতে কোম্পানীর নাম ও রেকর্ডের বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

৮। গ্রন্থাগারের সংযুক্তি সংখ্যা (Accession number) – রেকর্ডের উপরে অর্ধ গোলাকৃতি লেবেল আটকিয়ে তাতে এই নম্বর দেওয়া হয়। এর ফলে রেকর্ডের বিস্তারিত Accession Register থেকে জানা যায়।

এই কার্ডখানিই হবে প্রধান বা মুখ্য কার্ড (Main entry)। এ থেকে যাতে সব রকমের খবরই যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর পরেও কয়েকটি আলাদা কার্ড করা দরকার যেমন,—

গানের প্রথম কলি দিয়ে—'আখ্যা সংলেখ' (Title entry), এতে প্রথম কলির পর কোন প্রকৃতির গান অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ হলে রাগ ও রাগিনী, আধুনিক, চলচ্চিত্র হলে চলচ্চিত্রের নাম ইত্যাদি বিবরণ দিতে হবে। মাঝখানে শিল্পীর নাম দিয়ে পরে কণ্ঠস্বর কি যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্রে হলে যন্ত্রের নাম এবং রেকর্ডের গতি অর্থাৎ 78 RPM, না extended play না Long playing তা দিতে হবে কারণ প্রত্যেকের কাছে তিন রকমের রেকর্ড বাজানোর মত record player নেই।

দ্বৈতকণ্ঠে গানের দ্বিতীয় শিল্পীর নামে আলাদা কার্ড করা হবে আর সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নামে কার্ড রাখতে হবে।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক যন্ত্রের নামে আলাদা কার্ড করে তাতে শিল্পীর নাম, গানের প্রথম কলি, রাগ ও রাগিণী প্রভৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সংযুক্তি তালিকা (Accession Register)

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য একটা আলাদা Accession Register রাখা দরকার। বইয়ের Accession Register থেকে এই Register একটু আলাদা ধরনের। এতে থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :—

১। সংযুক্তির তারিখ (Date of accession)
২। সংযুক্তি সংখ্যা (Accession number)
৩। প্রস্তুতকারকের সংখ্যা (Manufacturer's number)
৪। শিল্পীর নাম (Artist's name)
৫। প্রথম কলি (First line of the song)
৬। প্রস্তুতকারকের নাম (Manufacturer's name)
৭। বিক্রেতার নাম (Supplier)
৮। বিল নং ও তারিখ (Bill number and date)
৯। মূল্য (Price)
১০। সঙ্গীতের প্রকৃতি (Type of song)
১১। বাতিল করার কারণ ও তারিখ (Reason and date of disposal)
১২। মন্তব্য (Remarks)

রেকর্ড সংরক্ষণ (Preservation)

বইয়ের চেয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ একটু ব্যয়সাধ্য। প্রচণ্ড গরমে রেকর্ড বেঁকে যাবার সম্ভাবনা বেশী, আবার একটু হাত ফসকে গেলেই ভেঙ্গে চুরমার। বেঁকে যাবার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার। বইয়ের চেয়ে রেকর্ড সহজে ভঙ্গুর হলেও এর স্থায়িত্ব বেশী। কথাটা পরস্পর বিরোধী হলেও ঠিক। কারণ কালে বই জীর্ণ ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে কিন্তু রেকর্ডের ওরকম ক্ষতি সহজে হয় না। তবে মাঝে মাঝে বুরুশ দিয়ে রেকর্ড পরিষ্কার করা দরকার, না হলে এর খাঁজে খাঁজে ধুলা-বালি আটকে যেয়ে কথাকে অস্পষ্ট করে তোলে। বইয়ের মলাটের মত রেকর্ডের জন্য রেকর্ড আচ্ছাদন (Record cover) একান্ত অপরিহার্য। এই আচ্ছাদন ছিঁড়ে গেলে নতুন আচ্ছাদন লাগাতে হয়।

রেকর্ড লেন-দেনের ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে গেলে তাকে আবার বাঁধিয়ে কাজ চালানো যায় কিন্তু রেকর্ডের কোন পিঠে সামান্য

আঁচড় লাগলেও রেকর্ডখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এজন্য রেকর্ড ফেরত নেওয়ার সময় ভালভাবে দেখে এমন কি বাজিয়ে নেওয়া দরকার।

আলোচ্য অংশে যে রেকর্ডের কথা বলা হল তা সবই সঙ্গীত সম্পর্কীয়। কিন্তু আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত না হলেও পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা, যেমন How to learn English, Pronunciation of words, Art of acting প্রভৃতি দরকারী শিক্ষার মাধ্যম গ্রামোফোন রেকর্ড। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচলন আমাদের দেশে আজও হয়নি অথচ শিক্ষার এ একটা ভাল শ্রুতি সহায়ক, (Good audio service to Education) মাধ্যম। ছোটদের প্রাথমিক কাজের জন্য গৃহশিক্ষকের অভাব মেটাতে গ্রামোফোন রেকর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার এক সুন্দর ভূমিকা নিতে পারে।

গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বইয়ের মধ্যে আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির কথাই জানতে পারি, কিন্তু সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারি গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। এ কারণে বইয়ের তুলনায় রেকর্ড আরও প্রয়োজনীয়। অতীতের মানুষটির কণ্ঠস্বর, তার বাচনভঙ্গী সবই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। গ্রামোফোন রেকর্ড আজ শিক্ষার জগতে আস্তে আস্তে আপন স্থান করে নিচ্ছে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার এমন মনোরম ব্যবস্থা আর নাই। বাড়ীতে বইয়ের আলমারী যেমন সুশিক্ষার পরিচয় বহন করে, তেমনি ভাল ভাল রেকর্ডও সুরুচি ও কলানুরাগিতার কথাই স্মরণ করায়। আমেরিকা, লণ্ডন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে বইয়ের গ্রন্থাগারের পাশেই রয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগার। আর সঙ্গীত শিক্ষানিকেতনে তো আলাদা গ্রন্থাগারই থাকে।

বিদেশের কয়েকটি জায়গায় সৌখীন ক্লাবও গড়ে উঠছে গ্রামোফোন রেকর্ডের। গ্রামোফোন রেকড রাখা অনেকের কাছেই 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই সব রেকর্ড কিনতে পারে না বা সংগ্রহও করতে পারে না তাই তারা এই সব রেকর্ড ক্লাবে এসে তাদের প্রয়োজনীয় রেকর্ড শুনে যায়। চাঁদা-দেওয়া গ্রন্থাগার যেমন আছে তেমনি বিনা চাঁদারও রেকর্ড গ্রন্থাগার রয়েছে অনেক ওদেশে। যাঁরা পড়তে পারেন না তাঁদের কাছে গ্রামোফোন রেকর্ড এক অভিনব সম্পদ। কেবলমাত্র সঙ্গীতই নয়, ভাষার উচ্চারণ, ও বানান একই সাথে জানাবার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা রেকর্ড গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারি। সকলের পক্ষে সব রেকর্ড কেনা যেমন সম্ভব নয় সেই রকম আবার Recard player কেনাও ব্যয়সাধ্য। এ জন্য প্রয়োজন রেকর্ড গ্রন্থাগারের। যেখানে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বা বিনা অর্থে রেকর্ড নেওয়া সম্ভব হবে বা বাজিয়ে শোনা যাবে। আর সেই গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিককে আরও কয়েক ধাপ

এগিয়ে যেতে হবে প্রয়োজনমত গ্রন্থাগারকে সাজাতে ও তাতে একটি সুষ্ঠু কার্যপ্রণালীর রূপ দিতে। এই গ্রন্থাগারের কাযপ্রণালীতে এক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যাঁরাই দেবেন তাঁরাই হবেন রেকর্ড গ্রন্থাগাকিরদের শ্রদ্ধাভাজন। এ সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানাই।

Gramophone records in the library
By Bimal Chandra Chattopadhyay

।। একটি সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় ।।

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা—

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীকে প্রায়ই অনেক রকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিতে হয়। কোন সাহিত্যিক, শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকের জীবন সম্বন্ধে তথ্য তার মধ্যে অন্যতম।

সংস্কৃতিমূলক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবী এখন আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। প্রায়ই সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিমূলক সফরে বা গবেষণামূলক তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতিতে মিলিত হচ্ছেন। এক দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক অন্যদেশ পরিভ্রমণে আসছেন।

ধরা যাক্, কোন একজন রুশ বৈজ্ঞানিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে রসায়নের কোন বিশেষ শাখার উপর বক্তৃতা দেবেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে ও জীবনীসম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চাইলেন গ্রন্থাগারিকের কাছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীকে এই তথ্য খুঁজে দিতে হবে।

অথবা আপনার কাছে আপনার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানতে চাইলেন শ্রীযুক্ত 'ক'র কোন ফটো আছে কিনা। কারণ শ্রীযুক্ত 'ক' একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তাঁকে আনবার জন্য বিমানঘাঁটিতে বা ষ্টেশনে লোক যাবেন, কিন্তু যাঁরা আনতে যাবেন তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁকে কোনদিন দেখেননি, সুতরাং ফটো না পেলে যদি ভীড়ের মধ্যে তাঁর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি থেকে যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁকে ফটো দিয়ে সাহায্য করাও তার একটি কাজ।

সমস্যা :

প্রথমটি সম্বন্ধে মনে হতে পারে এ আবার কি এমন সমস্যা, কত কত বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারী রয়েছে উত্তর তাতেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান অত সহজ নয়। বিশেষ করে, কোন বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে জীবনীমূলক তথ্য আহরণ করা মাঝে মাঝে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কেন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে তার মোটামুটি কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হল।

(১) আদর্শগত ব্যবধানের জন্য (Ideological difference) অনেক সময় একদেশে প্রকাশিত বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারীতে অন্যদেশের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে তথ্যের স্বল্পতা এবং অনেক সময় তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) আদর্শগত কারণে অনেক সময় কোন দেশও বৈজ্ঞানিকদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়।

(৩) অনেক সময় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও নিজেদের নামপ্রকাশে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

(৪) যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের নামই সাধারণতঃ বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারীতে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করলেন তার নাম ঐ ডিক্সনারীতে সংযোজনের জন্য পরবর্তী সংস্করণের অপেক্ষায় থাকতে হয় এবং প্রায়ই পরবর্তী সংস্করণ বেরোতে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত কারণগুলোর সমন্বয়ের ফলে বৈজ্ঞানিক জীবনী সম্বন্ধে তথ্য জানা কষ্ট-সাধ্য হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও একটু কষ্টসাধ্য। কারণ প্রায়ই বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারীতে ছবি থাকে না, থাকলেও সবার ছবি থাকে না।

এই সমস্যার সার্বিক সমাধান হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু আংশিক সমাধানে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী প্রয়াসী হ'তে পারেন।

সমাধানের কয়েকটি উপায় নিম্নে দেওয়া হল :

(১) গ্রন্থাগারে যে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা হ'য়ে থাকে তার লেখক সম্বন্ধে বইগুলোর প্রচ্ছদের মলাটে ছবি ও জীবনী দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে এই মলাটগুলি বই থেকে খুলে নেওয়া হয়ে থাকে। ঐ মলাটের বিশেষ অংশটি কেটে নিয়ে লেখকের নামানুযায়ী বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে ফাইলে রাখা যেতে পারে।

(২) দৈনিক পত্রিকা থেকে সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বা অন্যান্যভাবে পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে ফাইল করা যেতে পারে।

(৩) কোন বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পত্রপত্রিকায় কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনীমূলক প্রবন্ধ বেরুলে সেই অংশটুকু ফটোকপি করে নিয়ে ফাইলে রাখা যেতে পারে।

(৪) কোন বিশেষ কনফারেন্স সংখ্যা বেরুলে তাতে সাধারণতঃ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কোন শাখার সভাপতি তাঁদের জীবনী ও ছবি প্রকাশিত হয় (যেমন Science & Culture এর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বিশেষ সংখ্যা)। এই জীবনীগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে।

এইভাবে উপরোক্ত সমস্যাটির আংশিক সমাধান হয়তো অসম্ভব নয়।

A Problem and its solution
By Subhas Chandra Mukherji

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী হতে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন)

'ইশ্ হাট্‌টে আইন্‌স্ট আইন শোয়েনেস্ট ফাটেরল্যাণ্ট !'

জর্মন ভাষা শিক্ষার ক্লাসে প্রতিদিনই শিক্ষক মশাই ক্লাসে ঢুকেই একটি না একটি বাক্য লিখতে দিতেন। এটি ছিল তাঁর প্রতিদিনকার প্রিয় অভ্যাস। তারপর বাক্যটি বোর্ডে লেখা হয়ে গেলে নিজেই সেটি আবার পড়তেন। নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করতেন—'আচ্ছা, লিখেছ ? "ইশ্ হাট্‌টে আইন্‌স্ট আইন......... ?"

তারপর একটু থেমে আবার বাক্যটির অর্থ বলে দেবেন। প্রথমে ইংরেজীতে—'I had once a beautiful fatherland.' তারপর বাংলায় আবার তার তর্জমাও করে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। আর তাই করেই শুধু ক্ষান্ত হতেন না—টীকা-টিপ্পনি এবং কখনো কখনো সরস মন্তব্য—'অর্থাৎ বুঝলে কিনা, একদা আমাদেরও একটি সুন্দর জন্মভূমি ছিল। সেটি কি জানতো ? পূর্ববঙ্গ।'

এরপর তিনি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কার কোথায় বাড়ী জানতে চেয়ে জেরা করতে শুরু করলেন। আর আশ্চর্য ! এই জেরা থেকেই প্রকাশ পেল ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে !

পূর্ববঙ্গের কথা মনে হলেই ভণ্ডুলের মন চলে যায় কলকাতা থেকে দেড়শ মাইল দূরে তার জন্মভূমি পূর্ববাংলার সেই গ্রামখানিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ওপর থেকে একটি কালো পর্দা সরে যেয়ে সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শুধু জন্মভূমি বলেই নয়, শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানটি বোধ হয় সর্বকালে সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। নিজ গ্রামের সঙ্গে ভণ্ডুলের সম্পর্ক অবশ্য খুব বেশী দিনের নয়। কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছিল। তবু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল দেশ ভাগাভাগি হওয়ার আগে পর্যন্তও। গরমের কিংবা পূজার ছুটিতে 'ইস্ট বেঙ্গল মেল'-এ চড়ে গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে করে পদ্মা পাড়ি দেওয়ার সে স্মৃতি সহজে ভোলবার নয়। ভুলে যাবার নয় পূর্ববঙ্গের সেই অপূর্ব প্রকৃতি। কতবার স্বগ্রামে তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার তাগিদে ভণ্ডুল নৌকার হাল ধরেছে আর মাঝি গুণ টেনে নিয়ে চলেছে নদীর ধার দিয়ে। যে না দেখেছে, তাকে সে কি করে বোঝাবে পূর্ববঙ্গের সেই বৈচিত্র্যময় অপূর্ব প্রকৃতির কথা—বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে কিংবা বসন্তে তার অপরূপ ঋতুর বাহার আর রঙ বদলের কথা !

অবশ্য কি পূর্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে—কি বঙ্গদেশের বাইরে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তো সর্বত্রই আছে—গ্রামও আছে—তার বিচিত্র জন-জীবনলীলাও আছে। অনেকের কাছেই ভণ্ডুলের এই হা-হুতাশের কারণ ঠিক বোধগম্য না হতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গই এখন

ভণ্ডুলের চিরদিনের বাসস্থান বলে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এই এত বছর পরেও ভণ্ডুল কেন এমন হা-হুতাশ করতে বসেছে। পূর্ববঙ্গ তো এখন ভণ্ডুল এবং ভণ্ডুলের মত আরো অনেকের কাছে স্মৃতিমাত্র। আর সে স্মৃতিও মধুর হতে পারে না, সে স্মৃতি তো বেদনার।

একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই দেশ—অথচ আজ পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা দুটি আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। আজ আর হাজার ইচ্ছে হলেও কি সেই গ্রামের সেই পরিবেশ ফিরে পাওয়া যাবে। তাছাড়া সময়ও তো অপরিবর্তিত নয়। সেদিনের সেই পরিবেশ সে তো আর কোনদিনই সে ফিরে পাবে না! ভণ্ডুল তার খেলার সাথী ও স্কুলের সহপাঠীদের কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?' না, ভণ্ডুলের খেলার সাথী বা সহপাঠীদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান এ নিয়ে ভণ্ডুলের মনে সে সময়ে কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না। বরং ভণ্ডুল যাদের সঙ্গে রোজ হেঁটে দু'মাইল দূরের স্কুলে পড়তে যেত সেই আজিজুল, মজিদ, সামাদ, জাহাঙ্গীর, মশীয়র প্রভৃতি তার সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ছিল মুসলমান।

ভণ্ডুলের মনে পড়ে, এই কলকাতা শহরেই ১৯৪৬ সালের সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনে শিয়ালদহ স্টেশনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার সহপাঠী আবদুল মজিদের সঙ্গে। রেলের ট্রেন পরীক্ষকের চাকুরীতে ঢুকেছিল মজিদ। সদ্য বিবাহিত তার সেই বন্ধু সেদিন তাকে আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর এই বলে বার বার আফ্‌শোষ করেছিল, "ভাই, এইদিন না হলে আজই তোমাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে আমার গিন্নির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।'

সেদিন তাদের চোরের মত পালিয়ে যেতে হয়েছিল দুজনকে দুদিকে—পাছে কে কার প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠবে এই ভেবে। আবদুল মজিদ আজ কোথায় আছে ভণ্ডুল জানে না। বিশ বছর হয়ে গেছে তাদের পরস্পরের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। আজো যদি কোন দিন তার সাথে দেখা হয়ে যায় তবে সে কি ঠিক তেমনি করেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে না?'

ভণ্ডুলের সহপাঠী ছিটগ্রস্থ আজিজুল আরবি ছেড়ে তার কম্বিনেশন নিয়েছিল সংস্কৃত। যদিও তাকে নিয়ে সংস্কৃতের পণ্ডিত মশায় একটু প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ করতেন কিন্তু আসলে সংস্কৃতের প্রতি খুব যে একটা প্রীতিবশতঃ সে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেছিল তা নয়—ওটা ছিল ওর একটা খেয়াল। জাহাঙ্গীর নামে ফর্সা লাজুক ছেলেটিকে দেখলেই স্কুলের ছেলেরা রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা জানাত 'কুর্নিশ' করে। আর সম্বোধন করত 'জাঁহাপনা' বলে। ছেলেটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত আর তার ফর্সা গাল হয়ে উঠত রাঙা টকটকে।

সংশয়ী পাঠক, আপনি হয়তো ভাবছেন ভণ্ডুল এভাবে যে তার বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করছে সেসব কথা শুনে আপনার লাভ কী! আর গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকে ভাবপ্রবণতার চোরাবালিতে নিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ ডুবিয়ে দেবার এই অপচেষ্টা দেখে সম্ভবতঃ ভণ্ডুলের ওপর আপনারা ক্রুদ্ধও হয়েছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ যখন উঠেছেই তখন এই প্রসঙ্গেই ভণ্ডুল তার জীবনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বলেও থামতে পারছে না। এই প্রসঙ্গেই ভণ্ডুলের মনে পড়ে গেল জিন্নতবাসিনী কোহিনুরের কথা। কোহিনুরই প্রথম ভণ্ডুলের মত একটি গ্রাম্য বালকের কাছে সাহিত্য-সঙ্গীত ও শিল্পের দরোজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

সেটা ১৯৪২ সাল। ভণ্ডুলের গ্রামটি স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে বরাবরই খুব উত্তাল হয়ে উঠত। ১৯২১ সালে অবশ্য ভণ্ডুলের জন্মই হয়নি আর ১৯৩০ সালে তার বয়স আর এমন কি। কিন্তু ১৯৪২ সালে ভণ্ডুলের ওপরও বেশ কিছু দায়িত্ব এসে পড়েছিল। তবে তাকে বিশেষ কিছুই করতে হল না। দাদারা দু'এক জায়গায় মিটিং এবং কয়েকটা মিছিল করবার পরই পুলিশ এসে যে ক'জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কয়েকদিন ধরেই এই গ্রেপ্তার পর্ব চলছিল। সর্বশেষে এল—'অ' দাদার ডাক। 'অ' দাদা ভণ্ডুলকে খবর পাঠালেন। ভণ্ডুল গিয়ে দেখে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। 'অ' দাদার পরিধানে ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী, তাঁকে মাল্য ও চন্দনে ভূষিত করা হয়েছে। মেয়েরা ঘন ঘন হুলু ও শঙ্খধ্বনি করছেন। একপাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ বাহিনী। 'অ' দাদা বললেন, 'ভণ্ডুল, আমি তো চল্লাম, কবে ফিরব জানি না। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরীর ভার এখন তোমার ওপর। দেখো আমাদের এত কষ্টে গড়া লাইব্রেরী যেন নষ্ট না হয়।' ভণ্ডুল যেন একটি কাজের মত কাজ পেয়ে বর্তে গেল। অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সে তখন লাইব্রেরী চালাতে লাগলো। গ্রামের লাইব্রেরী হলেও তার সংগ্রহ নিতান্ত মন্দ ছিল না। বইয়ের রাজ্যে সে এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। আর এই সময়েই কোহিনুরের সঙ্গে তার পরিচয়। কোহিনুর প্রায়ই বই নিতে আসতো লাইব্রেরীতে। কোহিনুরের বাবা শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কলকাতাতেই কোহিনুরের জন্ম, কলকাতায়ই সে মানুষ হয়েছে। কলকাতার স্কুলেই সে পড়ত। সেবারে কলকাতায় বোমা বর্ষণের পর কোহিনুররা দেশের বাড়ীতে এসে বাস করছিল। কোহিনুরদের বাড়ীতে পর্দাপ্রথার খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না। কোহিনুর ভণ্ডুলেরই সমবয়সী। অথচ প্রথম যখন ওর সঙ্গে তার আলাপ হল তখন ও এভাবে কথা বলেছিল যেন ও ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

যাই হোক, কোহিনুরদের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। কোহিনুরই একদিন ভণ্ডুলকে জোর করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং তার বাবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। কোহিনুরের বাবা স্মিতহাস্যে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন, পড়াশুনার কথা, বইয়ের কথা, রাজনীতির কথা, রাজনৈতিক দাদাদের কথা—আরো

অনেক কথা। কোহিনুর শুনিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান তাদের অজস্র রেকর্ডের সংগ্রহ থেকে। কোহিনুর নিজেও ভাল গাইতে পারত। পরবর্তীকালে তার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের—নজরুলের কত গানই না ভণ্ডুল শুনেছে। কোহিনুরের মুখেই সে প্রথম শুনেছিল শান্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা। কোহিনুর রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ দেখেও এসেছিল।

ভণ্ডুলের অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে সাহিত্য-সঙ্গীত বা শিল্পকলার প্রতি কারো একটা খুব আগ্রহ ছিল না। তাদের মধ্যে ফুটবলের আকর্ষণই ছিল প্রধান। আর কোহিনুরকে সকলেই এড়িয়ে চলত। একথা স্বীকার করতেই হবে সমবয়সী হলেও কোহিনুরের মন ছিল অনেক পরিণত—বুদ্ধিও সে নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে বেশী রাখত—তাছাড়া সে শহরে মানুষ হয়েছিল।

আরও বেশী ঘনিষ্ঠতা হলে ভণ্ডুল জানতে পেরেছিল, কোহিনুর কবিতা লেখে, সাহিত্যচর্চাও করে। সেদিন থেকে গ্রাম্য বালক ভণ্ডুল তার মনে কোহিনুরকে রীতিমত শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। কোহিনুর অবশ্য প্রতি কথাতেই ঠোঁট ওল্টাত - 'যাঃ এসব আবার এমন কি—এসব তো সকলেই পারে।' কিন্তু ভণ্ডুলের বিশ্বাস হত না। ভণ্ডুলের তখন মনে হয়েছিল, কোহিনুরের মত মেয়ে বোধ হয় দুনিয়ায় একটিই আছে।

আর সেজন্যই বোধ হয় ভগবান তাকে আর এ দুনিয়ায় রাখলেন না। অতি অল্প বয়সেই তাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। কোহিনুরের কবরের কাছে বসে থাকতে থাকতে ভণ্ডুলের বুকটা কি রকম যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠত। আহা! জীবনে যদি ভণ্ডুল কোহিনুরের কবরটি অন্তত: আর একটিবার মাত্রও দেখতে পেত!

আবার ভণ্ডুলের মনে হল পূর্ব বাংলা এখন আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত—আর সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গান এখন সে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যবিরোধী। কোহিনুর বেঁচে থাকলে কি সেও তাই আজ মনে করত?

ভণ্ডুলের গ্রামের সেই লাইব্রেরীটির নামকরণও পরে করা হয়েছিল 'কোহিনুরের নামে। কোহিনুরের বাবা কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। ভণ্ডুল জানে না 'কোহিনুর মেমোরিয়াল লাইব্রেরী'টি তাদের গ্রামে আজও আছে কিনা, মহাপুরুষদের নাম ছাড়াও এমনি কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি-বিজড়িত অসংখ্য পাঠাগার বাংলাদেশে আছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা তার খোঁজ রাখেন কি? এসব আবেগকে কি তারা একেবারে বাতিল করে দেবেন? বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আধুনিক মানুষ হৃদয়াবেগকে ক্রমশঃ অস্বীকার করতে চলেছে - পাপপুণ্য বোধহীন, ভগবানবিহীন, অনুভূতিহীন এবং প্রেমবিহীন এই যন্ত্র—সভ্যতার শেষ কথা কে বলবে? কে যেন বলেছিল,—'Science by itself can never be enough.' ভণ্ডুলও একজন অবিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাসের সামান্য তৃণখণ্ড পেলেও সে যেন বর্তে যায়। একমাত্র জ্ঞানই তার মনের গ্লানি মুক্ত করে দিয়ে তাকে অনাবিল আনন্দ দিতে পারে—আর সেই জ্ঞানের সঞ্চয় তো গ্রন্থাগারে।

IN CALCUTTA NOW : A Running Commentary by Bhandulananda Sarma—a morbid correspondent from the 'City of Death'.

গ্রন্থ সমালোচনা

মস্তক-বিনিময়ঃ একটি ভারতীয় উপাখ্যান —টমাস মান্। অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়। প্রকাশক : মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৪।৩ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : চারটাকা।

নিছক ব্যক্তিবিশেষের ভালো-লাগাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে অনুবাদকর্মের প্রেরণা স্তিমিতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার পিছনে নেই কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা। সে কারণে নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে, এই শাখার সিদ্ধির বিষয়টিও নেহাত ব্যক্তিগত। তার ফলে সাধারণ পাঠকের অনুবাদের আনন্দ ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও সাফল্যের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের আলোচ্য অনুবাদ কর্মটিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীক্ষিতীশ রায়ের রুচির পক্ষপাতিত্ব এবং তৎপ্রেরণায় এই রচনাটি অনূদিত। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের কর্তব্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কারণ কোনো সাহিত্যিকের সামগ্রিক মূল্যায়নের এখানে অবকাশ কম। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক যে অনুবাদকর্মটি সাহিত্যি-কের জনপ্রিয় রচনা হতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অধিকার রয়েছে।

টমাস মানের সামগ্রিক মূল্যায়নের পক্ষে এই অনূদিত রচনাটি কতখানি সহায়ক, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন আমাদেরও রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা যারা মানের মধ্যে ক্লাসিক রচনার শেষ প্রতিভূকে আবিষ্কার করে থাকি তাঁদের কাছে 'মস্তক-বিনিময়' রচনাটি সাহিত্যিকের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্ম বলে গ্রহণীয় না হবারই সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য ভারতীয় জাতকের কাহিনী শ্রুতি-নির্ভর একটি ফ্রয়েডীয় (?) মনোবিকলন এই রচনায় আশ্রয় করেছে বলেই হয়তো ভারতীয় অনুবাদকের উৎসাহকে বর্ধিত করেছে। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদ বঙ্গভাষায় প্রচলিত থাকত। বিশুদ্ধ বঙ্গবাসী পাঠকের পক্ষে ভুল ধারণার সুযোগ আছে যাঁরা মানের সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না! অধিকন্তু মানের রচনামাত্রই অনুবাদ্য এরকম আত্মসন্তুষ্টিও বঙ্গসাহিত্যকে কিছুমাত্র উর্বর করবে না বলেই শঙ্কা হয়।

অনুবাদক ভূমিকায় সুপারিশ করেছেন যে, "কাহিনী মূলত ভারতীয় হলেও মান এই বইয়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের এমন সব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন যে এর মৌলিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।" আমরা সবিনয়ে এই মতের বিরোধিতা করি। যেহেতু আমাদের বিশ্বাস এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সমর্থন ও প্রচারই সাহিত্যের নিজস্ব প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। যেহেতু সাহিত্য একটি গাণিতিক ছক নয় যে তাকে কোনো একটি তত্ত্বের উপপাদ্য নির্ণয় করতে হবে। সাহিত্য জীবনের সমালো-চনা, কোনো তত্ত্বের প্রচারক নয়, এবং জীবন কোনো তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং

'মস্তক-বিনিময়'কে একটি রূপক আখ্যা দিলে সাহিত্য-বিচারের সুবিধে হয়। জীবন-রসিক মান্ মানব প্রকৃতির একটি নিগূঢ় দ্বি-সত্তা বোঝাবার জন্যে ফ্রয়েডের কেস্-ডায়েরির উপর নির্ভর করবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার একথা জানা নেই স্বয়ং মান্ এই রূপকাশ্রয়ী কাহিনীর জন্যে ফ্রয়েডের ঋণ স্বীকার করেছেন কি না! আমার তো মনে হয় দেহ ও মনের যে নিয়ত দ্বন্দ্ব রমণী প্রকৃতিকে আবহমানকাল ধরে দোলায়িত রেখেছে তারই রহস্য এই কাহিনীর উপজীব্য। এবং দেহ ও মনের কারুরই দাবী যে কোনো অংশে কম নয় সে-বক্তব্যও এখানে রক্ষিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' কী এরকম একটি নারী জীবনের আন্তপ্রকৃতির সমস্যা নয়!

এই উপাখ্যানের পাত্রপাত্রী তিনজন। পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাব বন্ধুযুগল নন্দ—শ্রীদমন এবং শ্রীদমনের দ্বিরাচারিণী (?) স্ত্রী সীতা। নন্দ দেহবাদী, শ্রীদমন মননপ্রধান। এই দুই বন্ধুর দুই প্রকৃতির সঙ্গে সীতার সন্ধির আকাঙ্ক্ষাই এই কাহিনীর মূল রস। নন্দর পেশল স্থূলতত্ত্বকে সীতা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু শ্রীদমনের মননের আকর্ষণও তার কাছে মিথ্যা নয়। অবশেষে স্বামীর দেহে নন্দর মস্তক, এবং নন্দর দেহে স্বামীর মস্তক বিনিময় করে তার সুপ্ত কামনারই সে জন্ম দিয়েছিল।

উপন্যাস শেষে এই তিন চরিত্রের সহমরণে মান্ তিন বিরোধী সত্তার সামগ্রিক মানসিক সৌন্দর্যমুহূর্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আত্মার মাথা এবং জীবনের দেহ যোগ করলেই বিরোধ মেলে না, মেলে মনে। সে-মন এই সৌন্দর্যরূপী সীতার নেই। সে ভুল করে জীবন ও আত্মাকে দুই থেকে এক করতে চেয়েছিল, আসলে তা একজনের মধ্যেই থাকে।

অনুবাদক ভাষান্তরে সাধুগদ্যের আশ্রয় করেছেন সম্ভবত আখ্যামূলক রচনাগুলির ঐতিহ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং সাধু গদ্যরীতির উপর তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু সবিনয়ে কথাটি উল্লিখিত হওয়া দরকার, তাঁর আশ্রিত গদ্যভঙ্গি যত ব্যাকরণ-অনুগত হয়েছে তত সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠেনি।

মিহির আচার্য

Book Review.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ॥ ২৬।৮এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

গত ১লা বৈশাখ, ১৩৭৪ চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সপ্তদশ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক সাহায্য করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনানুসারে বাঁকুড়া জেলার কুচিয়াখোল আর, বি, ইনস্টিটিউটের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীপীযুষকান্তি চক্রবর্তী ও কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাসকে পুস্তক দিয়ে সাহায্য করা হয়।

নজরুল পাঠাগার ॥ ৪৭।১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ নজরুল পাঠাগারে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৮তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। সেদিনকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জন-সংযোগ মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী উপস্থিত ছিলেন। সর্বশ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বিষয়োপযোগী ভাষণ দান করেন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে শ্রীসমীর ঘোষের সম্পাদনায় একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী ॥ ২ কে, সি, বোস রোড, কলি-৪।

গত ১৬ই জুন বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর ৮৬তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বাংলা যাত্রা গানের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নানা তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য ছবি প্রদর্শনীটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল মহাশয় প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সদস্য শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলনী পাঠাগার ॥ নরেন্দ্রনগর, বেলঘরিয়া, কলি-৫৬

গ্রন্থাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০শে এপ্রিল, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং পাঠাগারের বার্ষিক

বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীঅর্ণব সরকার। আমন্ত্রিত অতিথি শ্রীহাজারীলাল ভৌমিক দুই শত টাকা পাঠাগারের গৃহ নির্মাণ তহবিলে দান করেন।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার॥ ৩২এ, হরিসভা স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলি-২৩

গত ১৬ই এপ্রিল, '৬৭ মিতালী সংঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মণ্ডল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রীপঙ্কজ ঘোষ। ১৯৬৭-৬৮ সালের কার্যকরী সমিতি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়:—

সভাপতি—শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার সম্পাদক—শ্রীচণ্ডীচরণ দে, গ্রন্থাগারিক—শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয় বসু, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী নিমাই পাল, নৃপেন্দ্র আঢ্য, পঙ্কজ ঘোষ, সমর দত্ত, বিশ্বনাথ পাল, অরুণ শী, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত দে ও সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী॥ ৪সি, প্রভুরাম সরকার লেন, কলি-১৫

শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর ত্রিচত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন গত ২৯শে মে, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, সাধারণ বিভাগে সদস্য সংখ্যা **২০৬ জন** এবং শিশু বিভাগে ৭৭জন। সাধারণ বিভাগে বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ১১,৬৭৩ এবং শিশু-বিভাগে ১০৪৪। অন্যান্য বছরের মত এবছরও গ্রন্থাগারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন:—

শ্রীনরসিংহ পাল (সভাপতি), সর্বশ্রী অমূল্যচরণ সরকার, শচীন্দ্রনাথ বসু, শরৎচন্দ্র মণ্ডল ও তারাপদ দাস (সহ-সভাপতিগণ), শ্রীনিতাই চন্দ্র বসু (সাধারণ সম্পাদক), শ্রীকালীপদ দে (সম্পাদক), শ্রীবলাইলাল দে (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীমনোরঞ্জন সেন (গ্রন্থাগারিক), শ্রীমানিকলাল সেন ও শ্রীশিশিরকুমার দাস (সহ-গ্রন্থাগারিকদ্বয়) এ ছাড়া আরো ১৫জন সদস্য আছেন।

২৪ পরগণা

ঘাটেশ্বর সমাজ কল্যাণ সংসদ॥ ঘাটেশ্বর।

সুদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গমস্থান ঘাটেশ্বর সমাজ কল্যাণ সংসদ। বর্তমানে এই সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। গ্রন্থাগারে একটি শিশু-বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। শিশু-বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শিশু দিবস ও বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'গ্রামীণ গ্রন্থাগার' রূপে পরিগণিত হবার ইচ্ছা পোষণ করে। গত ১৮ই জুন, '৬৭ সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথির

আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা শাসক শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ মহাশয়।

জলপাইগুড়ি

নিউ টাউন লাইব্রেরী ॥ আলিপুরদুয়ার।

গত এপ্রিল, '৬৭ নিউ টাউন লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কার্যবিবরণী অনুযায়ী বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পুরানো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ১৫০০, সদস্য সংখ্যা ১২৫ এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ৫০। জেলা গ্রন্থাগার ও কলকাতা বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী থেকেও নিয়মিত শতাধিক বই তিনমাস অন্তর সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে 'পাঠ্যপুস্তক বিভাগ' 'গ্রামোফোন রেকর্ড বিভাগ' ও 'শিশুদের জন্য দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র' ইত্যাদি বিভাগগুলি মূল-গ্রন্থাগারের সঙ্গে চলছে। ১৯৬৭-৭০ সালের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন:—শ্রীপীযুষকান্তি মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক (সহ-সভাপতি), শ্রীবনমালি গৌতম (সহ-সভাপতি), শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সরকার (গ্রন্থাগারিক ও যুগ্ম-সম্পাদক) এবং সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ দাস, অশোক মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় বর্ধন, নারায়ণ প্রসাদ ধর, প্রশান্তকুমার সিংহ, সুনীল রায়, অমলকুমার সিংহ ও পঙ্কজকুমার রায়।

পুরুলিয়া

বুড়দা তরুণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার। বুড়দা।

গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য গত ৪ঠা মে, ৬৭, বুড়দা তরুণ সঙ্ঘ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি ছৌ নৃত্যের আয়োজন করা হয়। বিখ্যাত ছৌ নৃত্যকার শ্রীগম্ভীর নাথ সিং আগত অসংখ্য গ্রামবাসীদের তাঁর নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ করেন।

বর্ধমান

অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার। আসানসোল।

আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গত মার্চ মাসে পাঁচদিন ব্যাপী একটি বৃত্তিমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন পশ্চিম বঙ্গের তথ্য ও প্রচার বিভাগ এবং উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক শ্রী ডি, সি, গুপ্ত।

গত ৮ই মে, '৬৭ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও ১১ই মে সর্বসাধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য সেন ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধানচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকুমুদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) জাড়গ্রাম।

গত ২৫শে বৈশাখ জামালপুর থানার গ্রামীণ গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে, জামালপুর উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিক শ্রীদেবনাথ বসু ঠাকুরের সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কবির জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সবশ্রী দয়ালচন্দ্র চৌধুরী, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সিংহ রায়, মহঃ আনিছ আলি, গৌরীশংকর পাত্র, তারাশংকর ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজন গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীমতী মায়া রায়ের পরিচালনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (গ্রামীণ পাঠাগার । মানকর ।

গত ৬ই জুন '৬৭, বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস ও সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসাতকড়ি সরকার। গ্রামীণ জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী অলোকনাথ ঘোষ, বৈদ্যনাথ চলিত ও বিশ্বনাথ গোস্বামী। গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৪২২১, মোট সদস্য সংখ্যা ২৭৬ জন এবং দৈনিক গড়ে ৭০ জন পাঠক পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন। এ বছর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী, গ্রন্থাগার দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পাণ্ডবেশ্বর।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, '৭৪ পাঠাগার প্রাঙ্গণে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। আমোদপুরের শিক্ষক শ্রীকর্ণধার পাল মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বৈদ্যনাথপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীকালিপদ মণ্ডল।

বাঁকুড়া

বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী রুর‍্যাল লাইব্রেরী। গোপিকান্তপুর।

বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী পল্লী গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২৩শে মে, '৬৭ রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুলাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকমলেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সোনামুখী সর্বার্থসাধক মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ বরাট মহাশয়। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও আবৃত্তির আয়োজন করা হয় এবং "একান্নবর্তী" নাটিকাটি মঞ্চস্থ করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউনহল। সিউড়ী।

সাঁইথিয়ার শ্রীরামকুমার আঞ্চলিয়া তাঁর সহোদর পরলোকগত সুগানচাঁদ আঞ্চলিয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২২৭·০০ টাকা মূল্যের জৈন ধর্ম বিষয়ক ২৫টি বই বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

গত ২৮শে জুন, রামরঞ্জন পৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং এই মহান সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যাপক ননীগোপাল সেন।

মেদিনীপুর

তরুণ সংঘ। মধ্যহিংলী।

গত জুন মাসে তরুণ সংঘের ঐতিহ্যময় পঁচিশ বছর পূর্ণ হোল। এই উপলক্ষে গত ৬ই থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত, রজত-জয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্যে তরুণ সংঘ পাঁচদিন ব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রত্যহ প্রচারচিত্র প্রদর্শন, বিচিত্রানুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও আলোচনার আয়োজন করা হয়।

৮ই জুন মেদিনীপুর প্রধান কৃষি-উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীশিশির কুমার খাসনবিশ মহাশয়েরসভাপতিত্বে কৃষি-সম্মেলন, ৯ই জুন স্বামী সর্বানন্দজীর সভাপতিত্বে শিশুদিবস ও ১০ই জুন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার সম্মেলনে জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া

বালক সংঘ পাঠাগার। ধুনকী।

বাংলার চির তরুণ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৮তম জন্ম-জয়ন্তী বালক সংঘ পাঠাগারের উদ্যোগে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীশাহ্‌ জামাল মণ্ডল এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন উদীয়মান তরুণ কবি এস, সাজাহান আলী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক আয়ুব আলী খাঁ সাহেব। সভার শেষে ছাত্র সদস্যগণ 'অপদার্থ' নাটকটি অভিনয় করেন।

বালক সংঘ পাঠাগার এ বছর স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নেতাজী দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস যথাযথভাবে পালন করে। স্থানীয় অঞ্চল প্রধান শেখ

মইনদ্দিন আহমদ সাহেব গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিদান করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

ভারত পাঠাগার। ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

গত ২৮শে মে, '৬৭ পাঠাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ঘোষ এবং সাহিত্যিক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁদের ভাষণে রবীন্দ্র প্রতিভা ও নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হুগলী

কল্যাণী পাঠাগার। মৈনান।

কল্যাণী পাঠাগারের বাৎসরিক সভা গত ২৪শে মার্চ, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আবদুল মইজ সাহেব। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক মহম্মদ আরিফুল হক সিদ্দিকী। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। কাজী আক্তার আলম (সভাপতি), মহম্মদ আরিফুল হক সিদ্দিকী (সম্পাদক), সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন আহমদ (গ্রন্থাগারিক), এবং মোল্লা জিয়াউল হক, মহম্মদ ইয়াকুব আলী, কাজী আবু জাহেদ, আনোয়ারুল হক মল্লিক (সদস্যগণ)।

News from Libraries

'গ্রন্থাগার'-এর বর্ষসূচী ঃ

১৩৭৩ সালের বর্ষসূচী কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে জানতে চেয়ে অনেকেই পত্র দিয়েছেন। তাঁদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত বর্ষসূচী শীঘ্রই প্রেসে দেওয়া হচ্ছে এবং ২/১ মাসের মধ্যেই এই বর্ষসূচী সকলের কাছে যাবে। —সঃ গ্রঃ

ভ্রম সংশোধন ঃ 'গ্রন্থ সমালোচনা'র ১৩০ পৃষ্ঠায় একটি মারাত্মক ভুল হয়েছে। ''চুলত্ব' স্থলে ''চুলতত্ত্ব' ছাপা হয়েছে। 'এই কলকাতা এখন' পর্যায়ের রচনাটির শেষ কয় লাইনেও দাড়ি কমার গোলমাল এবং কয়েকটি ভুলও থেকে গেছে।
—সঃ গ্রঃ

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী সপ্তাহ' পালন

গত ১০ থেকে ১৬ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য দাবী ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আহ্বানে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় 'দাবী সপ্তাহ' পালিত হয়। দাবী সপ্তাহের কর্মসূচী অনুসারে উপযুক্ত বেতনের হার, ভাতা প্রভৃতির দাবীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট যাওয়া হয়। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা দাবী ব্যাজ পরিধান করেন এবং তাঁদের দাবীর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় দুটি কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি সভায়ই সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

১৫ই জুলাই স্ট্যুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিস্তারের প্রভূত অবকাশ আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীদাওয়া সম্পর্কেও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকাল ধারণা হয়েছে জোরদার মিছিল বা ঘেরাও না করলে কিছু পাওয়া যায় না, গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘেরাওয়ের আগেই তাঁরা একটা কিছু করতে চান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন—শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় সমগ্র ভারতব্যাপীই এই আর্থিক সঙ্কট চলেছে। তবু গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম ন্যায্য দাবীগুলি সম্পর্কে যাতে কিছু করা যায় এ সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীতে বসে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, এখনও বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু মূল্যবান পুস্তক রয়েছে এগুলি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন, পরে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আন্দোলন কেবলমাত্র তাঁদের বেতনবৃদ্ধির জন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত নয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতিও কামনা করেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার কথা উপেক্ষা করা যায় না। ইতিপূর্বে পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেক আবেদন-নিবেদন করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীদাওয়া সংক্ষেপে উপস্থিত করেন। 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ'—নামে পরিষদ প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্মুখে নানা সমস্যা আছে—সে সম্পর্কে আমরা সচেতন কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের যে ন্যায্য দাবীগুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়ে এসেছে, তার পূরণ হওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের অন্ততঃ বাঁচার মত বেতন দেওয়া প্রয়োজন।

দাবী সপ্তাহের শেষদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই ভারত সভা হলে আর একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এই সভারও সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। তিনি জানান, গ্রন্থাগারিকদের জন্য তাঁরা কতটা করতে পারবেন তা এখনই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। তবে গ্রন্থাগারকর্মীরা শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের যে স্মারকলিপি দিয়েছেন তার মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হবে। বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারের সুপারিশ করার অসুবিধা আছে বলে তিনি জানান। কেননা, সরকারের ওপর আর্থিক দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বেসরকারী কর্মীরাও সরকারী কর্মচারীদের মত সুযোগ-সুবিধা দাবী করছেন কিন্তু বর্তমান বাজেটের বরাদ্দে এইসব দাবীর কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-কর্মচারীর অবস্থা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এখন খুব খারাপ। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর চারদিকে যে উৎসাহের বান ডেকেছে সরকার প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারছেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় নিয়ম-কানুন অনুযায়ীই চলতে হচ্ছে। তার বাধা আসছে বাইরে থেকে—বাধা আসছে ভেতর থেকেও। কিন্তু তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কায়েমী স্বার্থের হাতিয়ার তাঁরা হবেন না। জনসাধারণই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন—জনসাধারণের সহযোগিতার ফলেই যুক্তফ্রন্ট সরকার দাঁড়িয়ে আছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার লড়বেন—লড়াইকে এগিয়ে দেবারও চেষ্টা করবেন। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ও সংগঠনকে তাঁরা আরও বাড়িয়ে দেবেন। আশা করি, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের ভুল বুঝবেন না। বিশ বছর ধরে পুঁজিবাদ যেভাবে কায়েমী হয়ে বসেছে তাতে একমাত্র দীর্ঘ আন্দোলনের দ্বারাই তাকে হঠানো যাবে।

লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ ঘোষ বলেন, সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব গ্রন্থাগার কর্মী এসেছেন তাঁরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জাতীয় সরকারের

কর্তব্য জাতীয় অগ্রগতির জন্ম জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো—কিন্তু সেই কর্তব্যে আমরা এতকাল অবহেলা করেছি। আমাদের পিতৃপুরুষের মহান দান বহন করছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার—এগুলি উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হলে আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত দৈন্তের অবস্থা দেখা দেবে। গ্রন্থাগারিকদের দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত—এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু করণীয় তা করব। দেশের ভার এখন যাঁদের ওপর তাঁদের অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাহলেও আপনাদের আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এমন কি যুক্তফ্রণ্ট সরকার আপনাদের নিজেদের সরকার হলেও, দাবী আদায়ের জন্ম আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আপনাদের এই সংগ্রাম ঐতিহ্যের সংগ্রাম।

শ্রীপ্রভাস রায়, এম, এল,এ বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারীদের মাগ্‌গী-ভাতা পদমর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তা থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা বাদ পড়ে গেছেন বোধ হয় তুটি কারণে—প্রথমতঃ যে ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন করলে সরকারের মনে থাকার কথা তা আপনাদের ছিল না বা আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে কম থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের আন্দোলন জোর-দার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি জেলায় ছড়িয়ে থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের শক্তিকে সংগঠিত করারও অসুবিধা ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্তর্গত পার্টিগুলির আপনাদের কথা মনে থাকা উচিত ছিল। আপনাদের বিষয়টি বাদ যাওয়াও উচিত হয়নি। যাই হোক, আপনারা আপনাদের স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দিয়েছেন ; তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশন শেষে আপনাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়ে একটা বৈঠকে বসলে হয়তো সমস্ত বিষয়ে সঠিক জানা যাবে। এজন্য দিন স্থির করতে হবে।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, তাঁর এলাকার (বিদ্যানগর) জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের সময় দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বই যাতে কেনা হয় এবং যেসব ছাত্র আছে তারা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় বই পেতে পারে তার প্রতি গ্রন্থাগারিকদের নজর রাখা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী বলেন, নতুন সরকারের আমলে আমরা তুবার ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছি এবং UGC বেতনক্রম চালু করতে হবে বলে দাবী করেছি। আমরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থা-গারিকের কথাও বিবেচনা করার দাবী রেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা পাইনি। সরকারের পক্ষ থেকে যতটা তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল তা হয়নি। মনে হয়, সরকারের মধ্যে এখন কিছুটা অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, তাঁদের সমিতি ১লা আগস্ট দাবী দিবস পালন এবং মিছিল করছেন। গত ২০ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলেছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে তার অবসান করতে হবে। বৃত্তিমূলক সংগঠনের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা ঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন।

গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ীই এই সভায় তিনি সরকারের সমালোচনা করছেন—সরকারকে সংশোধন করার জন্য। তিনি বলেন, সরকারের কোথায় আটকাচ্ছে তা তাঁদের জানতে হবে। টাকার প্রশ্ন যদি হয়—তবে শিক্ষা দপ্তরের অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে। যেখানে অর্থের প্রয়োজন নেই সেখানে গলদ দূর করার জন্য সবকারের দেরী হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, আমরা অপেক্ষা করতে রাজী আছি। কিন্তু কতদিন তা বলতে হবে।

মাধ্যমিক, প্রাথমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে নিয়ে একটা Consultalive Committee করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

অতঃপর তিনি গ্রন্থাগারিকদের সকল দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পত্র পাঠ করা হয়। অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি তবুও গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলির প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েছেন।

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, এই সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সেগুলি বিবেচনা করে দেখবেন। দেখা যায়, দাবী পূরণে অর্থের অভাব অনেক সময়েই থাকে, আবার আন্দোলনের চাপে অর্থাভাব আর থাকে না। গ্রন্থাগার কর্মীর উগ্র আন্দোলনে অগ্রসর হননি। গ্রন্থাগার কর্মীরা যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন তার তুলনা হয় না—তাদের ন্যায্য দাবী আশা করি পূরণ করা হবে।

এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে বক্তৃতা করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার গুহ্ দেদার। জেলায় জেলায় এইরূপ আরো কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদ এসেছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

১। এই সভা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীসপ্তাহের কর্মসূচী সার্থক করিয়া তোলার জন্য অভিনন্দন জানাইতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য জননেতা, শিক্ষাব্রতী ও জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সভা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ভাতাদি ও মর্যাদা সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি রাজ্য-সরকারের নিকট যে স্মারকপত্র পেশ করিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৩। এই সভা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খরাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দাবী করিতেছে যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের মাসের প্রথম দিবসে বেতনাদি দেওয়া হউক।

৪। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালনার জন্য এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি সমূহের সংহতি প্রয়োজন, এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবার জন্য এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতিকে অনুরোধ জানাইতেছে।

News from Libraries.

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির অষ্টম অধিবেশন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির অষ্টম অধিবেশন হয়। ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

১। একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৮ই ও ৯ই এপ্রিল ধার্য করা হবে বলে স্থির হয়। সম্মেলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থান শ্রীখণ্ডে গিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার জন্য সর্বশ্রী বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ ও চঞ্চলকুমার সেনের মধ্যে যে কোন দু'জন যাবেন বলে স্থির হয়। ২। সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়কে। ৩। সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমন্ত্রণ করা হবে বলে স্থির হয়। ৪। পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ১৫০০ টাকা খরচ অনুমোদন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তরের ভাষা বাংলা হবে বলে স্থির হয়। ৫। লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডনের ১৯৬৬-র সদস্য চাঁদা পরিশোধ করা হবে এবং ১৯৬৭ সাল থেকে পরিষদ আর উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থাকবে না বলে স্থির হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশন

১১ই মার্চ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির নবম অধিবেশন হয়। ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। গত সভার কার্য-বিবরণী অনুমোদিত হয়।

গৃহনির্মাণ উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সমিতির কার্যাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, গৃহনির্মাণের জন্য সংবাদপত্রে টেণ্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। টেণ্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ অবধি বর্ধিত করা হয়েছে। টেণ্ডার ১লা এপ্রিল যথারীতি সর্বসমক্ষে খোলা হবে।

প্রকাশন উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সদস্যদের অবগতির জন্য জানান যে, গ্রন্থাগার পত্রিকার মুদ্রণ ব্যয় বিগত বৎসরে দু'হাজার টাকা অতিক্রম করেছে। তজ্জন্য বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির দ্বারা ব্যয় সংকুলানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চলতি বছরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য স্বর্গতঃ তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নামে যে পদক দানের সিদ্ধান্ত হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্য ওহ্‌দেদার ও 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদককে নিয়ে একটি অস্থায়ী উপসমিতি গঠিত হয়।

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপসমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত শিক্ষণের খসড়া সিলেবাস

অনুমোদিত হয়। একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তারিখ ৮ই ও ৯ই এপ্রিলের পরিবর্তে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ধার্য করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনের জন্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের নাম প্রস্তাবিত হয়। সভাপতিত্বের জন্য যথাক্রমে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রবি দাশগুপ্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করা হবে বলে স্থির হয়।

পরিষদের অর্থ উপসমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদের বেতনভুক কর্মীদের বেতন, কার্যনির্বাহক সমিতির ৬ই নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখের সভায় মঞ্জুরীকৃত পাঁচ টাকা বৃদ্ধি সহ দশ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। এই সিদ্ধান্ত জানুয়ারী ১৯৬৭ থেকে কার্যকরী হবে। চলতি বছরে পরিষদের সদস্যপদের আবেদনকারীদের সকলকেই সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউ জি সি'র ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সহিত আলোচনা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ইউ,জি, সি-র চেয়ারম্যান শ্রী ডি, এস, কোঠারীর নিকট কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিব, এসসি কোর্সের প্রবর্তন এবং বাংলা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে ইউ, জি, সি অনুমোদিত বেতনক্রম চালু করার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের ভিত্তিতে পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে শ্রীকোঠারী ইউ, জি, সির এডুকেশন অফিসার শ্রী এস, কে, দাশগুপ্তের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রীদাশগুপ্ত ৩০শে জুন বিকাল ৫টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন—এম, লিব, এসসি কোর্স কলিকায় প্রবর্তনের পূর্ণ সমর্থন ইউ, জি, সি'র আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি রাজি থাকেন তাহলে এবছর থেকেই ঐ কোর্স চালু করা সম্ভব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ, জি, সি বেতনক্রমের আওতায় আসার বিষয়ে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন: এখনো যে এখানে এই বেতনক্রম চালু হয়নি এটাই আশ্চর্যের বিষয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করার জন্য ইউ, জি, সি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করার জন্য অনুরোধ জানাবার প্রতিশ্রুতিও শ্রী দাশগুপ্ত পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট জানান।

পরিশেষে পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার গুলির বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ইউ, জি, সি'র নিকট পেশ করার প্রতিশ্রুতিও শ্রী দাশগুপ্ত জানান।

Association Notes.



১৬ই জুলাই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতারত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত

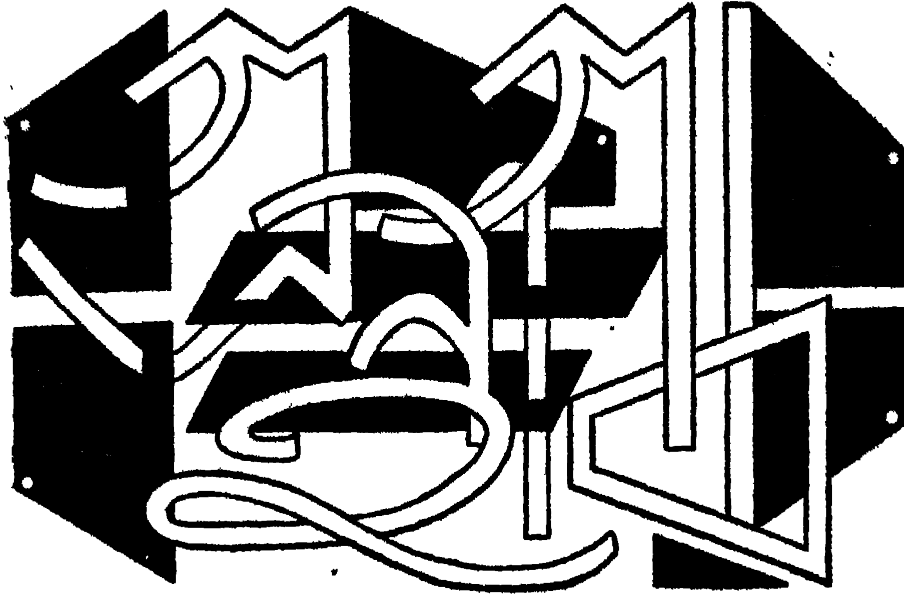


১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে) শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত



রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মিলিত মৌন মিছিল : ১লা আগস্ট, ১৯৬৭।
ফটো : দি স্টেটস্‌ম্যান



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৭৪

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪.) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫্ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০্ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০্ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫্ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০্ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫্ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০্ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬্ টাকা

দাতা (আজীবন)	১৫০্ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫্ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪্ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫্ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫ } { ১৩৭৪, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ॥

প্রসঙ্গটি যদিও পুরানো কিন্তু নানাভাবে নানা আকারে সেই একই প্রসঙ্গ একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত বারবারই আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন। এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বপক্ষে অনেক কথাও বলেছেন। কিন্তু যাঁদের টনক না নড়লে কোন কাজই হবেনা সেই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের এ সম্পর্কে মনোভাব কি তার ওপরই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে এ নিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীরা আন্দোলন করেছেন। সরকার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘকাল যাবত নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করছিলেন এবং বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি, মহার্ঘ্য ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, মেডিক্যাল রিলিফ প্রভৃতি সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ১৯৬৪ সালে এই সকল গ্রন্থাগারিক দের জন্য একটি বেতনক্রম প্রবর্তন করেন। বেতনক্রমটি গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট খুবই হতাশাজনক বলে মনে হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে স্বভাবতঃই আশা করা গিয়েছিল যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগের বোধ হয় এবারে প্রতিকার হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বদল হয়েছে বটে কিন্তু যে আমলাতন্ত্র শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন নতুন সরকারের আমলেও তাঁদের চক্ষে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় নি। হয়নি যে তার প্রমাণ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষিত বেতনক্রম। এই বেতনক্রমে অবশ্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এবং জেলা গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিকগণ কিছুটা বর্ধিত বেতনের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বলা যায় না যে গ্রন্থাগারিক কর্মীরা সুবিচার পেয়েছেন।

অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্ণধারগণের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সুবিচারের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই স্মারকলিপির ভিত্তিতে কিছুই রচিত হয়নি। হয়তো টাকা-পয়সা খরচ করে তাঁরা যে স্মারকলিপিটি ছাপিয়ে মন্ত্রীদের হাতে দিয়েছিলেন সে টাকাটাই জলে গেছে। কেননা, একটু ভাল করে দেখলেই দেখা যাবে, ঐ বেতনক্রম রচিত হওয়ার সময় গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। পূর্বে স্নাতকোত্তর জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ছিল ২১০—৪৫০ টাকা; কিন্তু সেই স্কেলটি উঠে গিয়ে এখন শুধু গ্রাজুয়েট ডিপ-লিবের স্কেল ১৬৭—২৯৫ টাকা নবনিযুক্তদের জন্য চালু হবে। আবার জেলা গ্রন্থাগারিক, জেলা সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং মহকুমা গ্রন্থাগারিকের বেলায় একই বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে। কালিম্পং বাণীপুর ও টাকী প্রভৃতি কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগারিকের ২৫০—৫৫০ টাকা বেতনক্রমও রয়েছে। সুতরাং আবার অসন্তোষ; আবার আন্দোলন।

দেখা যাচ্ছে, ঘুরে-ফিরে আমরা আবার সেই একই জায়গায় এসে পড়েছি। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই গোলকধাধায় ঘোরার দিন কবে শেষ হবে কে জানে। গ্রন্থাগার পরিষদ এটা কখনই চান না যে, তাঁরা অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম বাদ দিয়ে বার বার মিছিল এবং আন্দোলন পরিচালনা করেন। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এসব না করলেও কর্তব্যের ত্রুটি হয়।

রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যেই আজ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে—তাঁদের আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য সরকার কী করছেন তাই এখন প্রধান প্রশ্ন। তাছাড়া রয়েছে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রশ্ন। দিল্লীর মত কলকাতাতেও কেন পাবলিক লাইব্রেরী হবে না—পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই বা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এ সকল প্রশ্নই গ্রন্থাগার পরিষদের সামনে রয়েছে। আইন প্রবর্তন সম্পর্কে বিধান মণ্ডলীর সদস্যদের অবহিত করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের তথা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার জগতের যাঁরা প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাঁদের কি কিছুই করণীয় নেই? গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে তাঁরা কেন এগিয়ে আসছেন না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ইউ জি সি স্কেল প্রবর্তনের জন্য তাঁরা কেন চাপ সৃষ্টি করছেন না? এমন কি, সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যাপারে ইউ পি এস সি-র নির্বাচক মণ্ডলীতে যে কোন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ রাখা হল না এ ব্যাপারেও কোথাও কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হল না। সমগ্র বৃত্তির মর্যাদা এভাবে কি ধুলুণ্ঠিত হল না? ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের জাতীয় পরিষদ 'ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার সংঘ এ ব্যাপারে নীরব কেন?

Editorial : On Pay & Status of the library workers

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন ঃ প্রথম সূত্র

দিলা মুখোপাধ্যায়

আমি ইতঃপূর্বে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে অভাব; অর্থাৎ যাকে ইংরাজী ভাষায় বলে 'Principle of scarcity'. ঐ প্রবন্ধে আমি বলেছি, মানুষের শেখবার ক্ষমতার সঙ্গে যদি মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয়ের একটা সাম্যতা থাকত তা হলে শিক্ষা দেবার যেমন কোন প্রয়োজন থাকত না তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠত না। বই হয়তো লেখা হতো; কারণ, বই হলো মন্দিরের মত মানবের কৃষ্টিকে ধরে রাখবার একটা পন্থা। গ্রন্থাগারে বই সঞ্চয় করেও রাখা হতো, কিন্তু গ্রন্থাগার হয়ে থাকত—মানব সভ্যতার প্রতীক মাত্র। তা কখনই আধুনিক রূপ নিত না। গ্রন্থাগারের আধুনিক সংজ্ঞাও সম্ভব হতো না। কেবল তাই নয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলে কোন বিজ্ঞানেরও সৃষ্টি হতো না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-গুলির সৃষ্টি হলো কেবল-মাত্র পাঠক যাতে তার প্রয়োজন মত জ্ঞানের সন্ধান সহজে পেতে পারে এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। তাহলে একথা হয়তো বললে অন্যায় হবে না যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শনের প্রথম সূত্র হচ্ছে: **গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে পাঠকের ভিত্তিতে।**

গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার প্রথম সূত্র যদি হয় **"পাঠকের ভিত্তিতে"**, তাহলে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহটা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রথম আমাদের জানতে হবে গ্রন্থাগারের যারা পাঠক হবে তাদের শেখবার ক্ষমতা বা জানবার ক্ষমতা কতটুকু। সকলেই যদি মেধাবী হতো, সকলের শেখবার বা বোঝবার ক্ষমতা সমান হতো, তাহলে গ্রন্থাগারের কাজ অনেক সোজা হয়ে যেতো এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন হতো না। তা হলে আমরা দেখছি যে মানুষের শেখবার ক্ষমতা যত কম তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন তত বেশী এবং যে মানুষের শেখবার ক্ষমতা যত বেশী তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন তত কম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া তো নয়ই উপরন্তু জ্ঞান বিতরণ করাও নয়। গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে বই সরবরাহ করা। অর্থাৎ আরও সোজা কথায় বললে বলতে হয়, প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে গ্রন্থাগার হলো একটা সংযোগস্থল। আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ঐ হলো একমাত্র কাজ। তা হলে ঠিকমত একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে গেলে প্রথম চিন্তা করতে হবে কারা গ্রন্থাগারের পাঠক হবে; কি ধরনের বই গ্রন্থাগারে রাখা হবে তা নয়। এমন এক সময় ছিল যখন গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করা হতো সংগৃহীত পুস্তকের ভিত্তিতে। যে গ্রন্থাগারে যত বেশী দুষ্প্রাপ্য বই থাকত, সেই গ্রন্থাগারের মূল্য তত বেশী দেওয়া হ'তো। কিন্তু মানুষের শেখবার ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয় যত বেশী সক্ষম হতে থাকল, পুস্তক

অপেক্ষা পুস্তকের ব্যবহারের মূল্য বাড়তে থাকল অর্থাৎ গ্রন্থাগার ততই Economic Institution-এর রূপ নিতে থাকল। সমাজের শুরু হয় ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু Technology-র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক ; ফলে সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে থাকবার জন্যে গ্রন্থাগারকেও তার রূপ পরিবর্তন করতে হলো।

আমি উপরে বলেছি, পাঠকের শেখবার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে এবং যে মানুষের শেখবার ক্ষমতা যত বেশী তাকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন তত কম। সুতরাং গ্রন্থাগার গড়ে তোলার শুরু করতে হবে যে পাঠকের শেখবার ক্ষমতা সবচেয়ে কম তাকে অবলম্বন করে। এখন আমাদের লক্ষ্যটা যে কী তা ঠিকমত বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এ কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক যাতে তার প্রয়োজনীয় বই সহজে খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করা। তা হলে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন Technique-ই সাধারণ হতে পারে না। এক দেশের Technique আর এক দেশে চলতে পারে না। কোন উন্নত দেশের Technique কোন অনুন্নত দেশে চলতে পারেনা। কারণ Technique-টা যে দেশের, গ্রন্থাগার সেই দেশের জনসাধারণের শেখবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে।

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য :

গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে মানুষের শেখবার ক্ষমতার অভাব এ কথা আমি উপরে বলেছি এবং গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ বই বিলি করা—এ বিষয়টিও আমি প্রমাণ করেছি। কিন্তু কেন ? এই 'কেন'র উত্তর দিতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের এ কাজের উদ্দেশ্য কি।

আগেকার যুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হতো সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে এমন করে গড়ে তোলা যাতে সমাজের মধ্যে মানুষের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে না যায় অর্থাৎ প্রত্যেকে যাতে বেঁচে থাকবার জন্যে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। আধুনিক যুগের উচ্চশিক্ষা হচ্ছে ব্যবসায়গত ও গবেষণার প্রয়োজনে। এই দুই ধরনের শিক্ষার ভার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পা বাড়াবেনা একথা আমরা ধরে নিতে পারি ; অবশ্য বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারের কথা আলাদা। আমরা এ প্রবন্ধে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পিছনে যে দর্শন রয়েছে সেইটুকুই প্রকাশ করবার প্রয়াস করছি।

মানুষ ধারণা তথা আদর্শ না নিয়ে বাঁচতে পারে না। ধারণা ভুল হতে পারে, ধারণা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাঁচতে হলে, মানুষের মত বাঁচতে হলে, আদর্শের উপর বিশ্বাস থাকা চাই। গরুর গাড়ীর চাকা যেমন গরুর পদক্ষেপকে অনুসরণ করে তেমনি আমাদের

কাজ আমাদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে। সুতরাং একথা বললে হয়ত ভুল হবে না যে, আমরাই আমাদের চিন্তাধারা অর্থাৎ we are our ideas. মানুষ এক একটা যুগের প্রতীক। সুতরাং এক যুগের মানুষের সঙ্গে আর এক যুগের মানুষের তুলনা হয় না। আবার এক যুগের কৃষ্টির ভিত্তিতে আর একটা যুগ গড়ে নাও উঠতে পারে। মিশরের পিরামিডের যুগটা হ'লো ক্লাসিকাল যুগ, কিন্তু তার আগের যুগের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, পিরামিডের নিজের যে সভ্যতা রয়েছে তা হচ্ছে Neolithic সভ্যতা! সুতরাং একটা যুগের ধ্যান-ধারণা নিয়ে আর একটা যুগকে যে বাঁচতে হবে সে ধারণা ঠিক নয়। মানুষকে তৈরী হতে হবে যুগ অনুযায়ী। উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি দেশের জনসাধারণের শেখবার ক্ষমতার ভিত্তিতে শিক্ষা দিয়ে তাদের এক একটা বিষয়ে পারদর্শী করে তুলল, কারণ আমাদের তা প্রয়োজন। মানুষ হিসাবে ব্যক্তির যা প্রয়োজন, যুগের চিন্তাধারার সহিত সমতা, সে সম্বন্ধে যে শিক্ষা শিক্ষায়তনগুলি দেয় সেগুলি ব্যক্তিগত শিক্ষার বাড়তি অংশ (residue) ছাড়া আর কিছু নয়। সেই বাড়তি অংশটুকু নিয়ে ব্যক্তির পক্ষে যুগ অনুযায়ী হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক বিলি করার উদ্দেশ্যের শুরু এখান থেকে অর্থাৎ শিক্ষার কাজ যেখানে শেষ হচ্ছে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ সেইখান থেকে শুরু হচ্ছে। সুতরাং গ্রন্থাগারের পুস্তক বিলি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার শিক্ষার ক্ষমতা অনুযায়ী বই বিলি করে যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সমতায় নিয়ে আসা। ইংরাজী ভাষায় বিষয়টিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়: 'The only social function of the public libraries is to help the readers to help themselves to be at the level of the ideas of their time, by supplying books suitable to the capacity of learning of each individual'.

সুতরাং আমাদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক সংকলনে দর্শনের প্রথম সূত্র হবে "পাঠক অনুযায়ী বই" অর্থাৎ 'every reader his book'. এই সূত্রের যে ভিত্তি সেটা যে principle of scarcity সেটা হয়তো আর নতুন করে বলতে হবে না। "পাঠক অনুযায়ী বই" কথাটা বলতে যত সোজা কার্যত কথাটা তত সোজা নয়। কারণ প্রত্যেক পাঠকের একটা জাতীয় চরিত্র আছে। সুতরাং পাঠককে যে প্রতিষ্ঠান পড়বার সুযোগ দেবে এবং ছাত্রকে যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার সুযোগ দেবে সে সব প্রতিষ্ঠানের চরিত্র pedagogical হলে চলবে না। আমাদের দেশের শিক্ষায়তনগুলি এবং গ্রন্থাগারগুলির যে চরিত্র তা কি জাতীয় চরিত্র? মোটেই নয়। প্রথম কথা সেগুলি গড়ে উঠেছে বিদেশী চরিত্রে, দ্বিতীয়ত সেখানে শিক্ষার কায়দা-কানুনটাই বড়, জাতীয়তা দ্বিতীয় স্তরের। ফলে আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে স্কুল পর্যন্ত পাঠ্যতালিকাটাই বেশ imposing; কিন্তু ছাত্রের নমুনা যা বার হয় তা করুণার বস্তু। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঐ এক কথা। নাম করা ভালো বই গ্রন্থাগারে পয়সা খরচ করে কিনে বোঝাই করা হয় তাও আবার সে সব বইয়ের হয়তো সত্তর ভাগ বিদেশী বই; ফলে স্কুল-কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অনুযায়ী যেমন শিক্ষা দেওয়া হয় না তেমনি গ্রন্থাগারে পাঠক অনুযায়ী বই রাখা হয় না। বইয়ের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়, পাঠকের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয় না—ফলে উভয় ক্ষেত্রেই "ছেলের চে' ছেলের গু ভারী" হয়ে যায়।

তা হলে আমাদের শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগারগুলিকে যথাযথ চরিত্র দিয়ে যে গড়ে তোলা দরকার এটা অস্বীকার করা চলে না। আমরা গ্রন্থাগারিক, আমাদের কাজ গ্রন্থাগারকে নিয়ে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে?

গ্রন্থাগারকে যথাযথ রূপ দিতে গেলে প্রথম প্রয়োজন হবে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত করা। কিন্তু সে কাজ করবে কারা? রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা নিশ্চয় নয়। কারণ আমাদের রাষ্ট্রের যে পুনর্গঠনের প্রয়োজন তা কেউই অস্বীকার করবেন না। যারা খেলা ভালোবাসেন তারা একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। কোন খেলোয়াড় ভালো খেললে তারা বলেন "...is in form" অর্থাৎ তারা বলতে চান খেলোয়াড়ের খেলার technique-এর মধ্যে কোন ভুল নেই। যে কাজটুকু সে খেলার মাঠে করছে সেটুকুর মধ্যে কোন দোষ নেই, সে কাজের মধ্যে "কোন রকমের" প্রশ্ন নেই, "একটু কম বেশীর" প্রশ্ন নেই। সুতরাং কোন পুনর্গঠনের (re-form) কাজ করতে গেলে এমন একটি দল গড়ে ওঠা প্রয়োজন যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই in form হবে। সে জন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। "বাংলা দেশে সে ধরনের একটা দল গড়ে উঠেছে এবং তার মূলে রয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।" তারা গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে—কিন্তু যে শিক্ষা তারা দিচ্ছে সে শিক্ষার মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্র রয়েছে বলে মনে হয় না। অন্য দেশের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে যে training রয়েছে তারা সেই training এর অনুকরণ করছে, কিন্তু সে training যে আমাদের দেশে কাজের নয় তা আমি আগেই বলেছি, "তারা অপরকে অনুকরণ করছে; কিন্তু এই অনুকরণ বিপদজনক।" একটা দেশ নিজের সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করে যে নিয়ম-কানুন খাড়া করেছে, সে নিয়ম-কানুন আর এক দেশের একই সমস্যা সমাধান করবার জন্য যে কার্যকরী হবে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। "অনুকরণ করার ফলে যে গঠনমূলক অভিজ্ঞতা আমাদের গড়ে ওঠা দরকার সে অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে না কেবল তাই নয়, যে নিয়মকানুনগুলি আমরা অনুকরণ করছি, সেগুলির দোষ-গুণও আমাদের চোখে পড়েনা।" সুতরাং এরূপ একটি দলের প্রয়োজন হবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের কাজ করা। আমেরিকান Library system বা training ভালো হতে পারে। British Library system-ও ভালো হতে পারে কিন্তু সে Library System বা training-কে আমাদের অন্য দেশে চালান সম্ভব নয়; কারণ "তাদের training, তাদের System হলো একটা বিরাট সত্তার

অংশমাত্র।" এ সত্তা হ'লো তাদের জাতীয় সত্তা। তাদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব অনুযায়ী তাদের training ও Library System গড়ে উঠেছে। আমরা যা তাই হওয়া দরকার, আমরা যা নই তা হবার চেষ্টা করা মূঢ়তা। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার মূলে রয়েছে এই মূঢ়তা। 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' সম্ভব মত মাঝে মাঝে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে এর ফল ভোগ করে। সুতরাং তারা হয়তো এ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন। অন্য শিক্ষা সংস্থার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সে অভিজ্ঞতাটুকুও নেই ; ফলে সে সব সংস্থা থেকে যে সব ছাত্র বার হয় তারা not in form। তাদের কাজের মধ্যে "একটু কম আর একটু বেশী"র প্রশ্ন ওঠে, তাদের কাজের মধ্যে দেখা যায় "এ একই কথা" যেমন করে হ'ক চললেই হলো"। "আমাদের যা খুশী তা করায় বিশেষ দোষ আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু আমরা যা নই তা হবার চেষ্টা করা বিশেষ দোষের।"

সুতরাং গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের Leonardo da vinci (ভিনচি)র কথা মনে রেখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন Chi ne puo quel que vuol, quel que puo voglia (ভোলিয়া) অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা যখন কেউ করতে পারে না, তার উচিত যা সে করতে পারে সেইটাই ইচ্ছা করা। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পুনর্গঠনের চিন্তাধারার মধ্যে একটা মৌলিকতা (authenticity) থাকা চাই।

এখন দেখা যাক্ এতদূর আমি কি বললাম :

১। গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার ভিত্তিতে।

২। পাঠকের শিক্ষা করবার ক্ষমতা যত বেশী, গ্রন্থাগারের কাজ হবে তত কম। পাঠকের শিক্ষা করবার ক্ষমতা যত কম, গ্রন্থাগারের কাজ তত বেশী।

৩। গ্রন্থাগার Technique-এর উপর গড়ে উঠবে না। গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিতে।

৪। গ্রন্থাগার সংগঠনের ক্ষেত্রে এমন একটি দল গড়ে ওঠা দরকার যে দলের প্রত্যেকে হবে in form.

৫। সে জন্যে প্রয়োজন Training, যে Training-এর মধ্যে কোনরূপ ফাঁকির প্রশ্রয় থাকবে না।

৬। এক দেশের গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা সে দেশের জাতীয় সত্তার অংশ, তা আর এক দেশে চালান সম্ভব নয়।

৭। গ্রন্থাগারের কাজ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে করতে হবে। আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমস্যা—সে সমস্যা অন্য দেশের সমস্যার সমাধানের দ্বারা সমাধা করা সম্ভব নয়।

উপরে যে সূত্রগুলির বর্ণনা দিলাম সে সূত্রগুলির প্রত্যেকটি হ'লো পরস্পরের

সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকটি সূত্র হলো মূল সূত্র "Principle of Scarcity" অর্থাৎ "মানুষের শিক্ষা করবার ক্ষমতার অভাবের" অনুসিদ্ধান্ত। সুতরাং গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন একটি সূত্রের অভাব হলে re-form-টা আর in form হবে না।

আমি আমার পরের প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্রের বর্ণনা করবো। দ্বিতীয় সূত্র হবে "পাঠকের কি পড়া উচিত সেদিকে গ্রন্থাগারের লক্ষ্য থাকবে না; গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হবে পাঠক কি পড়তে পারে সেদিকে।"

The First Principle of the Philosophy of Librarianship—by Dila Mukherji

পারে
system
পারে কি
সম্ভব নয়;

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত (৩)

পঙ্কজকুমার দত্ত

কাগজ তৈরী :

প্রথমে একজন শ্রমিক কুণ্ডি থেকে উপযুক্ত পরিমাণ কাথ তুলে নিয়ে পরিষ্কার জলে ভরা হাউজের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বাঁশের লাঠি (নাম 'ছেলনী') দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়তে থাকে। এই ধরনের ভীষণ আলোড়নের ফলে ছোটখাট সব ঢেলা ভেঙ্গে যায় এবং তন্তুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর একটি গোটা রাত হাউজ থিতাতে দেওয়া হয়। কাথ মেশানর পর হাউজের জল যাতে খুব বেশী ঘন না হয় সেদিকে অবশ্যই নজর থাকে। পরের দিন সকাল বেলায় কাগজী কাজে লাগে। হাউজের যে দেওয়ালটি থাকে খাড়া, তারই পাড়ে বসে তারা কাজ করে। কাগজীর হাতে থাকে দুটি বাঁশের লাঠি—এ দুটি সে হাউজের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখে ; একটি প্রস্থ-বরাবর আর একটি দৈর্ঘ্য-বরাবর। কাগজী কাজ শুরু করার পূর্বে খানসীর একটি প্রান্ত এই লাঠির উপর রাখে এবং অপর প্রান্ত কাগজীর কোলের কাছে হাউজের উঁচু কিনারায় ভর করে থাকে। এরপর সে মীরটি খানসীর উপর এমন ভাবে বিছিয়ে দেয় যেন মীরের ঘাস/কাঠি খানসীর দণ্ডগুলিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে (তবে কখন কখন অন্যভাবেও মীর বিছান হত—সেক্ষেত্রে ঘাস/কাঠি খানসীর দণ্ডগুলির সঙ্গে সমান্তরাল থাকত)। এরপর কাগজী হিচকা দুটি মীরের উপর রেখে খানসীর যে প্রান্তটি বাঁশের লাঠির উপর ছিল সেই প্রান্তটি একটু তুলে ধরে লাঠিটি সরিয়ে নেয় যাতে খানসী হাউজে ডুবাতে-উঠাতে অসুবিধা না ঘটে। কাগজীদের খানসী ধরার একটু কায়দা আছে—কাগজী বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে হিচকাকে মীরের সঙ্গে চেপে ধরে আর বাকী তিনটি আঙুল থাকে খানসীর একেবারে নীচে। এবার সে মীর সহ খানসী হাউজে খাড়াভাবে ডুবিয়ে দেয়। ডুবান'র মিনিট খানেক আগে হাউজের জল লাঠি দিয়ে ঘেঁটে দেয় যাতে কিছু তন্তুজ বস্তু উপরের দিকে উঠে আসে। বাস্তবিক পক্ষে হিচকা মীরে বসাবার আগে হিচকা দিয়েই অনেক কাগজী একাজ সেরে নেয়। হিচকা মীরে বসান এবং অন্যান্য করণীয় কাজে অত্যন্ত অল্প সময় লাগায় কাজের কোন অসুবিধা হয় না। জলে ডুবান'র পর মুহূর্তেই কাগজী খানসীটিকে হাউজের মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল করে ফেলে, সেজন্য কিছু তন্তুজ বস্তু মীরের উপর আটকা পড়ে। এবার সে খানসীটিকে জলমধ্যস্থ সর্বোপরিতলে নিয়ে আসে (খানসী জল ও বায়ুর বিভেদতলকে স্পর্শ করে জলের মধ্যে ডুবে থাকে) এবং খানসী এদিকে-ওদিকে নেড়েচেড়ে মীরের উপরিস্থিত তন্তুজ বস্তুকে মীরের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে আস্তরণটি কোথাও মোটা কোথাও পাতলা না হয়। মীরের উপর তন্তুজ বস্তুর পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে থাকলে বাড়তি বস্তু খানসীর যে প্রান্ত দিয়ে উহা তোলা হয়েছিল তার

বিপরীত প্রান্ত দিয়ে হাউজে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার থানসীটি পুরাপুরিভাবে জলের বাইরে আনা হয়—ফলে জল আস্তে আস্তে ঝরতে থাকে। কাগজী প্রয়োজনমত এখনও এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে এবং মাঝে মাঝে মাঝে হিচকার উপর টোকা মারে। এরই ফলে তন্তুগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং তারই জন্য কাগজ খুবই শক্ত হয়। কাগজী এবার থানসীটি ক্ষণিকের জন্য হাউজের জলের সঙ্গে এমনভাবে স্পর্শ ঘটায় যে মীরের উপরিস্থ সন্তস্থ আস্তরণটি একটু ভেসে ওঠে। এরপর থানসী উঁচুতে তুলে ধরে অপসৃত বাঁশের লাঠিটি যথাস্থানে রেখে আগের মতই লাঠি ও হাউজের কিনারার উপরই থানসীর সমস্ত ভার ন্যস্ত করে। এরপর হিচকা দুটি মীর থেকে তুলে নিয়ে কাগজী ঝুঁকে পড়ে দূরপ্রান্তের 'ঘোরাডে' দণ্ডটি ধরে মীরটি সিকি ইঞ্চিটাক গুটিয়ে আনে; ফলে নরম আস্তরণ বা কাঁচা কাগজটির উপর একটি ভাঁজ পড়ে—একেই বলে 'ঝম' দেওয়া। এবার কাগজী মীরটি থানসী থেকে তুলে নেয় (ডান হাতে ধরে কাছের প্রান্তটি এবং বাম হাতে ধরে 'ঝম' প্রান্তটি) ও একখণ্ড কাষ্ঠফলকের উপর রাখা কাপড় বা পুরাতন মীরের উপর উবুর করে ফেলে হাত দিয়ে অল্প চাপ দিয়ে কিছু জল বের করে দেয় এবং তারপরই মীরের 'ঝম' প্রান্তটি ধরে একটানে মীরটি কাঁচা কাগজ থেকে তুলে নেয়। 'ঝম' জনিত ভাঁজটি থাকার জন্য মীরটি তুলতে সুবিধা হয়। এইভাবেই কাগজী কাজ করে এবং কাঁচা কাগজগুলি পর পর রেখে যেতে থাকে, এগুলির মধ্যে কিন্তু কোনও কাপড় বা মীর থাকে না। বেশ কিছু কাঁচা কাগজ (সাধারণত ১২০টি বা ২৪০টি) জমা হবার পর পুনরায় একখণ্ড কাপড় ও আর একটি কাষ্ঠফলক চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া হয় যাতে জল বেরিয়ে যায়। অনেক সময় কাষ্ঠফলকের উপর ভারী কিছু ওজন রেখে একটি রাত অপেক্ষা করা হয় জল ঝরার জন্য। তারপর প্রতিটি পাতা সাবধানে পৃথক করে এবং মসৃণ দেওয়ালের গায়ে আটকে শুকিয়ে নেওয়া হত। শুষ্ক পাতাগুলি এবার হালকাভাবে ঝামা দিয়ে ঘষে আলগাভাবে লেগে থাকা ফেঁসো, ঘাসকুটা ইত্যাদি তুলে ফেলা হত।

এবার আসছে মাড় বা কলপ (size) লাগানর ব্যাপার। ভারতে কাগজে মাড় দেবার জন্য প্রধানতঃ চাল অথবা গম ব্যবহৃত হত। গমের থেকে মাড় তৈরীর জন্য গমকে প্রথম দু-তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর ভিজে গম থেকে সাদা দুধের মত তরল পদার্থ নিষ্কাশন করা হত। ঐ সাদা তরলটি ফুটালেই আঠাল মাড় পাওয়া যেত। মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ তুঁতে ও ফটকিরি কীটঘ্ন হিসাবে মেশান হত। মাড় সাধারণতঃ এক টুকরা কাপড় দিয়ে ন্যাতা দেওয়ার মতন কাগজে লাগিয়ে দেওয়া হত এবং রোদে অথবা ছায়ায় মেলে শুকিয়ে নেওয়া হত। শুকিয়ে গেলে এগুলি 'মাজা' বা পালিশ করা হত। একাজটি বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ। একটি বক্রতল কাঠের উপর কাগজটি রেখে মসৃণ পাথর (agate-flint) বা হাতির দাঁতের টুকরা, কিংবা বড় কড়ি বা শাঁখ দিয়ে ঘষে ঘষে পাতাটির দুটি পৃষ্ঠাই মসৃণ করা হত। মাড় লাগিয়ে রোদে শুকালে

কাগজটি বড় বড় বেশী খড়খড়ে হয়ে প'ড়ে এজন্য এটি অল্প জল ছিটিয়ে বা ভিজে কাপড় ঘষে ঈষৎ আর্দ্র করা প্রয়োজন হত। ছায়ায় শুকালে অবশ্য এমনটি করার প্রয়োজন পড়ত না। পালিশ করার পাথরটিকে কাগজীরা বলে 'ঘোটা'। পালিশ করার সময় কোন কোন অঞ্চলে ঘোটার গায়ে মাঝে মাঝে একটু তেল লাগিয়ে নেওয়া হত। পালিশের পর চারধার ছেঁটে কাগজকে ইচ্ছামত মাপ দেওয়া হত। ভারতীয় কাগজীদের মধ্যে নানারকমের মাপ চালু ছিল। 'দহ মুষ্ঠি' বা 'দশ মুষ্ঠি' প্রস্থ বিশিষ্ট কাগজের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'শায়েস্তাখানি' এবং 'বাহাদুরখানি' কাগজের মাপ হচ্ছে যথাক্রমে ২৮"×২১" এবং ৩৮"×২১"। এ ছাড়া আরও নানা মাপের কাগজ পাওয়া যেত।

শিয়ালকোটে কাগজ তৈরী :

কাগজ তৈরীর কেন্দ্র হিসাবে 'শিয়ালকোট' মুঘলযুগেই বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের সময় শিয়ালকোটে তৈরী 'মানসিংহী' ও রেশমী কাগজ বেশ খ্যাতিলাভ করে। এ কাগজ দেশের বিভিন্ন অংশে চালান যেত। রাজদরবারেও এ কাগজ ব্যবহৃত হত। (Topography of Mughal Empire—J. Sircar, Page 95) শিয়ালকোটে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলার আছে। অবশ্য কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যা বলা হয়েছে এখানে মোটামুটি সেই পদ্ধতিতেই কাগজ তৈরী হত।

পুরাতন শনের দড়িদড়া ইত্যাদি টোকিয়া দিয়ে কেটে জলে ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কোটা হত। কোটার পর যে বস্তুটি পাওয়া যেত কাগজীদের দেওয়া তার নাম 'জাব'। মন-খানেক দড়িদড়া থেকে যে জাব পাওয়া যেত তার সঙ্গে ত্রিশ সের সাজি আর চার সের চুন মিশিয়ে আবার ঢেঁকিতে কোটার পর জলে ধুয়ে বড় বড় ঘুঁটের ধরনে চেপ্টা মতন গোলাকার 'চাকলি' করা হত। শুকনা চাকলিগুলি আবার জলে ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে ভাল করে ধুয়ে নিলেই একেবারে কাদা-কাদা হয়ে যেত এবং তখন তার সঙ্গে পুরাতন কাগজের থেকে তৈরী মণ্ড মেশান হত। তারপর পুনরায় ঢেঁকিতে কুটে জলে ধুয়ে নিলেই কাগজ তৈরীর উপযোগী মণ্ড পাওয়া যেত এবং পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতেই কাগজ প্রস্তুত হত। শিয়ালকোটের কাগজ-কারিগরদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গন্ধক দহন-জাত গন্ধকায় বাষ্প (Sulphur dioxide) সাহায্যে কাগজ বিরঞ্জিত করায়। এজন্য তারা ফুট তিনেক উঁচু ছোট্ট একটা ঘরের মতন করত, এর নাম হচ্ছে 'গাহী'। গাহীর মেঝেতে জলন্ত কাঠকয়লা থাকত। মেঝের ইঞ্চি ছয়েক উপরে কঞ্চি দিয়ে একটা মাচান করা হত। মাচানের উপর একটি কাপড় পেতে রাখা হত। ঝামা ঘষার পরই মাড়-বিহীন কাগজের পাতাগুলিকে তিন ভাঁজ করে মাচানের উপর রেখে কিছু গন্ধকের গুঁড়া কাঠ-কয়লার আগুনে ছিটিয়ে দেওয়া হত। গন্ধক পুড়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড বা গন্ধকায় গ্যাস তৈরী হয়। ঐ গ্যাসে কাগজ বিরঞ্জিত হয়ে সাদা হত। এর পর মাড় মাখিয়ে পুনরায় গন্ধকায় গ্যাসের সংস্পর্শে আনা হত। তারপর ঘোটা দিয়ে যথারীতি পালিশ করা এবং অন্যান্য যা কিছু করণীয় করা হত।

সাজিক্ষার ঃ মণ্ড তৈরী প্রসঙ্গে সাজি বা সাজিক্ষার কথাটি বহুবার উল্লিখিত হয়েছে, এ বিষয়ে অল্প কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এখানে অবশ্য শিয়ালকোট অঞ্চল তথা পাঞ্জাবে সাজি তৈরীর বিষয়ই আলোচিত হবে। 'কাঙ্গণক্ষার', 'গোয়ালোনা' প্রভৃতি কয়েক ধরনের গাছের কাঠ পুড়িয়ে এই সাজি তৈরী হত। পাঞ্জাবের বরি ও রেচনা দোয়াব অঞ্চলে এই সব গাছ জন্মায়। কাঙ্গণক্ষার গাছ থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট সাজি তৈরী হত। সাধারণতঃ অক্টোবরের শেষাশেষি পাঞ্জাবে কাঙ্গণক্ষার গাছ কাটা হত। কাঠগুলি ছোট ছোট করে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মাটির মধ্যে বিশেষ ভাবে তৈরী করা একটি গর্তের মধ্যে পোড়ান হত। গর্তটির ব্যাস ও গভীরতা হত যথাক্রমে ফুট ছয়েক ও ফুট তিনেক। গর্তের মেঝেতে এক বা একাধিক মাটির হাঁড়ি উবুর করে [অর্থাৎ কানা নীচের দিকে ও তলদেশ আকাশের দিকে] এমন ভাবে পুঁতে রাখা হত যেন কেবলমাত্র কুব্জপৃষ্ঠ তলদেশটি মাটি ঢাকা না পড়ে। ঐ কুব্জপৃষ্ঠে ছোট ছোট অসংখ্য ফুটা করা থাকে। গর্তের মধ্যে কাঠগুলি সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় গর্তের মেঝেতে একটি তরল এসে জমছে এবং ঐ তরলের কিছু অংশ ফুটার মধ্য দিয়ে হাঁড়িতে যেয়ে জমছে। কাঠ যখন পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় পোড়া কাঠগুলি একবার নেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দেওয়া হয়। দিন কতক পরে মাটি সরিয়ে ভস্মাবশেষ বের করে নেওয়া হয়। গর্তের মধ্যে ছাই মেশান বস্তুটিকে বলে 'কাঙ্গণক্ষার-সাজি' আর হাঁড়ির মধ্যে সঞ্চিত বস্তুটিকে (তখন তরল বস্তু ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হয়ে গেছে) বলে 'লোটা সাজি'। কাঙ্গণক্ষার-সাজিই কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হত, কারণ. পরিশুদ্ধতার জন্য লোট-সাজির দাম ছিল বেশী।

নেপালী কায়দায় কাগজ তৈরী ঃ

নেপাল সংলগ্ন কয়েকটি ভারতীয় কেন্দ্রে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি ও উপাদান ছিল একেবারে আলাদা। পূর্বতন দেশীয় রাজ্য 'ভাজ্জি'র রাজধানি সুন্নি ছিল এমনই একটি কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রে নেপালী কায়দায় কাগজ তৈরী হত। নেপালে কাগজ তৈরীর জন্য Daphne papyracea নামে একটি গাছের ত্বক ব্যবহৃত হত। সমগ্র হিমালয় উপত্যকায় এই গাছ জন্মায়। Desmodium Tiliaefolium, Edgeworthia Gardineri ইত্যাদি গাছও কাগজ তৈরীতে অঞ্চল বিশেষ ব্যবহৃত হত। এই সব গাছের বহিঃ ত্বকের সবুজ অংশ ফেলে দিয়ে সাদা অন্তঃ ত্বককে ছোট ছোট কুচি করা হত। একটি ছোট ঝুড়িতে সের চারেক ওক (হিমালয় অঞ্চলের ওক) কাঠের ছাই নিয়ে একটি হাঁড়ির মুখে রেখে আস্তে আস্তে জল ঢালা হতে থাকে, ফলে লালচে ক্ষারজল হাঁড়ির মধ্যে জমতে থাকে। এই ক্ষারজল বড় মুখওয়ালা কোন পাত্রে ফুটান হয় এবং পাত্র-মধ্যে কুচান সাদা ত্বক ঢেলে দেওয়া হয়। ত্বকের পরিমাণ একটু হিসাব করে ঢালা হয়। ত্বকের পরিমাণ এমন হয় যে, ফুটন্ত ক্ষারজলের সবটুকু শোষণ করতে অন্ততঃ যেন আধঘণ্টা সময় লাগে

অর্থাৎ ত্বক ফুটন্ত ক্ষারজলের মধ্যে অন্ততঃ আধঘণ্টা থাকে এবং ঐ সময় পরে হাঁড়ির মধ্যে বাড়তি ক্ষারজল বিশেষ থাকে না। ফুটন্ত ক্ষারজলের সংস্পর্শে থাকার জন্য ত্বক বেশ নরম হয়ে যায় এবং ঐ ত্বককে শুক কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে পাথরের উদুখলে পিষলেই মণ্ডে পরিণত হয় ও জলে ধোবার পর কাগজ তৈরীর উপযোগী হয়।

Paper-lifting বা মণ্ড থেকে কাগজ প্রস্তুত পদ্ধতির নেপালী কায়দার সঙ্গে পারসীক কায়দার বেশ তফাৎ আছে। নেপালী কায়দায় কাগজীরা 'Paper-frame' বা খানসীর সঙ্গে একটি ছাঁকনি বা চালুনি ব্যবহার করে। কাঠের তৈরী খানসীর মীরটি সাধারণত ঘাসেরই হত তবে কাপড়ের ব্যবহারও ছিল। খানসীর উপর ছাঁকনিটি রেখে খানসীটি হাউজের জলে ভাসিয়ে রাখা হত এবং ছাকনির উপর এক তা (Sheet) কাগজের জন্য যতখানি মণ্ড লাগতে পারে ততখানি মণ্ড ঢেলে দেওয়া হত। ছোট-খাট ঢেলা ইত্যাদি থাকলে তা ছাকনিতে আটকে যায়, কিন্তু বাকী মণ্ড ছাকনি থেকে খানসীর মীরের উপর চলে যায়। সব মণ্ডটুকু মীরের উপর চলে আসার পর কাগজী ছাকনি সরিয়ে নেয় এবং খানসীটি নেড়েচেড়ে মীরের উপর মণ্ড সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে দেয় ও তারপর জল থেকে খানসী সাবধানে তুলে নেয়। এবার কাঁচা কাগজসহ খানসীটিকে রোদে বা আগুনের ধারে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে পর কাগজ খানসী থেকে পৃথক করে মাড় মাখিয়ে পালিশ করা হয়।

জাপানে প্রাচীন প্রথায় কাগজ তৈরী :

জাপানে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাগজ তৈরীর সূত্রপাত হয়। তুঁত জাতীয় গাছ (Mulberry) ছিল কাগজ তৈরীর কাঁচামালের প্রধান যোগানদার। ছয়/সাত বছর বয়সের তুঁতগাছের অন্তঃত্বক একাজে ব্যবহৃত হত। এজন্য শীতকালে গাছের বড় বড় প্রাচীন শাখাপ্রশাখাগুলি কেটে তাদের ত্বকগুলি ছাড়িয়ে আঁটি বেধে শুকিয়ে নিয়ে বার-চোদ্দ কিলোগ্রামের এক-একটি গাদা করা হত। [ফেলে দেওয়া পাতাগুলি হত রেশম গুটিপোকার খাদ্য এবং ত্বকবিহীন কাঠগুলি হত জ্বালানি] তারপর গাদাগুলি স্রোতস্বিনীর ধারায় বা নদীর জলে ঘণ্টা চব্বিশেক ডুবিয়ে রাখা হত। চব্বিশ ঘণ্টা পরে জল থেকে তুলে ছুরির মত কোন যন্ত্র সাহায্যে চেঁছে চেঁছে বহিঃত্বক অন্তঃত্বক থেকে আলাদা করে ফেলে পুনরায় প্রবহমান ধারায় ধোয়া হত। তারপর জলে সিদ্ধ করে এবং চাপ দিয়ে ত্বকস্থিত আঠাল পদার্থ বিদূরিত করা হত। এরপর ঐ ত্বক কাঠের ছাই থেকে প্রস্তুত ক্ষারজলে অথবা চুনজলে ফুটান হত। সিদ্ধ ত্বক ঝুড়ির মধ্যে রেখে আবার স্রোতধারার জলে ধুয়ে নেওয়া হত। সুসিদ্ধ ও উত্তমরূপে ধোয়া ত্বক একধরনের টেবিলের উপর রেখে মুগুর পিটিয়ে পিটিয়ে এবং প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে জলে ধুয়ে মণ্ড প্রস্তুত করা হত। ঐ মণ্ডের সঙ্গে মাড় মিশিয়ে নিলেই সেটি কাগজ তৈরীর উপযোগী হত। এই মাড় প্রধানত চাল থেকে প্রস্তুত করা হত। 'Toroto' নামক গাছ থেকে প্রাপ্ত একধরনের আঠাও (Mucilage) মাড় হিসাবে ব্যবহৃত হত।

গ্রন্থপঞ্জী :

(1) Brown, Percy : Indian Paintings under the Mughals, Oxford Univ. Press ; 1924.

(2) Emerson, H. W Monograph on Papermaking & Paper-Mache' in Punjab ; 1907.

(3) Hunter, Dard : Papermaking by hand in India, Pynson Printers, New york ; 1947

(4) Hunter, Dard : Papermaking (2nd. ed), Alfred. A. Knoff ; New york ; 1947.

(5) Joshi, K. B : Paper-making (as a cottage industry) Published by the All India Village Industries Association, Maganvadi, Wardha ; 1944.

(6) Manuscripts from Indian Collection, Descriptive Catalogue, National Museum, New Delhl ; 1964.

(7) Sarkar, D. C : Indian Epigraphy, Motilal Banarasi Dass Benaras.

লেখকের নিবেদন

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিহাসের রূপরেখাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে ভারতবর্ষে লিখিত কাগজের পুঁথিগুলিকে খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, একাজে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকদের কাছে লেখকের নিবেদন, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ ষোড়শ শতকের পূর্বে লিখিত কোন কাগজের পুঁথির খোঁজ পেয়ে থাকেন তবে তা লেখককে জানাতে পারেন। পুঁথি সংক্রান্ত তথ্য নীচের ছক অনুযায়ী হলে ভাল হয় :

পুঁথির নাম, গ্রন্থকার/অনুলেখকের নাম, ভাষা, হরফ, রচনার/অনুলিখনের স্থান এবং তারিখ [তারিখ বা বয়স নির্ণয়ের উৎসটি অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারিখের অন্যতম প্রধান উৎস 'পুষ্পিকা', কাজেই 'পুষ্পিকা'র নকল দিতে পারলে ভাল হয়। অনেক সময় লিপির ছাঁদ বা অন্যান্য তথ্য থেকে বয়স নির্ণয় করা যায়। যদি এভাবে পুঁথির বয়স নির্ণীত হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট গবেষকের নাম ও প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম ইত্যাদি জানান প্রয়োজন।], আকার, বর্তমান মালিক, সংবৃতি ও সূচীসংখ্যা।

লেখকের ঠিকানা—শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত। অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর,
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলিকাতা।

History of Papermaking and introduction of Paper in India (3) By Pankaj Kumar Datta.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণত প্রচলিত ধারণা এই যে বাংলাদেশে হুগলী জিলাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক। কিন্তু এই ধারণায় বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী যুগের সূচনা হইতে দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন বা স্থাপিত গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ভাবোদ্দীপক সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সংঘবদ্ধভাবে না হইলেও ন্যূনাধিক পরিমাণে জিলায় জিলায় বিচ্ছিন্নভাবে দেশের এই হিতকর কাজে গ্রন্থাগারের সুযোগ নেওয়া হইয়াছিল। সেই ধারাটা মহাত্মা গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত চলিয়া আসিতে থাকে। দেশে নবভাবের বন্যা আসিলে প্রবহমান ধারাটি কিছু দিনের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হইলে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা পুনরায় তাঁহাদের ধারানুসরণে তৎপর হইয়া উঠেন। ইহারই ফলে গ্রন্থাগারকে দেশ গঠনের কাজে লাগাইবার জন্য কলিকাতায় কয়েকটি বৈঠক বসে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনটি বৈঠক বসিবার পর একটা কর্মপন্থা স্থির হয়। এই বৈঠকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার 'আর্য পাবলিশিং হাউস'-এর শরৎকুমার ঘোষ, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘে'র কর্মী ফরিদপুর জিলা নিবাসী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বা সুরেশ ব্রহ্মচারী, যশোহর বা খুলনার অধিবাসী বিলাতফেরত শিক্ষাবিদ্ জ্যোতিষগোবিন্দ সেন, 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধুর স্বর্গত পুত্র চিররঞ্জন দাশ। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী ছিলেন সুরেশ ব্রহ্মচারী। সারা বাংলায় আধুনিক চিন্তাধারার সহিত শিক্ষিত জনসাধারণের সংযোগ ঘটাইবার জন্য বিনা চাঁদায় চলন্ত গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধনই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। কলিকাতা হইতে এই মর্মে আবেদন প্রচার করা হইলে কিছু অর্থ এবং পুস্তকও সংগৃহীত হয়। সুরেশ ব্রহ্মচারী ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁহার নিজ জিলার মাদারীপুর কালীবাড়ীতে এরূপ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। মাদারীপুর সহরের নিকটবর্তী পাঠককান্দী, কুলপদ্দি, লক্ষ্মীগঞ্জ ও চরমুগড়িয়ায় শাখা স্থাপিত হয়। কেন্দ্র হইতে এই সব শাখার কর্মীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা করিতেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন বিপ্লবী শ্রীপুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সহকর্মী হিসাবে আসিয়া জুটিলেন বিপ্লবী শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়। সুরেশ ব্রহ্মচারী এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া বিভিন্ন জিলায় সফর করেন এবং স্থানীয় লোকদিগকে এই কাজে সহযোগিতা করিতে

আহ্বান জানান। বরিশালে গিয়া সুরেশ ব্রহ্মচারী স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই প্রচেষ্টার কথা জানাইলে তিনি তাঁহাকে এই কয়টি কথা বলিয়া বিশেষ উৎসাহ দেন—'দেখ, যত লোক দেখি তাহারা সবাই বকাউল্লা ও শোনাউল্লার দল অর্থাৎ তাহারা কেবল কথাই বলে আর কথা শুনিয়াই যায়। কিন্তু করিমুল্লার অর্থাৎ কর্মঠ লোকের বড়ই অভাব। তুমি যে একাজে ব্রতী হইয়াছ তাহা জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তুমি সফলতা অর্জন কর।'

দেখিতে দেখিতে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জিলায় এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং কাজ চলিতে থাকে। সাংবাদিকপ্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তৎপ্রকাশিত ইংরেজী মাসিক 'মডার্ণ রিভিয়ু' এবং বাংলা মাসিক 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন :—"মাদারীপুর সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ (প্রকৃতপক্ষে সেবাশ্রম এই সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিল না, সেবাশ্রমের কর্মী সুরেশ ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগতভাবেই ইহাতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন) সারা বাংলায় আধুনিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির প্রচারোদ্দেশ্যে বিনা চাঁদায় চলন্ত গ্রন্থাগার সংগঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ এবং পুস্তক সংগৃহীত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের কল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য বহু গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে চান। বরোদা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুসরণে এই গ্রন্থাগারগুলি গড়িয়া তোলা হইবে এবং এইগুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে এই প্রদেশের মহদুপকার সাধনে সর্বপ্রকার সুযোগ পাইবে। ফরিদপুর জিলা ছাড়া অন্যান্য জিলাবাসীরাও এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনার্থে উদ্যোগীদের সমীপস্থ হইয়াছেন। মাদারীপুরে সকলেই এই গ্রন্থাগারকে স্বাগত জানাইয়াছেন এবং অন্যত্র গ্রন্থাগার স্থাপনেরও চেষ্টা চলিতেছে। অনেক বিখ্যাত প্রকাশক এবং ব্যক্তি বিশেষে এই গ্রন্থাগারকে পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে সুরেশ ব্রহ্মচারীর অকাল মৃত্যু ঘটায় বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তাহা হইলেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মহাত্মাজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত ইহার কাজ চলে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথা আসিয়া পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে* বা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম গঠিত হয় এবং কয়েক বৎসর সক্রিয় থাকিয়া কয়েকটি সম্মেলনও আহ্বান করে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাঁওতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখনকার দিনে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় অধিবেশনস্থলে অন্যান্য বহু রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইত। এই বীর বাংলার তদানীন্তন অবিসম্বাদী

*গত সংখ্যায় ভুলক্রমে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাসন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এবং পঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তনের সন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ লেখা হইয়াছে। যথাক্রমে ইহা ১৯১৯ ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইবে।

নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'মিউজিক্যাল কনসার্ট হল'-এ নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশনের তারিখ ছিল ১১ই পৌষ। মহিশূরের শ্রীভরদ্বাজ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই সম্মেলনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, এই সম্মেলনের পরই ভারতের তদানীন্তন প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। শ্রীভরদ্বাজ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশে গ্রন্থাগার ছড়াইয়া দেওয়ার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত হইতে পারে না। এই আন্দোলন অল্প দিনের হইলেও আমাদের যাহা সম্বল আছে তাহাই এই কাজে লাগান অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পথে অজ্ঞতাই সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় এবং ঠিকভাবে শিক্ষাদানেই ইহার প্রতিকার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। শিক্ষা বলিতে শুধু অক্ষরজ্ঞানই বোঝায় না। যে ভাব আমাদিগকে উন্নত করে তাহাকেই বোঝায়। ভারত সরকারের হাতে পড়িয়া ভারতীয় শিক্ষা অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। এই সকলের আসল কারণ হইতেছে নিরক্ষরতা। যে সাহিত্য বর্তমানে সৃষ্ট হইতেছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। এই গ্রন্থাগার আন্দোলন সেই অভাব মিটাইবে।

সম্মেলনের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশের স্বার্থে যখন জনগণের সর্বশক্তি নিয়োগের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে তখন সকল প্রকার অভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও তাহা দূর করাই প্রয়োজন। শুধু শাসনক্ষমতা অর্জনই জনগণের কাম্য নয়, দেশকে গড়াও তাদের কাম্য। সেই জন্যই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা এমন কি সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা তাহাদের কাম্য—এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রাচীন ভারতে ইহার উপযোগিতা যথাযোগ্যভাবে স্বীকৃত হয় নাই। গুরুত্ব-পূর্ণ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহালয় ছিল বলিয়া প্রত্যেকটি মন্দিরই ছিল বিদ্যাচর্চার স্থল। প্রাচ্যসংস্কৃতি ইউরোপীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রভূত সহায়তা করিয়াছে কিন্তু আজ ভারত শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়া ইউরোপীয় দেশগুলির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই আন্দোলন প্রতি সহর ও প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে উৎসাহিত করিবে। জ্ঞান সকলকে যে শক্তি দেয়, সেই শক্তি অর্জন করা সকলেরই কর্তব্য।

এই সম্মেলনে সারা ভারত হইতে দেড় শত প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। দেশের সকলকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদে যোগ দেওয়ার জন্য এবং জিলায় জিলায় ও সহরে সহরে গ্রন্থাগার স্থাপনের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদকে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের কাজ হাতে লইবার জন্যও সম্মেলন সুপারিশ করে। মহিলাদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপন, ভারতের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা প্রকাশ এবং একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার পত্তন করিবার জন্যও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশবন্ধু কর্মব্যস্ততার দরুণ সম্মেলনে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় তাঁহার সহকর্মী তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সভার কাজ চালান। এছাড়া বাংলা হইতে যে সকল প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় ছিলেন অন্যতম। তিনিই সম্মেলনে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন ও উহাকে সক্রিয় করিয়া তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পরবর্তীকালে তিনিই বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুশীল বাবু তখনকার দিনের কোন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক ছিলেন না। বড় মাথায় বড় বুদ্ধি সব সময়ই খেলে। কিন্তু ছোট মাথায়ও অনেক সময় বড় বুদ্ধি খেলে। সুশীল বাবুর কথা চিন্তা করিলে এই কথাটির সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই গ্রন্থাগার আন্দোলন যেন তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল। উচ্চশিক্ষা লাভান্তে তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তা তাঁহাকে এমনভাবেই পাইয়া বসিল যে, তিনি ওকালতি না করিয়া কায়মনোবাক্যে নিজেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহাকে বাংলার অনেক জিলায় এমন কি সুদূর আসাম প্রদেশের অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল তিনি এই কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে লিপ্ত ছিলেন। কখনও সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া, কখনও বেতার কেন্দ্রে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, কখনও কোন কোন গ্রন্থাগারের বার্ষিক সভাদিতে উপস্থিতমত ভাষণ দিয়া, কখনও বা ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে ভাবাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎকর্তৃক উপ্ত বীজই যে অঙ্কুরিত হইয়া শাখায় পল্লবে ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর বড় কথা নয়, রূপদানেই ব্যক্তির কৃতিত্ব। সারা বাংলার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপদানের কৃতিত্ব তাঁহারই। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তার' নামক বাংলা ভাষায় একখানা বই লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার কাজে অশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

Library movement in Bengal
By Gurudas Bandyopadhyay.

গ্রন্থাগারে কর্মিসহযোগ ও কয়েকটি উপেক্ষিত কর্তব্য (২)

অনেক

১৫ মহিলা ও পুরুষ কর্মী :

কোন এক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মহাশয়া তাঁর কলেজ গ্রন্থাগারে পুরুষ কর্মী নিয়োগ করেছিলেন এবং স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন এই বলে যে মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে বাইরের কোন কোন কাজ পাওয়া মুস্কিল।

ছোট গ্রন্থাগারে যেখানে কর্মী সংখ্যা অল্প সেই গ্রন্থাগারে মহিলা কর্মী যদি নিয়োগ করা হয় তা হলে যে একজন বা দুজন পুরুষ কর্মী থাকেন তাঁদের ওপর বাইরের কাজের চাপ হয়ত বেশী পড়ে এবং প্রথম প্রথম পুরুষ কর্মীরা হাসিমুখে সেই কাজের চাপ মেনে নেন; কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন তাঁরা বেঁকে বসেন।

প্রশ্ন হতে পারে, গ্রন্থাগারে আবার বাইরের কাজ কি? ছোট গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা হয়ত ব্যাপারটা অনুমান করতে পারবেন। যেমন মার্চের শেষ সপ্তাহে অর্থ মঞ্জুর হল বই কেনার। দু'তিন দিনের মধ্যে বই কিনে না ফেললে টাকা ফিরে যাবে। তখন কলকাতার দোকান ঘুরে বই বেছে বিল প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। কলকাতার বাইরের বিভিন্ন মাঝারী বা ছোট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের এই রকম নানাকারণে সরকারী দপ্তর, বই-পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে হাজিরা দিতে হয়। চিঠি লিখে অথবা ফোনে সব সময় সব কাজ হাসিল করা যায় না। কেননা, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লালফিতে উঠে গেলেও সাদাফিতের বাঁধন খুব মজবুত।

এমন কথাও শোনা যায় যে, মহিলা কর্মীদের ছুটির প্রয়োজন বেশী হয়, বিবাহের স্থির হলে অথবা সন্তানসম্ভবা হবার পর অনেক সময় তাঁরা দুম্ করে চাকরী ছেড়ে দেন; কোন কোন পদস্থ পুরুষ কর্মী মহিলা কর্মীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার শুরু করেন; গ্রন্থাগারিক মহাশয় কোন কারণে কোন কোন মহিলা কর্মী সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করলেও শেষ পর্যন্ত নানা কারণে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সমস্ত অভিযোগ নিশ্চয়ই সর্বাংশে সত্য নয় এবং মহিলা কর্মী নির্বিশেষে প্রযোজ্যও নয়। তবে একথা সত্যি যে, যে সব গ্রন্থাগারে মহিলা ও পুরুষ কর্মী একই সঙ্গে কাজ করেন সে সব গ্রন্থাগারের আবহাওয়ার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং গ্রন্থাগারিকের (তিনি পুরুষ বা মহিলা যাই হোন না কেন) নির্দলীয় হওয়ার প্রশ্নে আরও সতর্ক হতে হয়।

১৬ ভিন্ন ভাষাভাষী কর্মী :

বড় গ্রন্থাগারে বিশেষ করে গ্রন্থাগারটি যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন হয় তবে দেখা যায়, গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষী কর্মীদল একসঙ্গে কাজ

করছেন। মেলামেশার কতগুলি সুফল অনস্বীকার্য, যদিও সেকথা বর্তমান আলোচনার বাইরে।

সংঘাতের সৃষ্টি হয় নানাকারণে। যে সব প্রদেশবাসী নিজেদের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাঁরা তাঁদের ব্যবহারে বেশ কিছুটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেন। নিজেদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং অন্য প্রদেশবাসীদের মনে অনেক সময় অজান্তেই আঘাত দিয়ে ফেলেন।

আবার এমনও দেখা যায় গ্রন্থাগারিক মহাশয় বা অন্য পদস্থ অফিসাররা, অথবা বিভাগীয় কর্তা যে প্রদেশবাসী সেই প্রদেশবাসী গ্রন্থাগার কর্মীরা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছেন, চাকরী খালি হলে তাঁদের দল বৃদ্ধি করে সেই প্রদেশবাসীরাই অধিক সংখ্যায় আসছেন তখন গ্রন্থাগার কর্মীদের ঠাণ্ডা লড়াইএর উত্তাপ বাড়ে। তবে গ্রন্থাগারিকের বা পদস্থ অফিসারদের তরফ থেকে যদি এই সংঘাতের প্রশ্রয় না দেওয়া হয় তবে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর অনেক সময় কর্মীরা ভুলেই যান যে তাঁরা ভিন্ন প্রদেশবাসী বা ভিন্ন ভাষাভাষী। সুতরাং দেখা যায় সাময়িক নানা কারণে এই সংঘাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

১৭ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের অবস্থান ঃ

অনেক সময় দেখা যায়, কোন গ্রন্থাগারে বিশেষ একজন ব্যক্তি বা দলের মতামত সব-সময়েই গ্রন্থাগারিক মেনে নিচ্ছেন যদিও ঐ ব্যক্তি বা দলটি ভেজালে পূর্ণ। ঐ ব্যক্তি বা দলটিকে তখন অন্যান্য কর্মীরা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন এবং নানা নামে অভিহিত করতে থাকেন ; যেমন, দালাল, টিকটিকি ইত্যাদি। গ্রন্থাগারিকের এই দুর্বলতার নানা কারণ থাকতে পারে এবং এই দুর্বলতাবশতঃ ঐ ব্যক্তি বা দলটির নানা অন্যায় কাজ গ্রন্থাগারিক হজম করতে বাধ্য হন, এমন নজীরও আছে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু যখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে ব্যাপারটা ভাল নয় এবং কর্মী সংঘাতের চেহারাটা খুব বিশ্রী হয়ে উঠছে তখন তাঁর সতর্ক হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বিশেষ ব্যক্তি বা দলটি আবার গ্রন্থাগারিককে ভুল বুঝিয়ে কর্মীদের অশান্তি আরও বাড়িয়ে তোলেন।

১৮ ত্রুটিপুর্ণ কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি ঃ

বর্তমানকালে চাকরী খুঁজছে যত লোক, চাকরীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এক জটিল সমস্যা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে সকল প্রতিষ্ঠানেই কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগেও এর চেহারা ছিল অন্য রকম। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাশীল:ব্যক্তিরা নিজেদের আত্মীয়, পরিচিত দেশ-গাঁয়ের লোক এনে দুমদাম বসিতে দিতেন ও এই ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে

কর্মী নিয়োগের ফলে বিভিন্ন রকমের দলের সৃষ্টি হয়। "অমুক দল ওমুক গাঁয়ের অমুক ব্যক্তি সুতরাং বুঝেশুঝে কথা বল"—গ্রন্থাগারিকের সামনে হুঁসিয়ারী বাণী ঝুলতে থাকে সবসময়ে।

গ্রন্থাগারে নীচের শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও কিন্তু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু দেখতে পাওয়া যায়। ফলে যিনি ভাগ্নে বা ভাই বা শ্যালককে কাজে ঢোকাতে পারেন না তিনি চটে যান এবং ঘোঁট পাকিয়ে বেড়ান। কিন্তু যে ব্যক্তি বা দল সন্তুষ্ট হন তিনি বগল বাজিয়ে বেড়ান।

ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত ঘাঁটির সৃষ্টি হয়, তাদের বিষদাঁত ভাঙা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিবর্গের অবসর গ্রহণ করার দিন পর্যন্ত।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং তরুণ গ্রন্থাগারিকরা যাঁরা উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী এবং পরীক্ষাদির মাধ্যমে কাজে যোগদান করেছেন তাঁরাও অনেক সময় অগণতান্ত্রিক কার্যাবলীর অবসানের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বা তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত কর্মীদের অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত। কারণ এভাবে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মী সমিতিতে পাওয়া যায় না; ফলে কর্মী ইউনিয়ন দানা বাঁধতে পারে না।

১৯ তরুণ কর্মিদল ও সংঘাতের বিভিন্ন রূপ :

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য অনেক সময় গ্রন্থাগারিক তরুণ কর্মিদলের ওপর নির্ভর করেন এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকের আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারিক মহাশয় কখন কখন তরুণ কর্মিদলের মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলেন এবং এরূপ ঘটনা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক উভয়ের পক্ষেই দুঃখজনক। আরও নানা কারণে তরুণ কর্মিদলের মধ্যেও সংঘাতের বাস্তব আঘাত এসে পরে।

ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে এবং দেশের অবস্থা অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর হচ্ছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর অবস্থা এমন যে, তালপুকুরে আর ঘটি ডুবছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কতটা আশা করা যায়? সম্প্রসারণ যে প্রয়োজনের তুলনায় হচ্ছে না তার প্রমাণ চাকরীর বাজার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে অথচ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চেহারা এখনও নিশ্চিত হয়নি।

অবস্থা এই রকমই ভয়াবহ। এদিকে বছরে বছরে দলে দলে ছেলেমেয়ে সার্টিফিকেট, ডিপ-লিব ও বি-লিব-এসসি পাশ করছেন। এই সব বিবিধ পাঠ্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপারটিতে তাঁরা বিশেষ দুশ্চিন্তাভোগ করছেন না, অন্তত তার কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি। এদিকে

বৃত্তিকুশলী তরুণ কর্মিদল এই প্রশ্নটি তুলেছেন কয়েকবার। যেমন, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এবং পুনর্মিলন স্মারক পত্রে আমাদের চোখে পড়েছে এবং তাঁদের মুখে এই আলোচনা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। মস্ত বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন তাঁদের চোখে। কেউ কেউ বলছেন, বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যেন ষাঁড়াষাঁড়ি বাণ ডেকে গেছে। IASLIC ইতিমধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁদের ছাত্রছাত্রী তালিকায় বিভিন্ন প্রকারের ছাত্রছাত্রীর এক অপূর্ব মিশ্রণ দেখা গেছে। যেমন, কোন ট্রেনিং নেই, শুধু সার্টিফিকেট, টাটকা ডিপ-লিব বা বি-লিব-এসসি কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নেই, সার্টিফিকেট এবং ডিপ-লিব এবং অভিজ্ঞতা সবই আছে, আবার এমনও আছে যাঁর কোন ট্রেনিংও নেই এবং গ্রন্থাগারে কাজের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শোনা গিয়েছিল কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার চলছে। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ও খুলবে খুলবে করছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে এম-লিব-এসসি এবং এম-এ ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ (সকলের জন্যই দু'বছর) খুললেই সোনায় সোহাগা।

কিন্তু চাকরীর বিজ্ঞাপন কৈ ? চাকরী কোথায় পাওয়া যাবে ? ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। যোগ্যতা অনুযায়ী এ অভাগা দেশে যে সামান্য বেতনও পাওয়া উচিত তার অর্দ্ধেক, এমনকি, সিকি বেতনেও লোক কাজ করছে। কোন কলেজে একজন সার্টিফিকেট পাশ কর্মী প্রায় আড়াই বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। সেখানে পরে গেলেন গ্রাজুয়েট ডিপ-লিব। তারও পরে গেলেন এম-এ এবং ডিপ-লিব।

কোন গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদকের দুর্ব্যবহার ও কুকীর্তির জন্য গ্রন্থাগারটি কলকাতার সন্নিকটে হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিক টিকছেন না। দেখা গেল, গ্রন্থাগারিকরা কাজে যোগদান করে অবস্থা দেখেশুনে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। ঘটনাটি প্রায় অনেকের কানাকাণি হল। ফলে নানাদিকে অনুরোধ উপরোধ করে তাঁরা গ্রন্থাগারিক খুঁজে বেড়ালেন। কেননা, ভয় এই যে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও গ্রন্থাগারের নাম দেখলেই দরখাস্ত করতে দ্বিধা করবেন অনেকে যাঁরা গ্রন্থাগারটির ইতিবৃত্তের সঙ্গে পরিচিত। হলও তাই। বিজ্ঞাপন দিয়েও লোক মিলল না। তারপর বিজ্ঞাপন না দিয়ে অনুরোধ ও কৌশলের দ্বারা লোক নিলেন। কিন্তু ধোপে টিকলনা এবং তিনি জল আরও ঘোলা করে দিলেন। কোন গ্রন্থাগারিক নেই এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন চলার পর আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কিন্তু গ্রন্থাগারের নাম গোপন করে। একেবারে সদ্য পাশ করা কাউকে যদি ফাঁদে ফেলা যায়। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এক প্রতিভাবান গ্রন্থাগার কর্মী অপমানিত বোধ করায় চাকরী ছেড়ে দেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, কোন গ্রন্থাগার কর্মীর ঐ গ্রন্থাগারে কাজ করতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কি করে সম্ভব হবে ?

এরই মধ্যে যখন দু'একটা মাঝারি চাকরীর বিজ্ঞাপন কাগজে দেখতে পাওয়া যায়

তখন অনেকক্ষণ পরে স্টপেজে বাস আসার অবস্থা। যে যেখানে আছেন সকলেই গোপনে গোপনে প্রার্থী। কিন্তু ড্রপসীন ওঠার পর ইণ্টারভিউর দিন সব ফাঁস। দেখা যায় সদ্য পাশকরা প্রার্থী যেমন আছেন আবার তাঁদের শিক্ষকদেরও কেউ কেউ হাজির। অনেকে প্রশ্ন করে ফেলেন ওঁরা ইণ্টারভিউ দেবেন না নেবেন। কোন এক বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদের জন্য প্রাপ্ত সমস্ত আবেদনপত্র বাছতে বাছতে দেখা গেছে একজন প্রবীণ ব্যক্তি যিনি দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে জড়িত, যিনি বেশ কয়েকটি প্রার্থীর আবেদন পত্রের রেফারী, দু'একজনকে টেসটিমোনিয়ালও তিনি দিয়েছেন, অবাক হবার পালা এল, যখন দেখা গেল তিনিও ঐ পদের জন্য একজন প্রার্থী।

চাকুরীরত কর্মীদের কিন্তু ভাল বিজ্ঞাপন দেখা গেলেও আবেদন করা সব সময় সহজ হয়না। কেননা, উপযুক্ত খাল বরাবর আবেদন পাঠাতে হবে। সে এক দুর্ভাবনা। গ্রন্থাগারিকের মন ভাল থাকলে হয়ত কাজ হাসিল হবে। তা ছাড়া পোষ্টাল অর্ডারের টাকা, ছাপা আবেদন আনানোর ঝামেলা, আবেদনপত্র এলে সেটি পূরণ করা। সব মিলিয়ে সে এক বিরাট পাট। এমন কেউ আছেন কিনা জানিনা, যিনি এ সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ড ঠিকঠাক গুছিয়ে করতে বিরক্ত বোধ না করেন। এই সব পালা-পার্বন সারতে সারতে আবার খোঁজ নিতে হয়—যে গ্রন্থাগার লোক চেয়েছে সেখানে গোকুলে কেউ বাড়ছে কিনা। অবশ্য যাঁরা দেশ ভ্রমণের জন্য 'চাকরী চাই' বিভাগ দেখেন তাঁদের কথা আলাদা। অনেক সময় মনে হয়, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন কিছু লোকের দেশ ভ্রমণের সুযোগ দেয়, এ ছাড়া আর কিছু নয়। উপযুক্ত খাল বরাবরের প্রশ্নে 'সি এস আই আর'-এর ডঃ যোশেফের কথা মনে পড়ে যায়। তখন নেহরু জীবিত ছিলেন। ডঃ যোশেফের মৃত্যুর পর সরকারী দপ্তরে নিয়ম চালু হল এক বছরে কোন্ কর্মীর ক'টি আবেদনপত্র পাঠান চলবে। কি নিদারুণ পরিহাস! একজন দক্ষ কর্মীকে প্রাণ দিতে হল এই সামান্য নিয়মটুকু চালু করবার জন্যে। বিভাগীয় কর্তাদের ধারণা, যেন কেউ আবেদন করলেই, তার চাকরী হয়ে যাবে এবং কর্মীটি চলে গেলেই অফিস অচল হয়ে যাবে। আরে বাবা, তাই যদি ভয় তবে ঐ ঘুড়িকে লাটাইএ আটকে রাখবার জন্যে যতটুকু সুতো প্রয়োজন সে সুতোটুকু ছাড়। পুকুরে জল না থাকলে মাছ খাবি খাবে সেটুকু ভাববার সময় সাহেবদের নেই। একটা প্রমোশন না পেয়ে শেষদিন পর্যন্ত একই অফিসে কাজ করা কল্পনা করা যায় না।

অবিলম্বে নিয়ম হওয়া উচিত যে চাকরীর প্রথম বছরে, সাধারণতঃ যেটা প্রবেশন পিরিয়ড, কোন আবেদনপত্র পাঠানোর প্রশ্নে বিভাগীয় কর্তা ভেবে দেখতে পারেন, কিন্তু সেই সময়ের পর কোন কর্মীর আবেদনপত্র পাঠানোর প্রশ্নে কোন দ্বিধা করা চলবে না এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অফিসের অবস্থা বা কর্মীর অবশ্য প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কোন বিভাগীয় কর্তা মনে করেন যে, কর্মীর আবেদনপত্র পাঠনোর অসুবিধা আছে সে ক্ষেত্রে কর্মীকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, ঐদিন থেকে এক বছরের মধ্যে যে

পদের জন্য তিনি আবেদন করছিলেন তার সমগোত্রীয় (বেতন ও মর্যাদার দিক থেকে) পদে তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হবে।

এতো গেল অন্যত্র চাকরীর জন্য আবেদন করার ব্যাপার। অনেক যুদ্ধ-সংগ্রাম করে হয়ত বা অন্য কোথাও যোগদান করবার এক দুর্লভ আমন্ত্রণ পত্র কারও ভাগ্যে জুটল কিন্তু তাই বলেই তো দুম্ করে একটা পুরনো চাকরী ছেড়ে, সংসার ফেলে ছোটা যায় না। বেচারী গুটি গুটি আবার গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান যদি অনুগ্রহ করে কিছুদিনের জন্য লিয়েন পাওয়া যায়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনেছি কেরানীরা লিয়েন পান, অধ্যাপকরাও পাচ্ছেন কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেলায় নৈব নৈব চ। যদি কোন গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ কোন শাখা সম্বন্ধে পড়া-শোনা করবার জন্যে অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর কোন শিক্ষণ গ্রহণ করবার বাসনা করেন মানসিক উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্যে এবং কখন কোন ভাল চাকুরী পাবার সুযোগের আশায় তখন সে ইচ্ছা পূরণ করা তাঁর পক্ষে দুরূহ। গ্রন্থা-গারিক গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাঁকে ঐ শিক্ষণ ব্যবস্থার যোগদানের জন্য পাঠাবার সুযোগ করে দিতে পারেন না। এমন কি, বিনা বেতনের ছুটি চাইলেও তা মঞ্জুর করা হয় না। সর্বত্র এক কথা শোনান হয়, "যেমন আছ, তেমনি থাক"।

চার পাচ বছর আগে কোন 'লাইব্রেরীয়ানস্ ডাইরেক্টরী' তৈরী করা হয়নি, আমার মনে হয় ভালই হয়েছে। এই কয় বছরের মধ্যে বাংলা দেশের তরুণ গ্রন্থাগারিকের দল (ভারতবর্ষের বলা যায় কি ?) যে হারে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিয়েছেন সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন আগেও আমরা শুনেছি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে এম এ পাশ হাতে গোনা যায়। এখন পৃথক চিত্র। শুধু এম এ পাশ নয় এর দ্বিত্বও আছে, বি-এ অনার্স, এম-লিব, এফ-এল-এ, ডক্টরেটের সংখ্যাও বাড়ছে।

বেশ কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল কর্মী হুস হুস করে অনার্স ও এম-এ পাশ করেছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের গ্রন্থাগার আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন, অনেকে আবার বেতন কিছু কম হলেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে চলে এসেছেন। এঁরা ছাড়াও পরোক্ষভাবে জড়িত বা অনুরাগী প্রতিটি ব্যক্তি গভীর আগ্রহের সঙ্গে বছরের পর বছর আশা পোষণ করেছেন হয়ত খুব শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতন সম্পর্কিত সুপারিশ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হবে। কিন্তু বাংলা দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সে সুপারিশ এখনও মাটির ইলিশ হয়ে দেয়ালে ঝুলছে এবং কর্মীদের হাতের সরষে বাঁটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। ফলে একটি দু'টি করে ভাল ভাল কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর। এদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতেও যোগদান করেছেন।

বেশ কিছু কর্মী বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন। এ সব লোকসানের হিসেব রাখার মাথাব্যাথা কারও নেই।

প্যান্ট পড়ে গায়ে চাদর জড়ালে সেরকম অস্বস্তিকর দেখায়, গ্রন্থাগারে কাজ করেও কেরানী বা অন্য কোন পদের নাম বহন করা সেইরকমই অস্বস্তিকর। সরকারী দপ্তর সংলগ্ন কোন কোন গ্রন্থাগারের কর্মীদের পদের নাম, আপার ডিভিসন ক্লার্ক। অন্য বহু গ্রন্থাগারেও দেখা গেছে Library designation দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট কৃপণতা। বিশ্ববিদ্যালয় বা সমগোত্রীয় অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিক মহাশয়রা সচেষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঘোষিত পদগুলি যদি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন তবে আমার মনে হয়, কর্মীরা যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করবেন এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির দিক থেকেও এর যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে। আমরা যাঁরা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে জড়িত, তাঁরাই যদি যিনি রেফারেন্স বিভাগে কাজ করেন তাঁকে রেফারেন্স লাইব্রেরীয়ান, এইভাবে একসেসন লাইব্রেরীয়ান, সারকুলেসন লাইব্রেরীয়ান ইত্যাদি নাম গ্রহণের ব্যাপারে তৎপর না হই তবে অন্যে পরে কা কথা। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট নামক একটি সর্বরোগহর পদের নাম আছে। শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনহার দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয় আপত্তির সুর তুলেছিলেন এই অজুহাতে যে, তার দপ্তরের কর্মীদের অসন্তোষ সে ক্ষেত্রে বর্ধিত হবে। অর্থাৎ তাঁর দপ্তরের কর্মীরা এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীরা তাঁর মতে সমশ্রেণীর। তাঁর দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অফিস এসিস্ট্যান্ট এবং গ্রন্থাগারে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট। গ্রন্থাগার কর্মীরা যে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত একথা বে-মালুম ভুলে যেতে এক মিনিটও সবুর সয়না। এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যও আমাদের পুরোপুরি গ্রন্থাগার কর্মী হতে হবে অর্থাৎ আমাদের ডেজিগনেসনের মধ্যে আমাদের কাজের বিশেষত্বের ইঙ্গিত যেন থাকে। কেবল এসিস্ট্যান্ট শব্দের সঙ্গে একটা স্থান-বাচক বিশেষণ যোগ দিলেই হবে না। গ্রন্থাগারিকরা একটু তৎপর হলেই আমার মনে হয় এ কাজে তাঁরা সফল হবেন।

অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা রকমের যে সব পদের নাম ব্যবহৃত হয় আমার মনে হয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির (যথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা) এই বিষয়ে সত্বর একটি সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এবং সর্বগ্রন্থাগার গ্রাহ্য একটি পদের তালিকা (Designation chart) প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা আলোচনার জন্য একটি সভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

তরুণ গ্রন্থাগারিকদলের সংঘাতের প্রসঙ্গে আলোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হল। এটাই স্বাভাবিক। বাংলা তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে সেই পর্যায়েই তা দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা ধীরে ধীরে তার আরও সম্প্র-

সারণ ও উন্নয়ন হবে অথবা আন্দোলন আরও পিছিয়ে পড়বে, এই সব প্রশ্নই নির্ভর করছে তরুণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবনের সাফল্য ও অসাফল্যের ওপর। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে উৎসাহী ও প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ তরুণ গ্রন্থাগার কর্মীদের যে ভাবে টবে বটগাছ চাষের মত ব্যবহার করা হয় এবং সবুজ ডাল পালা ছড়াতে চাইলেই তা ছেঁটে ফেলার যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলশ্রুতি কি শুভ হবে ?

The Spirit of Co-operation in the library staff
and a few neglected duties
—By Janeka

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ

চব্বিশ পরগণার নৈহাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। নৈহাটী ষ্টেশনের অনতিদূরে তাঁর বাসস্থানটি আজও বিদ্যমান। বাটীর অভ্যন্তরে চত্বরে দুইটি দেবমন্দির এবং সম্মুখে একটি ছোট্ট রাস্তার ওপরে আর একটি ক্ষুদ্র গৃহ। এতে আছে গুটিকয় ঘর। সংস্কারের ফলে চেহারা মূল অট্টালিকার তুলনায় অনেকটা আধুনিক। এটিই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা। এখানে বসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের খসড়া রচনা করেছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূল অট্টালিকাটিকে কিনে নিয়ে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু বর্তমানে অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৩৮ সালে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে এই ক্ষুদ্র গৃহটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ক্রয় করে নেয়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে একটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ৺বিমল চন্দ্র সিংহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছ থেকে বাড়ীটি কিনে নেন। তবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব পুস্তক কমই আছে। গ্রন্থাগারটি ছোট এবং বই যা আছে তার প্রায় সবই বঙ্কিমচন্দ্রের এক ভ্রাতার পৌত্র শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের। কয়েকটি মূল্যবান পুস্তকের সঙ্গে এখানে জীর্ণ অপাঠ্য উপন্যাসও আছে অনেক; বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকও আছে বেশ কয়েকটি। অধুনাক্রীত কয়েকটি আধুনিক পুস্তক এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কয়েকটি পুরাতন গ্রন্থ এই গৃহের সম্মুখের বড় কক্ষটিতে স্থান পেয়েছে। এর পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আরও দুইটি কাঠের আলমারী আছে। তারই ভিতর ধুলোর পাহাড় অপসারণ করে কয়েকটি গ্রহণযোগ্য পুস্তক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রবন্ধটির শেষে এই গ্রন্থাগারের সেই সব গ্রন্থের তালিকা ও তৎকালীন কয়েকটি পত্রিকার তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল। আলমারির অভাবে পুস্তকগুলি সযত্নে রাখার উপায় নেই বর্তমানে। শোনা গেল, পাঁচ বৎসর ধরে বইয়ের আলমারী আনার চেষ্টা করেও সফল হননি এখানকার গ্রন্থাগারিক শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়। সরকারী সাহায্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে প্রায়ই যেতে হয় সরকারী অফিসের দরজায়। এতে গ্রন্থাগারের কাজের ব্যাঘাত হয় অনেক। তাছাড়া 'ক্যাটালগ কার্ড' এর অভাবে কোনও গ্রন্থতালিকাও প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। আজও স্থানাভাবে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সঙ্গে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে তাদের উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য।

আর্থিক ব্যাপারে এই গ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় সরকারী সাহায্যের উপর। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন পেতে এত সময় লাগে যে, কোনও মাসেই কর্মচারীরা সময়মত বেতন পান না। তাও কর্মচারী বলতে একজন শিক্ষিত পিওন, একজন দরওয়ান ও গ্রন্থাগারিক নিজে। আর কর্মচারী হিসাবে আছেন এই বংশের উত্তর-পুরুষ শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সরকার কর্তৃক এই গ্রন্থাগারের কার্যভার গ্রহণ করার পর আঞ্চলিক এম-এল-এ দের নিয়ে একটি 'লাইব্রেরী কমিটি' গঠন করা হয়। অব্যবস্থার অভিযোগ আসায় এই কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে পরে নূতন কমিটি গঠন করা হয়। যদিও মূল কর্তৃত্ব শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা বিভাগের হাতে ন্যস্ত।

এখানে সংরক্ষিত কয়েকটি চিঠিপত্রের মধ্যে আছে ভ্রাতুস্পুত্রকে লেখা বঙ্কিমের কয়েকটি উপদেশ, স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা চিঠি, রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠি, কয়েকটি বৈষয়িক চিঠিপত্র, বঙ্কিমের লেখা অসমাপ্ত একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি, বৈষয়িক ব্যাপারে বঙ্কিমকে লেখা ভ্রাতাদের পত্রাবলী এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখে দেওয়া বঙ্গদর্শনের দানপত্র। আর সংগ্রহশালায় বঙ্কিমের পোষাক, দাবার ছক এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য কিছু কিছু জিনিষপত্র সংরক্ষিত আছে।

কয়েকটি বাংলা পুস্তকের তালিকা:

ঘোষ, শিশির কুমার।
কালাচাঁদ-গীতা; দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ১৩১২। ২৩২ পৃঃ। মতিলাল ঘোষ কতৃক লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহ প্রকাশিত।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম।
কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ১৩৩৩।

জাল প্রতাপচাঁদ। কলিকাতা, ১৮৮৩।

দাস, নরোত্তম।
ভক্তিতত্ত্ব সার। কলিকাতা, ১৩১৮। ৫৬ পৃঃ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র।
প্রাচীন কবি সংগ্রহ।
কবিগণ সম্বন্ধে একটি উচ্চস্তরের লেখা।

ভট্টাচার্য, সারদাচরণ।
পুরোহিত-দর্পণ বা অতি বিশুদ্ধ ত্রিবেদীয় কর্মকাণ্ড পদ্ধতি। কলিকাতা,-১৩১৫। ৭১৮ পৃঃ।
শ্রাদ্ধ প্রকরণ, সংস্কার প্রকরণ (বিবাহ প্রকরণ), ব্রত প্রকরণ, তিথি প্রকরণ, পূজা প্রকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

মজুমদার, হরিকৃষ্ণ।
ভারতবর্ষের ইতিহাস: হিন্দুরাজত্ব; ১ম খণ্ড। ১৮৮২।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদক)
হিন্দু-সর্বস্ব; ৭ম সংস্করণ। কলিকাতা, বসুমতী পুস্তক বিভাগ, ১৩১৪। ৭১২ পৃঃ।

মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর।
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, ১২৯৯। ১০৮ পৃঃ

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব।
বিবিধ প্রবন্ধ। ১৩২৭।

মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল, অনুবাদক।
নোয়াখালীর খুনী মোকদ্দমা: পেনেল সাহেবের রায়। কলিকাতা, ১৩০৮। ১২৫ পৃঃ।

রাঢ়ী, কান্তিচন্দ্র।
শ্রীশ্রী নবদ্বীপ-তত্ত্ব; দ্বিতীয় সংস্করণ। নবদ্বীপ, নদীয়া প্রচার সমিতি। ৯৮ পৃঃ।

রায়, চারুচন্দ্র, সম্পাদক।
সংগীত-সার-সংগ্রহ। কলিকাতা, বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৩০৮।

শর্মা, রামনারায়ণ।
কুলীন কুলসর্বস্ব: নাটক। কলিকাতা, ১৩০৮। ১০৮ পৃঃ।

সচিত্র গার্হস্থ্য কোষ। ৩য় সংস্করণ।
কলিকাতা, বসাক এণ্ড সন্স, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। ৭৩৪ পৃঃ।

সেন, নবীনচন্দ্র।
আমার জীবন।

সেন, দীনেশচন্দ্র।
গোবিন্দ দাসের করচা।

সেন, নবীনচন্দ্র।
বঙ্গমতী (কাব্য)। কলিকাতা, ১৮৮০। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তিনটি খণ্ড পাওয়া যায়।
হিন্দুশাস্ত্র: দ্বিতীয় ভাগ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। কলিকাতা, ১৩০০।

কয়েকটি পত্র-পত্রিকার তালিকা:

(ক) "আয়ুর্বিজ্ঞান" পত্রিকাটির কয়েক সংখ্যা।

সাহিত্য-সংহিতা—১৩৩২ সাল, মাঘ, ফাল্গুন, আষাঢ়, কার্তিক, পৌষ।

(খ) "পঞ্চপুষ্প" (৭ম খণ্ড)—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১৩৩৯।

(গ) "প্রচার" (১২৯৪-১২৯৬)—রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(ঘ) "বঙ্গ দর্শন" (১ম খণ্ড, ১২৭৯)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
" (২য় খণ্ড, ১২৮০) "
" (৩য় খণ্ড, ১২৮১) "
" (৪র্থ খণ্ড, ১২৮২) "
" (৫ম খণ্ড, ১২৮৪) "

(ঙ) "বঙ্গ দর্শন"—নবপর্যায় (১৩০৮, ১ম বৎসর)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।
" (১৩০৯, ২য় ") "
" (১৩১০, ৩য় ") "
" (১৩১১, ৪র্থ ") "
" (৫ম ") "
" (৬ষ্ঠ ") "
" (৯ম ") "

(চ) "ভ্রমর"—(মাসিক পত্র)—সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কয়েকটি ইংরাজী পুস্তকের তালিকা ঃ

1. Angus, Joseph.
Handbook of the English tongue: for the use of students and others. Lond., Religious tract society, 1873. 504 p.

2. (Lady) Callocott
Little Arthur's history of England. Lond., John Murray, 1897. 271 p.

3. Clarke, C. B.
(A) Classbook of Geogrphy. Lond., Macmillan & Co., 1899. 302 p.

4. Rowton, Frederic.
(The) Debates: new theory of the art of speaking; 3rd ed. Lond., Longman., 1855. 305 p.

5. Tagore, Sourendramohan.
English verses set to Hindu music in honour of His Royal Highness the Prince of Wales. Calcutta, 1875. 148 p.

6. Vidyasagar, Iswarchandra.
Exile of Sita; 8th ed. Calcutta, Sanskrit press, 1866. 131 p. Text in Bengali.

Libraries of Bengal : Rishi Bankim Chandra Granthagar & Museum (Naihati) By Kunal Sinha.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কাশীপুর ইন্‌স্টিট্যুট। ৪৩, কাশীপুর রোড। কলি-৩৬

গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৭ কাশীপুর ইন্‌ষ্টিট্যুটে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ভারতের মুক্তিকামী বীরসন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগারের তরুণ সদস্য শ্রীঅমিত হোমের লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য রাশিয়া যাত্রার প্রাক্কালে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় গত ১৩ই আগষ্ট। বিগত ১৭ই আগষ্ট গ্রন্থাগারের প্রবীণ সদস্য শ্রীবিজন মিত্রের অকস্মাৎ পরলোকগমনে গ্রন্থাগারে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

নজরুল পাঠাগার। ৪৭।১ সূর্য সেন ষ্ট্রীট। কলিঃ-৯

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, '৬৭, ৬নং এন্টনীবাগান লেনে ডাঃ আবুল আহ্‌সানের বাসভবনে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কাউন্সিলর ডাঃ কে পি ঘোষের সভাপতিত্বে নজরুল পাঠাগারের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে এক শোক প্রস্তাব নিয়ে পরলোকগত নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়:

ইলিয়া এরেনবুর্গ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অপূর্ব কুমার চন্দ, ডঃ কালিদাস নাগ ও মোহিত কুমার মৈত্র।

বিদায়ী সম্পাদক ডঃ শীতাংশু মৈত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা মোট ১৮১ জন—তন্মধ্যে আজীবন সদস্য তিনজন। বর্তমান বৎসরে ৮১ জন নতুন সদস্য হয়েছেন। বইএর সংখ্যা বর্তমান বৎসরে মোট ৩৫৩২টি; গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৩২৯০টি। উল্লেখযোগ্য যে, বইয়ের সংখ্যা দু'বছর আগে ৪০০০ অতিক্রম করে গিয়েছিল; কিন্তু গত বৎসর হিসাব নিকাশের পর দীর্ঘদিনের হারানো বহু সংখ্যক বাতিল বইয়ের নাম এবং সাম্প্রতিক হারানো/অব্যবহার্য বই বাতিল করা হয়েছে বলে এই সংখ্যা কমে গেছে। বর্তমান বৎসরে ১৪০টি বই পাঠাগারে কেনা হয়। দান হিসেবে পাওয়া যায় ১০২ টি বই। পাঠাগারে ৭ টি দৈনিক, ১৩ টি সাপ্তাহিক, ৩ টি পাক্ষিক, ৫টি মাসিক ও ২টি ত্রৈমাসিক নিয়ে মোট ৩০টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। পাঠকদের দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ৭৫ জন, দৈনিক বই ইস্যুর গড় ৩৫টি। অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আলোচ্য বছরে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম দিবসের অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

সভায় পাঠাগারের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দুইজন সহঃ সভাপতি স্থলে তিনজন সহঃসভাপতি এবং কার্যকরী সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৯ জন থেকে ২১ জন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর ১৯৬৬-৬৭ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হওয়ার পর নতুন বৎসরের পৃষ্ঠপোষক ও কর্মকর্তাসহ কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পাঠাগারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন :

পৃষ্ঠপোষকবর্গ : সর্বশ্রী কাজী আবদুল ওদুদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহ্মেদ, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

কার্যকরী সমিতি : সর্বশ্রী ডাঃ আবুল আহ্সান (সভাপতি) আবদুল কোয়ায়ুম খাঁ, আবদুল ওয়াহেব ও ডঃ শীতাংশু মৈত্র (সহঃসভাপতিগণ) কমলেন্দু গোস্বামী (সম্পাদক) সুকুমার সেন ও দীপক বসু (সহঃসম্পাদক) আনন্দ সেন (গ্রন্থাগারিক) কাজী আবদুল ওদুদ (কনিষ্ঠ) (কোষাধ্যক্ষ) এবং স্থানীয় কাউন্সিলর ডাঃ কে পি ঘোষ সহ অপর ১২ জন (সদস্যগণ)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬

আগামী ৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুঃ সপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদ এই উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং সংগ্রহশালার জন্য প্রাচীন পুঁথি, চিত্র, মূর্তি প্রভৃতি প্রার্থনা করেছেন। বার্ষিক অধিবেশনে ঐগুলি প্রদর্শিত হবে।

বিবেকানন্দ সোসাইটী। ১৫১ বিবেকানন্দ রোড। কলি-৬

সম্প্রতি বিবেকানন্দ সোসাইটী গ্রন্থাগার, ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত সোসাইটীর নিজস্ব ভবন 'স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল বিল্ডিং'-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাঠকসমাজের কাছে নিঃসন্দেহে এটি একটি সুসংবাদ, কারণ বর্তমানে গ্রন্থাগারটি অধ্যয়নের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে।

সুলেখা মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ১৭১-এ, ল্যান্সডাউন রোড। কলি ২৬

দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিমে সম্প্রতি এই লাইব্রেরীটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা হয়েছে। সকালে ও বিকেলে মহিলারা এখানে এসে ইংরেজী-বাংলা বই, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা পড়তে পারেন। কোন চাঁদা নেই।

হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী ক্লাব। কলি-৯

গত ২৫শে আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'জন বার-অ্যাট-ল সেক্রেটারী, চারজন সাধারণ কমিটির সদস্য এবং চারজন পুস্তক কমিটির সদস্য হয়েছেন। নির্বাচিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি। পুস্তক কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন : শ্রীবনমালী দাস, বার-অ্যাট-ল, শ্রীতরুন কুমার বসু (সিনিয়ার), বার-অ্যাট-ল, শ্রীদীপঙ্কর গুপ্ত, বার-অ্যাট-ল, শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ, বার-অ্যাট-ল।

২৪ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম

গত ১৩ই শ্রাবণ, '৭৪ সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ৭৬তম স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু 'বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করেন এবং স্বামী পরিক্রমানন্দ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বিগত ২০শে শ্রাবণ, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারে 'উৎকর্ষ দিবস' ও 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে। ভারতের ২০তম 'স্বাধীনতাদিবস' ও 'শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৫ই আগষ্ট। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু জাতীয় পতাকা এবং সাইকেল পিয়ন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাধুজন পাঠাগার পতাকা উত্তোলন করেন। দেশরত্ন ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের ৮৬তম জন্মবার্ষিকীও যথাযথভাবে পালন করা হয়।

পাঠাগারের সাধারণ বার্ষিক সভায় আগামী বছরের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন :—সর্বশ্রী ইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুক্মিণীকুমার সাহা (সহঃসভাপতি), গোপাল চন্দ্র সাধু (অধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ), জ্যোৎস্নারাণী সাধু (গ্রন্থাগারিক), স্বামী পরিক্রমানন্দ (হিসাব পরীক্ষক), বিধুভূষণ বিশ্বাস, শ্যামসুন্দর সাধু, অসীম নাথ, সাবিত্রীবালা দত্ত, আকবর আলী মণ্ডল, শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মণ্ডল, দুলালকৃষ্ণ সরকার ও মনীষা সাধু (সদস্যগণ)।

জলপাইগুড়ি

আজাদ হিন্দ পাঠাগার। জলপাইগুড়ি

পাঠাগারের ১৯৬৬ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীশুক্রেশ্বর সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আগামী বছরের জন্য যে কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয় তাতে আছেন ; সভাপতি—শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী, সহঃসভাপতি—শ্রীঅবনীধর গুহ নিয়োগী, শ্রীশুক্রেশ্বর সান্যাল ও শ্রীদেবব্রত ঘটক, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, সহঃসাধারণ সম্পাদক—শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী মোহিতকুমার সান্যাল, সুশীলকুমার বসু, মণীন্দ্রনাথ নাগ, অলোক মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু রায়, সুনীল কুমার রায়, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাদল সমাজদার ও অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউটাউন লাইব্রেরী। আলিপুরদুয়ার

অধ্যাপক সুধীর ঘোষ আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন লাইব্রেরীর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ভুলবশত 'গ্রন্থাগারে'র 'আষাঢ়' সংখ্যায় সংবাদটি ছাপা হয়নি।

দার্জিলিং

ব্রমফিল্ড সাব-ডিভিশন্যাল লাইব্রেরী। কার্শিয়াং

গত ১লা আগষ্ট ব্রমফিল্ড সাবডিভিশন্যাল লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ৩,৮৬৯ এবং পত্রপত্রিকার সংখ্যা মোট ৩১৩। আলোচ্য বছরের উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল, এ বছরও যথাক্রমে ১লা বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, শরৎচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী, গ্রন্থাগার দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়।

কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন: সভাপতি—সাবডিভিশন্যাল অফিসার, কার্শিয়াং, সহঃ সভাপতি—শ্রী বি কে মুখোপাধ্যায় ও শ্রী বি কে সেন, সম্পাদক—শ্রী কে কে সেন, এছাড়া ডাঃ এ কে বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশ্রী বি কে রায়চৌধুরী। জি এন রায়, বি বি রায় ও এস কে রায়। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে আছেন—শ্রী পি টি লামা। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক, দার্জিলিং, প্রধান শিক্ষিকা, সেন্ট জোসেফ গার্লস স্কুল, প্রধান শিক্ষক, পুষ্পরাণী বয়েজ স্কুল, সহঃ স্কুল পরিদর্শক, কার্শিয়াং, ও শ্রীসপ্ত বাহাদুর প্রধান।

বর্ধমান

চাণ্ডুল চয়নিকা সংঘ ও পাঠাগার। চাণ্ডুল

গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৭ চাণ্ডুল চয়নিকা সংঘে এক অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন ও নানা মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার। ধাত্রীগ্রাম

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগারে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সকালে প্রভাতফেরী ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। একজন শিশু সভ্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার। বহড়ান

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগারে ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস ও ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক শ্রীগোরক্ষনাথ রায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শ্রীপ্রণবকুমার সিংহ, শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিধুভূষণ হাজরা ও গ্রন্থাগারিক বিষয়োপযোগী ভাষণ দান করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী

গত ২৫শে আগষ্ট, '৬৭ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। ঐদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূমের জেলা সমাহর্তা শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সরকার মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভাপতি ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবসটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পূর্বে ইণ্টারন্যাশনাল সারকাস পার্টি গ্রন্থাগারে দুইশত এক টাকা দান করেন। সম্প্রতি 'সমকালীন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থাগারে আটান্নটি কবিতার বই প্রদান করেছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত গ্রন্থাগার উপহার প্রদান অনুষ্ঠান গত ২৮শে আগষ্ট শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সোভিয়েত গ্রন্থাগারে ১৫০০ বই আছে। এর মধ্যে আছে রুশ চিরায়ত সাহিত্য ও আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখকদের রচনাবলী। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কী, চেকফ, গোর্কী ও একালের শোলোকফ, এরেনবুর্গ, পাউস্তভোস্কী ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ। এছাড়া রয়েছে ভি আই লেনিনের সমগ্র রচনাবলী এবং সোভিয়েত সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের রচনাসংগ্রহ; সোভিয়েত বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গ্রন্থসমূহ। কলিকাতাস্থ সোভিয়েত কনস্যুলেটের বার্তাবিভাগের শ্রী এম এ চুডিনোফ আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার প্রদান করেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার। ৯৩ নস্করপাড়া রোড। ঘুশুড়ী

ঘুশুড়ী বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৭ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক তুষার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ সম্পাদক শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল উপস্থিত ছিলেন।

হুগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ১৬০তম জন্মতিথি উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার পাঠচক্র' ও 'চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্রে'র যুগ্ম উদ্যোগে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে।

প্রদর্শনী ৬ই সেপ্টেম্বর প্রত্যহ বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী। ত্রিবেণী

গত ৬ই আগষ্ট, '৬৭ গ্রন্থাগারের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট প্রবীণ সদস্য শ্রীসন্তোষকুমার মোদকের আকস্মিক পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থাগারে বর্তমান পুস্তক সংখ্যা মোট ৪৫৯৩, মোট সভ্য সংখ্যা ৩২১ জন, সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩৭। আলোচ্য বছরে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়: নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জয়ন্তী, শিক্ষাদিবস, ভূপেন্দ্রনাথ সোম স্মৃতিদিবস, গান্ধীজীর জন্মদিবস, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা দিবস, নেতাজী জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্রদিবস, সর্বভারতীয় সমাজশিক্ষা দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্য শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় পাঠাগারকক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

নিবেদিতা গ্রন্থাগার। ১০৩, জয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট। উত্তরপাড়া

গত ১৪ই আগষ্ট, '৬৭ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীটে লোকমাতা নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'নিবেদিতা গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিন হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ সম্পাদক এবং ঘুসুড়ী বিবেকানন্দ পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যালের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে ১৯৬৭-১৯৭০ সালের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়:

সভাপতি—শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল, সহঃ সভাপতি—শ্রীঅমরনাথ পাল, সম্পাদিকা—শ্রীচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক—শ্রীদীপঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীতরুণ কুমার দে।

মহানাদ সাধারণ পাঠাগার। মহানাদ

গত জুলাই মাসে মহানাদ সাধারণ পাঠাগারে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও গ্রন্থাগারিক শ্রীভোলানাথ কর মহাশয়ের পরিচালনায় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ৮৬তম জন্মদিবস পালন করা হয়। ঐ সভায় তাঁর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

News from Libraries.

পরিষদের নির্মীয়মাণ ভবন

কলকাতার এণ্টালী এলাকায় (পদ্মপুকুরের নিকট) সি আই টি ব্লকে পরিষদের ভবনের একতলা পর্যন্ত এখন প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা করা যাচ্ছে, অন্য কোন অসুবিধা দেখা না দিলে আগামী ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পরিষদের নতুন ভবনেই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং ঐ সময় পর্যন্ত 'গৃহ প্রবেশ' সম্ভব হবে।

গৃহ নির্মাণ তহবিল

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার, পাণ্ডবেশ্বর, বর্ধমান	১১·০০
*শ্রীঅশোক বসু	৫·০০
শ্রীরতন কুমার সাধু, ২৪ পরগণা	৫·০০
শ্রীমথুরানাথ রাউথ	৩·০০
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস	৫·০০

*যতদিন না পরিষদের ভবন সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন প্রতিমাসে ৫- টাকা করে দেবেন স্থির করেছেন।

পরিষদ কথা

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে আগষ্ট, রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রারম্ভে সমবেত সকলে দু'মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থেকে পরলোকগত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন :

অপূর্বকুমার চন্দ, দেবজ্যোতি বর্মণ, অশোক কুমার বিশ্বাস, কান্তিভূষণ রায়, অভিতাভ নন্দী রায়, ইলা মজুমদার, ডঃ কালিদাস নাগ ও পি সি গুপ্ত।

গত ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী অনুমোদিত হয়।

১৯৬৬ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

বার্ষিক কার্য বিবরণী সম্পর্কে আলোচনায় কয়েকজন অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল পরিষদের গ্রন্থাগারটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারটি একটি আদর্শ গ্রন্থাগার হওয়া উচিত। তিনি প্রস্তাব করেন, পরিষদের গ্রন্থাগারটির জন্য একজন সবেতন গ্রন্থাগারিক রাখা হোক।

সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক কার্যবিবরণী সম্পর্কে যদি কারো কিছু বক্তব্য থাকে তবে তাই বলুন। কোন প্রস্তাব দিতে হলে নিয়মানুযায়ী বার্ষিক সভার এক সপ্তাহ পূর্বে তা লিখিতভাবে দিতে হবে। তা ছাড়া শেষে বিবিধ প্রসঙ্গেও বিভিন্ন আলোচনা করা যায়।

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ বার্ষিক রিপোর্টে পরীক্ষার পাশের হারের হিসেবে গোলমাল আছে বলে দেখান।

শ্রীমতী বাণী বসু জিজ্ঞাসা করেন, গত বছর পরিষদের তরফ থেকে যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তার কি হ'ল।

পরিষদের বিদায়ী সম্পাদক উত্তরে বলেন যে, পরীক্ষার পাশের হারের ভুল সম্পর্কে সুনীল বাবু যে নির্দেশ করেছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তুষার বাবু পরিষদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন পরিষদের নতুন বাড়ী হলে, আশা করি, তার সমাধান হবে। বাণীদির জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাই, যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছিল তা ঐ বছরে কার্যকরী করা হয়নি, পরবর্তী বছরে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

১৯৬৬ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়।

অতঃপর ১৯৬৭—৬৮ সালের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

দুইজন সহঃ সভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তিনজন সহঃ সভাপতির পদ খালি থাকায় সভাস্থলেই উক্ত তিনটি নাম পূর্ণ করা হয়। অন্যান্য কর্মকর্তারাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

শ্রীমতী বাণী বসু নিম্নলিখিত তিনটি নাম সহঃ সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করেন :

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীঅনিমেশ বসু এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সহঃ সভাপতি পদের জন্য অন্য কোন নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় উক্ত তিনজনই সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠান সদস্যপদের জন্য সব জেলা থেকে মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়নি তাই সভাস্থলে প্রস্তাবক্রমে ঐ নামগুলি পূর্ণ করা হয়। প্রস্তাব করেন শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীররায় চৌধুরী। প্রতি জেলায় যত সংখ্যক আসন ঠিক ততগুলি নামই প্রস্তাবিত হয়। শুধু কলকাতার একটি আসনের জন্য দুইটি নাম প্রস্তাবিত হয়। এই দু'টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কানাই স্মৃতি পাঠাগার ও শিশির স্মৃতি পাঠাগার। ব্যালট ভোটে শিশির স্মৃতি পাঠাগার নির্বাচিত হয়। কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও সদস্যদের পূর্ণ তালিকা পরে দেওয়া হল। ব্যক্তিগত সদস্যপদের জন্য ১৮টি বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যালট ভোটে ১৫ জন সদস্য নির্বাচন করতে হয়।

শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী ও শ্রীঅনিমেষ বসু সমীক্ষক নির্বাচিত হন। ৯১ জন ভোট দেন, ৮৯টি বৈধ ভোট পাওয়া যায় এবং ২টি ভোট বাতিল হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য সর্বাধিক ভোট পান শ্রীমতী বাণী বসু (৮৫টি)।

পরিষদের আগামী বৎসরের সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাসহ নব-নির্বাচিত কাউন্সিলের পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :

সম্মানিত সদস্য

১। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বাগল　　　২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

৩। শ্রীযুক্ত এস. আর. রঙ্গনাথন।

নব নির্বাচিত কাউন্সিল

কর্মকর্তাগণ

সভাপতি : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতিবৃন্দ : „ অনাথবন্ধু দত্ত

„ প্রমীলচন্দ্র বসু

„ ফণিভূষণ রায়

„ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

„ সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
যুগ্ম কর্মসচিব : „ বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
সহঃ কর্মসচিব : „ দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী
কোষাধ্যক্ষ : „ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক : „ অশোক বসু
সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার' : „ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত সদস্য

ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন :

সর্বশ্রী অশ্বিনী কুমার সেন (২) কৃষ্ণা দত্ত (৩) গীতা মিত্র (৪) চঞ্চল কুমার সেন (৫) জহর দাশগুপ্ত (৬) তুষারকান্তি সান্যাল (৭) দিলীপ বসু (৮) নারায়ণ চক্রবর্তী (কনিষ্ঠ) (৯) প্রবীর রায় চৌধুরী (১০) বাণী বসু (১১) বিভাবসু ঘোষ (১২) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ (১৩) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, (১৪) সুনীল বিহারী ঘোষ (১৫) হিরণ কুমার দত্ত।

জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য

বিভিন্ন জেলা থেকে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন :

ক) কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (৩) শিশির স্মৃতি পাঠাগার।

খ) কুচবিহার—প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী।

গ) চব্বিশ পরগণা—(১) জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর (২) রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার।

ঘ) জলপাইগুড়ি—বাবুপাড়া পাঠাগার।

ঙ) দার্জিলিং—ব্রমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী।

চ) নদীয়া—কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী।

ছ) পশ্চিম দিনাজপুর—জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট।

জ) পুরুলিয়া—জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া।

ঝ) বর্ধমান—(১) চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির, শ্রীখণ্ড (২) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার।

ঞ) বাঁকুড়া—ধ্রুব সংহতি, বালসী।

ট) বীরভূম—রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, সিউড়ী।

ড) মালদহ—প্রগতি সংঘ, ঋষিপুর।

ঢ) মেদিনীপুর—রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাদল।

ণ) হাওড়া—(১) তুইল্যা মিলন মন্দির (২) সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া।

ত) হুগলী—(১) জেলা গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া (২) গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী।

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্য

নিম্নলিখিত বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি ও কাউন্সিলে নির্বাচিত হন :

১। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
২। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৪। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
৫। জাতীয় গ্রন্থাগার
৬। পশ্চিমবঙ্গ পৌরসংস্থা পরিষদ
৭। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৮। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ
১০। বঙ্গীয়পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি
১১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১২। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১৩। বিশ্বভারতী
১৪। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১৫। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্বাচনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেলে ইউ-এস-আই-এস'-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী লোয়া ফ্ল্যানাগান গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৬৭ পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার টেপ রেকর্ড পরিষদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর হস্তে অর্পণ করেন। সমবেত সকলের তুমুল করতালি ধ্বনির মধ্যে এই দান গৃহীত হয়।

এরপর একদিকে যেমন ব্যালট ভোট গণনা চলে অপর দিকে একের পর এক বিভিন্ন সদস্য বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা

প্রথমেই শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার আইন কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আমরা আজও কোন খসড়া রচনা করে দিতে পারিনি। নবদ্বীপ সম্মেলনে শ্রী এস, আর, রঙ্গনাথনের একটি খসড়া আইন উপস্থিত করা হয়েছিল। Pay & Status সম্পর্কে আরও ডেপুটেশন যাওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে সরকারকে ঠিকভাবে বোঝানো দরকার। জেলা গ্রন্থাগারকে এখনো কাউন্সিলে আনার ব্যাপারে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় না। এজন্য জেলায় জেলায় সক্রিয়ভাবে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডকে চাপ দিতে হবে প্রত্যেক স্কুলে একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য। ডে-স্টুডেন্টস্ হোম-এর দাবীগুলি আরও সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। ছাত্রদের মাধ্যমেও আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাস্টার্স' ডিগ্রি কোর্স' খোলেন তার জন্য চেষ্টা করা দরকার।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আমরা কোন খসড়া তৈরী করে দিতে পারিনি পরিষদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলাম।

আইন প্রণয়নে আমাদের নিজেদের যেখানে অগ্রণী হওয়ার কথা সেখানে বিগত কয়েক বছরে আমাদের যথেষ্ট গাফিলতি ছিল। Pay & Status নিয়ে বিগত নয় বছর ধরে আন্দোলন হচ্ছে। ডেপুটেশন দেওয়া নির্ভর করে ডেপুটেশনের সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে রাজী হবেন সেই কর্তৃপক্ষের ওপর। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস হোম স্থাপনের আন্দোলন সম্পর্কে আগামী কার্যকরী সমিতিকে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। কলেজ লাইব্রেরীগুলি ভালভাবে পরিচালিত হওয়াও প্রয়োজন। মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স খোলা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র লেখা ও সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন, খসড়ার অভাবে আইন হচ্ছে না একথা ঠিক নয়। সরকারের যদি আইন করার ইচ্ছে থাকত তবে অনেক আগেই তা করতেন। তাছাড়া একটা খসড়া করে দেওয়াও হয়েছিল। আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি একবার আমাদের বলেছিলেন, আপনারা আইন পাশ হোক এটা চাইতে পারেন, কিন্তু আইন তৈরী করবার আপনাদের কি অধিকার আছে। আসলে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি essential service বলে গণ্য করা হচ্ছে না—সামাজিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। আইন প্রণয়ন করবার সদিচ্ছা যদি এম-এল-এ-দের মধ্যে না থাকে তবে প্রস্তাব পাশ করেও কিছু হবে না।

তিনি অধিক সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস্ হোম স্থাপনের জন্য আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, ডে-স্টুডেন্টস্ হোম শিক্ষা সমস্যাকে পরিপূর্ণভাবে সমাধান করার জন্য স্থাপিত হয়নি। কলেজ লাইব্রেরীগুলিকেই উপযুক্ত করে গড়তে হবে। তাছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের ছাত্রগণ ডে-স্টুডেন্টস্ হোমের সুযোগ পাচ্ছেন না।

শ্রীসুধাংশু দে (হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগার কর্মীদের সাম্প্রতিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জেলা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম বর্ধিত না হলে বর্তমান আর্থিক সংকটে তাঁদের চরম হতাশার মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। এই জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা এখনো জুন মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না।

শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) নতুন কার্যকরী সমিতিতে যাঁরা আসছেন তাঁরা যেন গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শ্রীতপন সেনগুপ্ত জানতে চান, পরিষদ প্রকাশিত 'বাংলা শিশু-সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী' বইটিতে পরবর্তী সংযোজন ও সংশোধনের কি ব্যবস্থা হচ্ছে। এই বইটির বিক্রয় সংখ্যাই বা কত ?

শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য—ডেপুটেড গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে যাতে অন্ততঃ টিউশন ফি মকুব করা যায় তার বন্দোবস্ত যেন পরিষদ করেন।

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ—ছাত্র-ছাত্রীরা ৫৲ টাকা করে ডেভলপমেণ্ট ফি দেন—এছাড়া ভর্তি ফি, টুইশন ফি এবং প্রসপেক্টাস-এর জন্য দিতে হয়। পরিষদের খরচ চলছে ট্রেনিং-এর টাকা দিয়ে। এই ৫৲ টাকা ডেভলপমেণ্ট ফি কেন নেওয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের টাকার দিক দিয়ে কিছু লাঘব করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এজন্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রতিটি সদস্য যদি ১০জন করে সদস্য বাড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে অনেক সদস্য পাওয়া যাবে।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী—ট্রেনিং-এর পরীক্ষক ও শিক্ষক মহাশয়গণ যদি তাঁদের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদি কিছু কম করে নেন তাহলে টিউশন ফি কমান যায়। (তুমুল করতালিধ্বনি)।

শ্রী এম, এন, নাগরাজ—গবর্ণমেণ্ট থেকে ট্রেনিং-এর জন্য আমরা টাকা পাচ্ছি—তা অন্যভাবে খরচ করা উচিত নয়। পরবর্তী কার্য বিবরণীতে ট্রেনিং কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে যেন দেখান হয়।

শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক—কর্পোরেশন থেকে গত দু' বছর আমাদের লাইব্রেরী কোন টাকা পাননি। গ্রাণ্ট-এর টাকা পেতে দেরী হয়। এজন্য পরিষদের কিছু করণীয় আছে।

শ্রীমতী বাণী বসু—পরিষদের আয়ের ভাগ বাড়িয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যদের চাঁদা বাড়ানো প্রয়োজন। জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য আমরা আন্দোলন করছি কিন্তু কতজন জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য? ওজন দরেও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার দাম ৪৲ টাকা হতে পারে না।

শ্রীপ্রবীর দে—নতুন কাউন্সিল সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলছি, পরিষদের সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পড়বার সুযোগ পান তার জন্য তাঁরা যেন চেষ্টা করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায়—ট্রেনিং কমিটির টাকায় পরিষদের খরচ চলে বলে যাঁরা মনে করছেন তাঁরা একটু ভুল করছেন যে ঘর-ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন—লাইব্রেরীর বই ক্রয় ইত্যাদি ট্রেনিং-এর খরচের মধ্যে ধরা হয়নি। ট্রেনিংএর আয় সবটাই ট্রেনিংএর জন্য ব্যয় করতে হবে এমন কোন কথা নেই। পরিষদের অন্যান্য কাজে কি ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে না। পরিষদ যে ট্রেনিং দিচ্ছে সেই ট্রেনিং নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে তাও পরিষদের দেখা কর্তব্য। আর সেজন্যই পরিষদকে আন্দোলন করতে হয়। সুতরাং এভাবে দেখা ঠিক হবে না। আর এইসব খুঁটিনাটি হিসেব বার করতে হলে কস্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট রাখতে হবে।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়—ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে পরিষদের আন্দোলন করা নিশ্চয়ই কর্তব্য। ডেভলপমেণ্ট ফি নেওয়ার ইতিহাস হল, সরকারী সাহায্য পাওয়ার সময় দেখাতে হয়েছিল—২০০ ছাত্রের কাছ থেকে ৫৲ টাকা করে ফি নিয়ে

পরিষদের ১০০০৲ টাকা আয় হয়। তাছাড়া ট্রেনিং-এর জায়গার জন্য ব্যয় আছে—এই ফি সেই ব্যয় বহনের সহায়তা করে।

শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল—গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের টাকা ট্রেনিং-এর ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে এরূপ বৈষম্যমূলক মনোভাব থাকা উচিত নয়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই আন্দোলন হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হয়—এই কমপ্লেক্স-এর প্রতিকারের জন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে হবে। ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আমাদের সচেতনতা নেই। ১লা আগষ্টের মিছিলে বড় বড় গ্রন্থাগারিকদের দেখা গেল না।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য– গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে শ্রীমতী বাণী বসু যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। মফঃস্বলের এইসব গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা এত কম বেতন পান যে অনেকে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত খেতে দিতে পারেন না; তাঁরা পরিষদের সদস্য হবেন কি করে? সদস্য যাতে বাড়ানো যায় সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করা উচিত। প্রত্যেকে একজন করে সদস্য করে দিলেও অনেক কাজ হয়। মফঃস্বলের যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা ডেপুটেশনে ট্রেনিং নিতে চান তাঁরা যাতে সবেতন ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান তা দেখা উচিত।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী—গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের দুরবস্থার কথা ভাবা যায় না। তাঁরা অনাহারে-অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন—তবু তারই মধ্যে আন্দোলনের জন্য তাঁরা ২৫ পয়সা ৫০ পয়সা করে তুলে ২৫০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। অনেকে গৃহ-নির্মাণ তহবিলে সাহায্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা ৫০০ টাকা ১০০০ টাকা মাইনে পান, উচ্চ বেতনে অধিষ্ঠিত বহু গেজেটেড অফিসার, জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এ পর্যন্ত কত সাহায্য পাঠিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে কতজন পরিষদের সদস্য? এক জাতীয় গ্রন্থাগারেই পাঁচ শতাধিক কর্মী আছেন তাঁদের কতজন পরিষদের সদস্য? আন্দোলন তাই বলে পিছিয়ে থাকবে না। বাঁচার দাবীর আন্দোলন এগিয়ে চলবে। এ থেকে ফেরার কোন রাস্তা নেই। তিনি পরিষদের গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

শ্রীমতী বাণী বসু—বেতন ও মর্যাদার আন্দোলন ছাড়াও পরিষদের অন্যান্য কাজ আছে। 'শিশু গ্রন্থপঞ্জী' প্রতি বছর up-to-date করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে টাকা পাওয়া যেত। Directory, Select list, শিশু-গ্রন্থপঞ্জী এগুলো সবই up-to-date করা প্রয়োজন। আন্দোলন নিশ্চয়ই আমরা করব। কিন্তু অন্যান্য কাজও আমাদের করতে হবে। ২০ বছর জাতীয় গ্রন্থাগারে কাজ করে আমি নিজে খুব ভাল position-এ নেই। জাতীয় গ্রন্থাগারে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট অনেকে সর্টারের কাজ করে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কিছু কিছু কর্মী অন্ততঃ পরিষদের সদস্য আছেন।

সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বলেন, প্রত্যেক বক্তব্যেই কিছু না কিছু যুক্তি আছে। অসহিষ্ণু হলে আমাদের চলবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সকল প্রকার কর্মীর সমবেত

প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া সকলেরই কর্তব্য। তবে সব সময় সংখ্যাই সব নয়, গুণগত দিকটাও বিচার্য। পরিষদের সামনে অনেক কাজ আছে ঠিকই, কিন্তু কর্মীরও অভাব আছে। আইন প্রণয়নের কথাটি বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। সার্টিফিকেট কোর্স থেকে ছাত্ররা কতটা উপকৃত হচ্ছেন সেটাও ভেবে দেখা উচিত। আত্মসমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। পরিষদের গলদ কোথায় আছে দেখতে হবে। এসব বিষয়ে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিদায়ী সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তার জবাবী ভাষণে বলেন, আত্ম-সমালোচনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আমরা যৌথ পরিবারভুক্ত—ঝগড়াঝাটি আমাদের মধ্যে হয়, কিন্তু ঐক্য বজায় থাকে। গ্রন্থাগারের প্রতি সামাজিক সমর্থন নেই বলে আমাদের সকল আন্দোলন ব্যর্থ হয়। বেতন ও মর্যাদার আন্দোলনও কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণ থেকে আমরা সরে আসছি—আমাদের জনমত তৈরী করতে হবে। কটা গ্রন্থাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন? আমাদের কর্মসূচীকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তন করা দরকার। আইন সম্পর্কে সুষ্ঠু চিন্তা প্রয়োজন—নিজেরা বুঝে অন্যকে বোঝাতে হবে। ডে-স্টুডেন্টস্ হোম ও কলেজ লাইব্রেরীর মধ্যে কোন বিবাদ নেই। জেলায় জেলায় সফর করতে হবে। শিশু গ্রন্থপঞ্জীকে আরও ভালভাবে বর্তমানোপযোগী করা প্রয়োজন। অন্যান্য জায়গায় কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সেরকম প্রথা প্রবর্তন করতে পারলে ভাল হয়। সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ওপরই পরিষদের সাফল্য নির্ভর করে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা সমাপ্ত হয়।

Association Notes

তিনকড়ি দত্ত স্মৃতি পদক

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর '৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় ১৩৭৩ সালে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য স্বর্গত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নামে যে পদক দানের সিদ্ধান্ত হয়েছে তার প্রাপকের নাম চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়েছে। এই বছরের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখার জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত পুরস্কারটি পাবেন। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল।

অভিনন্দন

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দু বিকাশ পাল ১১৲ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে কুপনে লিখেছেন :

"আজ পর্যন্ত আমাদের পাঠাগার সরকারী অনুদান না পাওয়ার জন্ম আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতেছি। তবুও পরিষদের গৃহ-নির্মাণ কল্পে আমাদের সামান্ত সাহায্য পাঠাইলাম।"

প্রতিটি দানের পেছনেই আছে এমনি পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয়। পরিষদ ভবনের জন্ত যাঁরা এ পর্যন্ত অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সার্টিফিকেট কোর্স

সপ্তাহান্তিক গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শ্রেণীতে (ডিসেম্বর—আগষ্ট) ভর্তি হইবার আবেদনপত্র ৬ই নভেম্বর, ১৯৬৭ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। আবেদনপত্র (০·২৫ পঃ) ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদের কার্যালয়, ৩৩ হুজুরীমল লেন কলিকাতা-১৪ হইতে রাত ৬-৩০ হইতে ৮-৩০ পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পয়সার ৭টি ডাক টিকিটসহ স্ব-ঠিকানা লিখিত খাম পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যাইবে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইন্টার-মিডিয়েট পাশ। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন।

সিলেবাস ০·৫০ পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক—
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ



৩



২



১

গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌন মিছিল : ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭। বিভিন্ন চিত্রের পরিচয় : (১) সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে গ্রন্থাগার কর্মীদের জমায়েতে বক্তৃতা করছেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। (২) এসপ্ল্যানেড ইস্টে মিছিলের সম্মুখভাগ পুলিশ বেষ্টনীর কাছে পৌঁছেছে। (৩) রাজপথে মিছিল এগিয়ে চলেছে। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত।



১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে দক্ষিণে) শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত।



১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনছেন। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত।



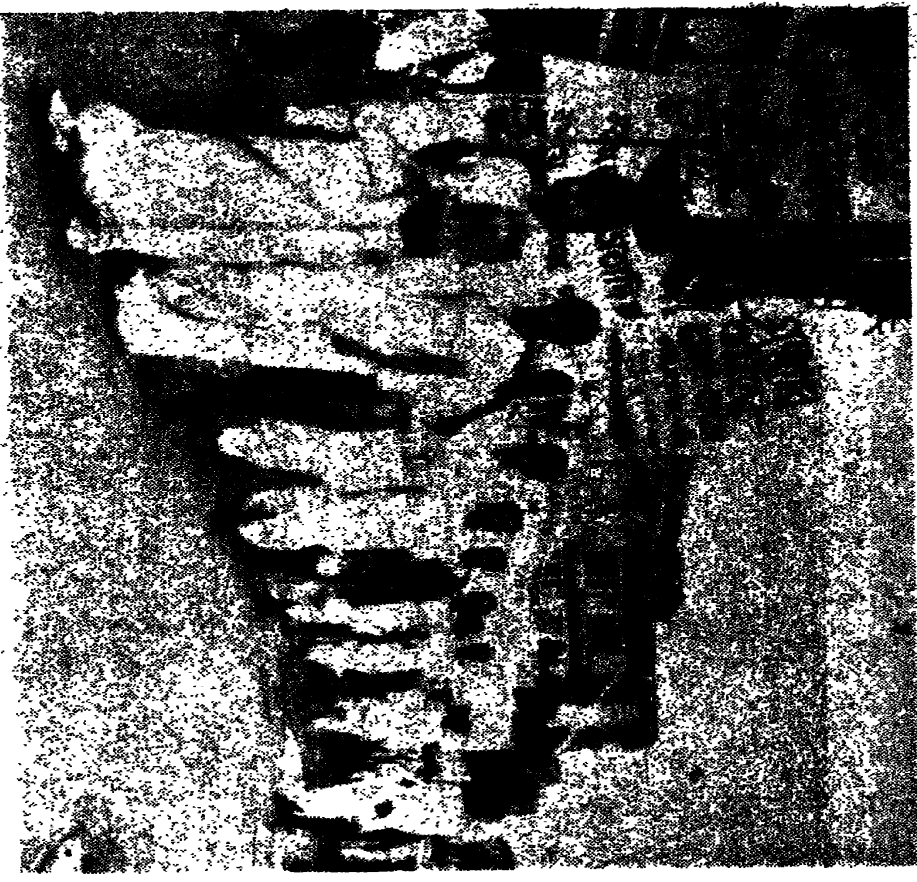
[illegible]



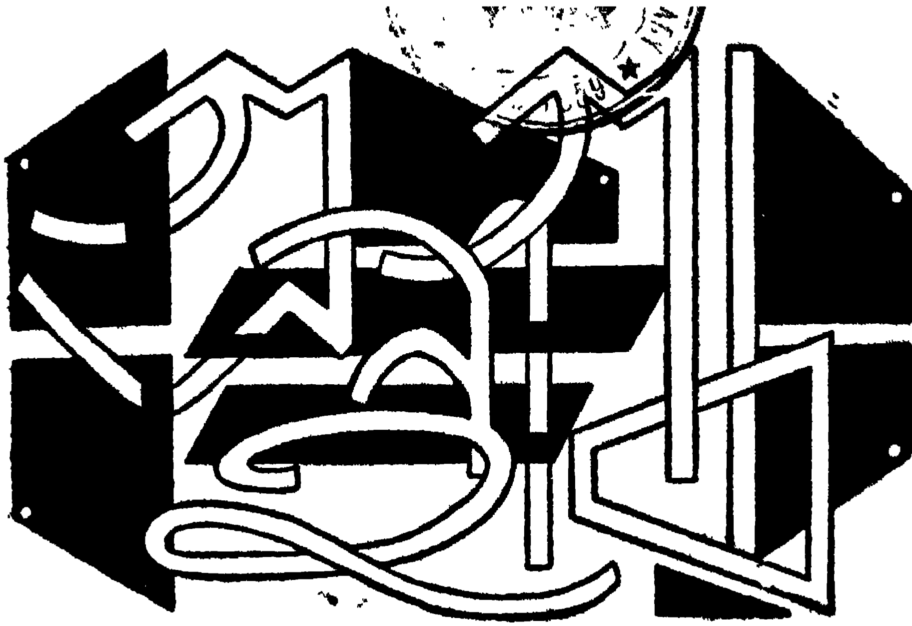
৬



৫



গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌন মিছিল : ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭। বিভিন্ন চিত্রের পরিচয় : (৪) মিছিলের মুখগুলি—ফটো : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত। (৫) পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত মিছিলের পদাতিকগণ রাজপথে বসে পড়েছেন। (৬) সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল বেরিয়ে আসছে। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭৪

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫\ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০\ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০\ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫\ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০\ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫\ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০\ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬\ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০\ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫\ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক-৪\ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫\ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬ | ১৩৭৪, আশ্বিন

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার আন্দোলন কোন পথে ?

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকগণ পাশ্চাত্য দেশগুলির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত তিন চার দশকের মধ্যে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং কয়েকটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদও স্থাপিত হয়েছে। এই কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারেরও প্রসার ঘটেছে। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে, যে জন্য আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের ফলে গ্রন্থাগারের একটি সামাজিক চাহিদা দেখা দিয়েছিল এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও প্রসার ঘটেছিল। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকালে শাসন কর্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার প্রসারের কথা চিন্তা করেন নি। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে কয়েকটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার প্রসারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব যুগেই দেশীয় রাজ্য বরোদার সয়াজীরাও গায়কোয়াড় নিজ রাজ্যে যে আদর্শ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে আজ পর্যন্ত আমরা সক্ষম হইনি।

বৃটেনে ১৮৫০ সালেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে—কিন্তু ভারতবর্ষ কয়েক দশক ধরে চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে সক্ষম হয় নি। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে অবিলম্বে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন পাশ করা উচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি কেন এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারছেন না তা ভেবে দেখা দরকার। ভারতবর্ষে ৩০,০০০-এর বেশী পাবলিক লাইব্রেরী, অর্ধ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কয়েক হাজার কলেজ লাইব্রেরী, বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য গবেষণা গ্রন্থাগার, সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে যত গ্রন্থাগার কর্মী কর্মরত রয়েছেন তাতে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর বৃহত্তর গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি অনেক পিছিয়ে আছে দেখা যায়। এ দেশের

গ্রন্থাগার পরিষদগুলি রক্তাল্পতায় (anaemia) ভুগছেন। বলা হয়ে থাকে যে, প্রধানতঃ কর্মীর অভাব এবং অর্থের অভাবের জন্যই আমরা বৃটেনের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন বা আমেরিকার লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের মত শক্তিশালী হতে পারছি না।

আমাদের মনে হয়, শুধু কর্মীর অভাব এবং অর্থের অভাবই যে আছে তাই নয়, আরো একটি অভাবও আছে, সেটি হল আন্তরিকতার অভাব। আমরা যে কথা বলি সে কথা বিশ্বাস করি না। তাই দেখা যায়, গ্রন্থাগার পরিষদগুলির সম্মেলনে অনেকবার অনেক সমালোচনা হয়, বহু প্রস্তাবও পাশ হয়, কিন্তু পরে যা চলছিল তাই-ই চলতে থাকে, পরিষদের কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন ঘটে না। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলি যদি উদ্যোগী না হন তবে এ কাজ কে করবে। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে নিশ্চয়ই এজন্য একযোগে কাজ করতে হবে। আর গ্রন্থাগার পরিষদগুলি যদি সাধারণ কর্মীদের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকেন তবে পরিষদগুলি কি করে শক্তিশালী হবে। গ্রামের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কথাই আমাদের ভাবতে হবে। গণতান্ত্রিক ভারতের সকল নাগরিক যাতে সমানভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান সেজন্য আইন প্রণয়নের জন্যও আমাদের সক্রিয় হতে হবে। দেশে কুশলী ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বোধ হয় অভাব নেই। টেকনিক্যাল ও অ্যাকাডেমিক দিকেও আমরা বোধ হয় খুব পিছিয়ে নেই। ডঃ রঙ্গনাথনের চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে কয়েকটি ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং উচ্চতর গবেষণা কার্যও পুরাদমে চলেছে। ইতস্তত কিছু উচ্চ বেতনের পদ সৃষ্টি হলেও সাধারণভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। চাকুরীর নতুন নতুন সুযোগও খুব বেশী বাড়েনি। এদিকে দেশব্যাপী দলে দলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বছর বছর পাশ করে বেরিয়ে আসছেন। এঁদের ভবিষ্যৎ কি হবে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি কি সে সম্পর্কে ভাবছেন? শতকরা ৭০ ভাগ নিরক্ষর লোক অধ্যুষিত দেশের লোকের কাছে গ্রন্থাগারের আবেদনই বা কতদূর কি হতে পারে তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এক সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দেশে অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন— অর্থের বাধা, কর্মীর বাধা অগ্রাহ্য করে দেশের লোক অর্থ সংগ্রহ করে, স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে গ্রন্থাগার চালিয়েছেন। কিন্তু এখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের নব পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের জটিলতা দেখা দিয়েছে—বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যাও জড়িত। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর যদি উপযুক্ত বেতন না মেলে, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ না থাকে, চাকুরীর নিরাপত্তা না থাকে এবং জীবনে উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে এ বৃত্তির ভবিষ্যৎ কি? গ্রন্থাগার পরিষদগুলি এ সব সমস্যা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না।

Editorial : Whither library movement ?

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ তৃতীয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলী হইতে প্রেরণা পাইয়াই হুগলী জিলার গ্রন্থাগার কর্মীরা আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারার অনুসরণ-ক্রমে হুগলী জিলার গ্রন্থাগারসমূহকে সংগঠিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উদ্যোক্তারা এই উদ্দেশ্যে হুগলী জিলার অন্তর্গত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারসমূহকে কর্মতৎপর হইয়া সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানান। ফলে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের (১৩৩১ বঙ্গাব্দের) ২৮শে ও ২৯শে মার্চ, ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র, শনি ও রবিবার হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হুগলী জিলাই প্রথমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করিল বলিয়া হুগলী জিলাকেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা হয়। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান—প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ, পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই, আমরা জনক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ জন্মলাভ করে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মের কয়েক মাস পরে। সেই দিক থেকে হুগলি জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ 'বয়সে বাবারও বড়'।

সম্মেলনের দিন বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে জিলার নানা স্থান হইতে প্রতিনিধি-বর্গ আসিয়া জড় হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্য ও তৃতীয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থলাভিষিক্ত সভাপতি তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে প্রচুর দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ইংরেজিতে ভাষণ দেন। উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল:

'পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নয়ন এবং সম্ভব হইলে ইহার কাজের গণ্ডির প্রসারণ বিশেষ করিয়া জ্ঞান ও সমাজসেবার বিস্তার সাধনার্থে উপায় উদ্ভাবনই আমাদের এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেক উচ্চ আদর্শ ও সুকৃতির বিবরণ রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে দেশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে ছেদ পড়ে। ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন মহর্ষিরা ব্রহ্মার প্রেরণায় পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর কূলে কূলে বৈদিক স্তোত্র সুর করিয়া উচ্চারণ করিতেন। এই মহর্ষিরা মানুষের কাছে ভগবানের বার্তা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার হৃদয়কন্দরে আলোক বর্তিকা জ্বালাইয়াছিলেন, এই প্রত্যাদেশাবলী লিপিকৌশল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত লোকের মুখে মুখেই

বিচরণ করিত। পাণ্ডুলিপিগুলি তালপাতা বা ভোজপাতায়ই কালিকলমের সাহায্যে লেখা হইত। গ্রন্থ বা পুঁথির নামেই ছিল ইহাদের পরিচয়। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের মূল ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন গ্রন্থাগার জিনিষটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারণা হইতেই উদ্ভূত। সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ভারতে ইহা একেবারে নূতন জিনিস নয়। ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি—যথা, তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ও দণ্ডপুরী প্রভৃতিতে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির সংগ্রহালয় ছিল। হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধবিহার এবং মঠও সযত্নে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সংরক্ষণ করিত। নালন্দার নয়তলা 'রত্নোদধি' বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ চালাইত এবং তৎকালে মূল্যবান পাণ্ডুলিপির সর্বাধিক সংগ্রহের জন্য ইহার গর্ব ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬২৯ ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষবর্ধন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে ভারতের এক সমৃদ্ধির যুগে হিন্দু সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি কয়েকবার নালন্দার গ্রন্থাগার দেখেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইহার অধঃপতন হয়। পালরাজাদের আমলে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর সুসজ্জিত গ্রন্থাগার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বক্তিয়ার উদ্দিন খলজীর আক্রমণে ঐ গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কতকগুলি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি লইয়া নেপালে সরিয়া পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া সেকালে রাজারাজড়া এবং অভিজনবর্গেরও প্রাসাদের সংলগ্ন গ্রন্থাগার থাকিত, প্রাচীন মনীষীদের এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদেরও গ্রন্থাগার ছিল। হিন্দু মন্দিরে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ একটি ধর্মকার্য বলিয়া গণ্য হইত। ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করিয়া নকল করা ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন কার্যের অঙ্গীভূত। জৈন ভিক্ষুদের উপরও ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপিকে সযত্নে রক্ষা করার নির্দেশ থাকিত। পশ্চিম ভারতের ওসাম্বে, জসলমীড ও সুরতের জৈন গ্রন্থাগারে এখনও ঐ ধরনের পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশের রাজত্বকালে জনগণের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়া পূর্বাপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। ভারতবিদ্যার গবেষকরা এই সময়কে হিন্দুর পুনর্জাগরণের যুগ বলিয়া থাকেন।

গুপ্ত রাজত্বের অবসানের পরে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং ফিরোজ শাহ এতদর্থে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের অধীনস্থ হিন্দু সীমান্ত রাজারাও জ্ঞানবিস্তারে মুক্তহস্তে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহারা শুধু পাণ্ডুলিপিই সংগ্রহ করিতেন না, তাঁহাদের দরবারে বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকেও পোষণ করিতেন এবং বৃত্তি দিয়া জ্ঞানান্বেষীদের উৎসাহ দিতেন। একাদশ শতাব্দীতে ধারার রাজা ভোজেরও চমৎকার পুস্তকসংগ্রহ ছিল। চালুক্যরা মালব জয় করিলে এই

মূল্যবান পুস্তকগুলি তাঁহাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজা বিশালদেব ইহাদের সংরক্ষণের জন্য বহু টাকা ব্যয় করেন। বিশালদেবের গ্রন্থাগারস্থ রামায়ণের একখানি পাণ্ডুলিপি জার্মানীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে। জার্মানীর বহু গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রাখা হইয়াছে। নেপাল, জম্মু, মহীশূর, বিকানীর ও আলোনীরে পুরান পাণ্ডুলিপির উৎকৃষ্ট সংগ্রহ রহিয়াছে। তাঞ্জোর প্রাসাদের গ্রন্থাগার ১৮০০০ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, মাদ্রাসের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, পুণার ভাণ্ডারকর লাইব্রেরি, সারভ্যাণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি এবং বড়োদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজদের মধ্যে বেদপাঠ সীমাবদ্ধ থাকিলেও যাহাদের কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না তাহাদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হইতে, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। নিরক্ষর জনগণের রচিত গাথা অলিখিত অবস্থায় সঙ্গীতের আকারে অতীত হইতে চলিয়া আসিয়া লোকের মুখে মুখে পুরুষপরম্পরায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেশের জনগণের আশ্চর্যজনক মানসিক উৎকর্ষের প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গাথায় বর্ণিত মানুষের আবেগ, গভীর দুঃখ এবং সাদামাঠা কাহিনী হইতে নিরক্ষর জনগণের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় মিলে। সেকালে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা শুধু অক্ষরজ্ঞান, উহার বিন্যাস ও ব্যাকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুপ্ত মানসিক বৃত্তির উন্মেষ সাধন দ্বারা সুরাষ্ট্রিক পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহৎ দান যে সৎ জীবন তাহা যাপনে জনগণকে প্রণোদিত করা।

জনগণের প্রাথমিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। বই, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তার দ্বারা ইহাকে পূরণ করিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগার একটি আনুষঙ্গিক যন্ত্র। আজকালকার দিনে ইহা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারকে শুধু পুস্তকের সংগ্রহালয় বলিয়া গণ্য করা হয় না, দেশবাসীর জীবনের মর্মস্থল বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইতেই আসে মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মার্জিত রুচি সম্পর্কীয় সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার প্রেরণা। এদেশের ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে নগরে, সহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়াইয়া তোলার কাজে বিশেষ সহায়তা করে।

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের পথে আমেরিকা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্য এই বিষয়ে অগ্রণী। আমেরিকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মহামান্য গায়কোয়ার এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধার

স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে* (১৩১৮ বঙ্গাব্দে) বরোদায় গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া রাজ্যের ভিতরে সর্বত্র সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও শিশু গ্রন্থাগারের পত্তন করা হইয়াছে। ভারতে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারের মাধ্যমে লোকশিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপনও মহামান্য গায়কোয়ারেরই কীর্তি।

এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ইংলণ্ডেও জনশিক্ষা বিকিরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকায়ও জনশিক্ষা বিকিরণের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে আমেরিকার মত সুবিশাল ও সুপরিকল্পিত চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। জনশিক্ষা বিস্তারের এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভারতের অনেক অংশে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

নিরক্ষর জনগণের সুবিধার্থ বরোদার চাক্ষুষী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষার কাজ চালান হয় চলচ্চিত্র, ছায়াচিত্র, ছাপান ছবির কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে। বরোদার গ্রন্থাগার পরিচালন সম্পর্কে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে যুবকদিগকে ভাল গ্রন্থাগারিকরূপে গড়িয়া তোলার জন্য বিনাবেতনে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বোম্বাইর 'সোশ্যাল সারভিস লীগ' চলন্ত গ্রন্থাগারের পত্তন করিয়াছে। ইহা দ্বারা আমেরিকা ও বরোদার ব্যবস্থামত জনগণ দেশীয় ভাষার বই পড়িবার সুবিধা পায়। ইহা পঞ্চাশটির উপর গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে এবং পাঁচশটি গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। 'মহারাষ্ট্র বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার সমিতির' উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ অগ্রসর হইতেছে। প্রায় দেড় শত পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমাদের সহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপনে বাংলার যুবকগণই উদ্যোগী হয়; কিন্তু সংসারী হইলেই তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

সকল প্রধান গ্রন্থাগারেই অন্ততঃ বালক, মহিলা ও নিরক্ষরদের বিভাগ থাকা উচিত। সমাজসেবা এবং গ্রামের পুনর্গঠনকেই গ্রন্থাগারসমূহের কার্যাবলীর অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে। গ্রন্থাগার হইল জ্ঞানভাণ্ডার এবং সকলকেই ইহা হইতে উপকার লাভ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরাষ্ট্রিকসুলভ গুণাবলী অর্জন করিবার পক্ষে এইগুলি হইবে এক একটি শিক্ষাক্ষেত্র। ইহার চতুঃসীমানায় যেন বাদ-বিসম্বাদ স্থান না পায়। নরনারী, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে পরমতের প্রতি উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতা অভ্যাসের জন্য এইগুলি হইবে সকলের মিলনক্ষেত্র। গ্রন্থাগারসমূহ হইতে সবকিছু ভাল ও পবিত্র জিনিসের উদ্ভব হইবে এই কারণে ইহাদিগকে বিদ্যাদেবীর পবিত্র মন্দির বলিয়া মনে করা উচিত।"

* ভুলক্রমে প্রথম প্রবন্ধে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ লেখা হইয়াছে

সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, চারুচন্দ্র মিত্র, হরিহর শেঠ, হরিদাস গাঙ্গুলী প্রভৃতি। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিন বিকালবেলা সম্মেলনক্ষেত্রে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়। তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রীচ্যাপম্যান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারের পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তাঁহাকে সম্মেলনের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানান।

প্রদর্শিত জিনিষের মধ্যে ছিল বড়োদার মহামান্য গায়কোয়ার কর্তৃক প্রেরিত পুস্তক ও প্রাচীর পত্রাদি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে প্রদত্ত গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত বিদেশী ও ভারতীয় বই এবং হুগলী জিলার বিবরণ বিষয়ক বই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কাঠের অক্ষরে ছাপা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'দিগগর্শন' ও 'সমাচার দর্পণের' পুরান সংখ্যা, রাধানগর হইতে প্রেরিত রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর ও অন্যান্য বই, চন্দননগর হইতে শ্রীহরিহর শেঠ কর্তৃক প্রদত্ত জিনিস, মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'ঈস্টার্ণ ভয়েস', ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল', প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাময়িকী 'পূর্ণিমা', গ্রামীণ বাংলার অবস্থা এবং হুগলী জিলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান সম্পর্কে তাঁহার লিখিত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, কবি শ্রীধর কথকের হস্তাক্ষর এবং সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে সাতগাঁওতে প্রস্তুত একটি সুমার্জিত বাঁশের বাকস।

পরের দিন হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত উহাতে আপত্তি তোলেন। তৎপর নলিনী বাবুর পরামর্শ অনুসারে প্রস্তাবটির পরিবর্তন সভাপতি মহাশয় মানিয়া লইলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ডগুলিকে গ্রন্থাগারে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করার অনুরোধ জানাইয়া এবং দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহার্থ একটি তদন্ত সমিতি গঠনের জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে তৎপর হইতে বলিয়াও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় উপস্থিতমত বাংলায় তাঁহার ভাষণ দিলে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভাষণটি এই—

"ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনাদের সময় ক্ষেপণ করিব না। গুটিকয়েক কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি বক্তা নই এবং এই উপলক্ষে আমার মত লোকের পক্ষে বক্তৃতা পূর্বে লিখিয়া আনাই উচিত ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীচ্যাপম্যান গতকাল নিজ নিজ ভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার পরে পুস্তকের উপকার ও সার্থকতার গুণকীর্তনচ্ছলে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। ইংরেজ

কবি জন মিলটনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থের বিখ্যাত কথাগুলি আমার মনে পড়িল। 'ভাল বই হইল একটি মহৎ আত্মার বহুমূল্য বুকের রক্ত, যাহা এই জীবনের পরে আর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে ধ্বংসহীন অবস্থায় সংরক্ষিত হইয়া আছে। একটি ভাল বইকে নষ্ট করিলে একটি মানুষকেই হত্যা করা হয়।' আজকালকার দিনে যখন পুস্তক নিষিদ্ধ করার হিড়িক পড়িয়াছে তখন উপরোক্ত মন্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। আমরা এখানে অতীতের এবং পরবর্তী শতাব্দীর বড় বড় গ্রন্থাগারের কথা শুনিলাম। শ্রীচ্যাপম্যান দুঃখ করিলেন যে আমাদের দেশে বড্‌লিয়ান লাইব্রেরি (অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) এবং বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি-র মত কোন গ্রন্থাগার নাই। আমাদের দেশে আমরা নিশ্চয়ই বহু বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী চাই, কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত ঐরূপ একটিও সৃষ্টি করা যায় না। ইংলণ্ডে একটি আইন আছে যে ইংলণ্ডে প্রকাশিত প্রত্যেক বইয়ের একখণ্ড বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে দিতে হইবে এবং ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে গ্রাব স্ট্রীটে প্রকাশিত এক পেনি সংস্করণের বই পর্যন্ত সেখানে পাওয়া যায়। বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিও এইভাবে প্রদত্ত প্রত্যেক দরকারী বইয়ের একখণ্ড পাইয়া থাকে। আমার মনে আছে, আমি যখন অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন নেহাৎ তামাসাচ্ছলে আমি মাঝে মাঝে বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিতে সামান্য এক পেনি সংস্করণের বইয়ের জন্য চাহিদাপত্র পাঠাইতাম, কিন্তু কালেভদ্রেই ঐ ধরনের বই না পাইয়া আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। শ্রীচ্যাপম্যান গত রাত্রিতে বলিলেন, একটি দেশ যেমন গ্রন্থাগার চায় তেমনই পায়। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের সৃষ্টি এবং ইহার উন্নতি ব্যাহত হয় এইজন্য যে, পরবর্তী বড়লাটরা ইহাতে খুব কম উৎসাহই দেখাইতেন। তিনি আরও বলিলেন, একটা দেশের শাসকবর্গের বহুমুখী ও মার্জিত রুচি থাকিলেই গ্রন্থাগারসমূহ সাহায্য পাইয়া প্রসার লাভ করে, নচেৎ নয়। আমি কি তাহা হইলে সাধারণভাবে এই উক্তি করার সাহস পাইতে পারি যে একটা দেশের শাসকবর্গ যেমন প্রকৃতির হইবে উহার গ্রন্থাগারও তেমন ধরনেরই হইবে ?

এখানে আমার একটা ঘটনা মনে পড়িল, জার্মানির হেলডেবার্গ-এ (Heidelbeag) থাকার সময় একদিন একটি সাধারণ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। সে কাছে আসিয়া আমাকে সহর ঘুরাইয়া দেখাইতে চাহিল। সে ভালভাবে ইংরেজি বলিতে পারিত না, কিন্তু ফরাসী ভাষায় অনেকক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা হইল। সে ফরাসী ভালভাবেই বলিতে পারিত। আমি দেখিলাম সে একজন দস্তুরমত শিক্ষিত লোক, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন, সে তাহার সমস্ত শিক্ষা পাইয়াছে একটি সর্বজনীন গ্রন্থাগার হইতে। এই ধরনের গ্রন্থাগার ঐ সহরে দুই তিনটি ছিল। এই সর্বজনীন গ্রন্থাগার হইল রাষ্ট্র দ্বারা পোষিত—বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার। মনে রাখিবেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন রাষ্ট্রের মহা বিপদ উপস্থিত এবং বেশীর ভাগ লোক প্রতিদিন দুবেলা খাইতে পাইত না তখনও এই ব্যবস্থা

ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থাগারসমূহের জন্য সাহায্যের অভাব হয় নাই। এই ধরনের প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে অন্তত কয়েক হাজার বই ছিল। আমাদের দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্র সামান্যতম আগ্রহই দেখাইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে আমাকে সরকারী আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ পর্যালোচনা করিতে হয়। তাহাতে দেখি যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের (১৩২০-২১ বঙ্গাব্দের) রাজস্ব হইতে আমাদের রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি হইতে বাড়িয়া একশত ত্রিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের খাতে যদি কোন উন্নতি হইয়া থাকে তবে তাহা অতি সামান্যই হইয়াছে। রাষ্ট্রের থেকে কোন সাহায্যের ভরসা না করিয়া নিজেদের চেষ্টায়ই আমাদের সব কাজ করিতে হইবে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব লইয়া আমাদিগকে কাজ করিতে এবং দেশবাসীর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আসলে ভারত পড়িয়া রহিয়াছে– গ্রামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। সেই গ্রামের শ্রী ফিরাইয়া আনাই হইবে আমাদের উদ্দেশ্য। প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ আমি ব্যবস্থাপক সভায় আছি। কিন্তু আমরা যতটা করিতে পারিয়াছি তাহা বাদ দিলে আমার এই প্রতীতিই জন্মিয়াছে যে জনগণের আসল চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারকে অর্থ ব্যয় করাইতে বাধ্য করার চেষ্টায় আমরা প্রায় ব্যর্থ হইয়াছি।

আপনাদের একটি প্রস্তাবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডকে গ্রন্থাগারগুলিকে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ করণীয় কার্য করিবার জন্য প্রচুর অর্থ আছে কিনা এবং উহারা প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিকেই মেরামত করিয়া রক্ষা করিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আসুন আমরা সাহায্যের জন্য পরের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া নিজেদের যাহা সম্বল আছে তাহাই নিয়োজিত করি ও সংগঠনে ব্রতী হই। আমার মতে একটি গ্রাম্য গ্রন্থাগারের মূল্য ইহার প্রাসাদোপম ভবন বা পুস্তকের সংখ্যা দ্বারাই নিরূপিত হয় না। গ্রাম্য জীবনের মর্মস্থল হইবে গ্রাম্য গ্রন্থাগার। ইহা হইবে গ্রামবাসীদের মিলন-ক্ষেত্র। এখানে তাহারা মিলিয়া নিজেদের সমস্যাবলী নিয়া আলোচনা করিবে। সমগ্র গ্রামের গঠনকেন্দ্রই হইবে এই গ্রন্থাগার।

দেশীয় রাজ্যে জোরাল গ্রন্থাগার আন্দোলন চলিতেছে। গত বৎসর বেলগাঁওয়ের তৃতীয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। সম্মেলনের বেশীর ভাগ কাজ আমাকেই চালাইতে হইয়াছিল। দেখিলাম, মহিশূরবাসীরাই ইহার প্রাণস্বরূপ এবং স্থানীয় সরকারের তাঁহারাই ছিলেন নিয়ন্তা। বস্তুতঃ মহিশূর ও বড়োদারই গ্রন্থাগার আন্দোলন পুরাদমে চলিতেছে। দেখিয়া খুসী হইলাম যে বড়োদা হইতে বহু সংখ্যক জিনিস প্রদর্শনার্থে এই সম্মেলনে পাঠান হইয়াছে। দেশের লোকের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে কি সুবিধা পাওয়া যাইত এবং রাষ্ট্রই বা এই সম্পর্কে কি করিতে পারে এই কাজে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

আর একটি কথা বলিয়াই আমি শেষ করিব। আপনাদের একটি প্রস্তাবে আপনারা দেশের আর্থিক অবস্থার তদন্ত করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে তৎপর হইতে বলিয়াছেন। ইহা একটি যথার্থ পদক্ষেপ। নিখিল ভারত অর্থনৈতিক তদন্তের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রথমত ইহাকে শিকায় তোলার দিকেই সরকারের ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তখন হইতে উহা আরও ভালভাবে চিন্তা করিয়া এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক সমিতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতি স্যর বিশ্বেশ্বরায়ার সহিত আমার এই বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। আমরা এই ব্যাপারে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ এবং পারিবারিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করি। এইরূপ তদন্তের কাজে গ্রন্থাগারগুলি প্রভূত সাহায্য করিতে পারে এবং আপনারা এই বিষয়ে মন দিয়াছেন দেখিয়া আন্তরিকভাবে খুসীই হইয়াছি। সম্মেলনের সভাপতিপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই কথা বলিয়াই আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।"

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের (১৩৩২ বঙ্গাব্দের) ১৪ই জুন, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মাবলী প্রণীত হয়। ইহার সদর কার্যালয় বাঁশবেড়িয়াতেই অবস্থিত ছিল। প্রথম যে কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল তাহাতে তুলসী চরণ গোস্বামী সভাপতি, মণীন্দ্রনাথ রুদ্র—সম্পাদক, তিনকড়ি দত্ত ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—যুগ্ম-সম্পাদক, যদুগোপাল রায়—হিসাব পরীক্ষক এবং জিলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পনর জন প্রতিনিধি সভ্য ছিলেন।

রাজবাড়ী মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন

হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের কিছুদিন পরেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের (১৩৩২ বঙ্গাব্দের) ২রা ও ৩রা জুন, ১৯শে ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোম ও মঙ্গলবার ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ী মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াকান্দিতে রাজবাড়ী মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বালিয়াকান্দি রাজকাছারীর অধ্যক্ষ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাংশা গ্রামের প্রখ্যাত মুসলমান লেখক মৌলভী ইয়াকুব আলি চৌধুরী সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অম্বিকা বাবু সম্মেলনে অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত থাকায় শ্রীতারাপদ লাহিড়ী (রাজনৈতিক কর্মী) তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণে আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া কিভাবে গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তৎসম্পর্কে তিনি কতকগুলি কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় উপস্থিতমতে তাঁহার বক্তব্য বলেন। সাহিত্যরসসিক্ত বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি গ্রন্থাগারের উপযোগিতা এবং দেশবাসীর চরিত্রগঠনে ইহা কিভাবে সহায়তা করে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করেন।

একটি প্রস্তাবে মহকুমা গ্রন্থাগার সমিতি গঠনের জন্য শ্রীতারাপদ লাহিড়ীকে সংগঠক নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া যে সকল পুস্তক দেশ গঠনের কাজে সহায়তা করে এবং যে সকল উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া যুবক-যুবতীরা বিপথগামী না হয় সেই সকল পুস্তক গ্রন্থাগারে রাখা এবং পুরান পাণ্ডুলিপি, গ্রামের ইতিকথা, গ্রাম্য গাথা ও মুসলমান লেখকদের লিখিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য মহকুমার সমস্ত সর্বজনীন গ্রন্থাগারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ক্রমশ:)

Library movement in Bengal
by Grudas Bandyopadhyay.

পুঁথিপত্রের শত্রু কীটপতঙ্গ

পঙ্কজকুমার দত্ত

পণ্ডিতের মূর্খ সন্তানের পরই পুঁথিপত্রের প্রধানতম শত্রু হচ্ছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ। আমাদের দেশের উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় এই ধরনের কীটপতঙ্গের প্রকোপ খুবই বেশী। এদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে। এই প্রবন্ধে পুস্তকাদির শত্রু যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের দেশে দেখা যায় কেবলমাত্র তাদের বিষয়েই প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে।

রূপালী পোকা [SILVER-FISH]

বর্গ (Order)—Thysanura গোত্র (Family)—Lepismatidae

প্রজাতি (Species)—Lepisma Saccharina Linn

ভারতবর্ষে Lepisma Saccharina Linn নামক প্রজাতিটি খুব দেখা যায়। ইংরাজীতে silver-fish নামটিই চলতি। বাংলায় এটি রূপালী পোকা অথবা মচ্ছি-পোকা নামে পরিচিত। ছোট ছোট এই পাখনাহীন পোকাগুলি চলা-ফেরায় খুবই চটপটে। বইপত্র বা কাপড়-চোপড়ের মধ্য থেকে কোন রূপালী পোকা খোলা জায়গায় আলোর মাঝে বেরিয়ে পড়লে তরতর করে পালিয়ে যায়—চলার পথে প্রায়ই দিক পরিবর্তন করে। আলো এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ঘুপসি অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে জায়গাই এরা বাসস্থানের জন্য পছন্দ করে এবং নির্বিবাদে বংশ বিস্তার করে। স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় বস্তু এবং শিরিষের (glue) মতন প্রোটিন বস্তু খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। রূপালী পোকার চোয়ালের গড়ন 'চর্বন' কাজের উপযোগী নয় তবে চাঁছা (scraping) কাজ ভালভাবেই চলে। কাপড়ে বাঁধা বইয়ের কাপড় প্রায়ই রূপালী পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়, কারণ এখান থেকে খাদ্য চেঁছে নেওয়া সহজ সাধ্য। বইয়ের পাতার যে পাড় মাখান থাকে রূপালী পোকা সেখান থেকেও খাদ্য আহরণ করে। ফলে বইয়ের বেশ ক্ষতি হয়। এরা সাধারণত বই কাটে না অর্থাৎ বইয়ে গর্ত করে না; কিন্তু বইয়ের পিছনে শিরদাঁড়ায় যে শিরিষ লাগান থাকে তা খেতে প্রয়োজন পড়লে গর্ত করে সেখানে হাজির হয়।

Lepisma Saccharina Linn-এর দেহটি লেজের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে এবং অবশেষে একটি সুঁচাল শলাকায় (spike) পরিণত হয়েছে। শলাকার দুই পাশে একটি করে বাঁকা 'ফিলামেন্ট' রয়েছে। রূপালী পোকার মাথায় দুটি শুঙ্গ (antenna) আছে। দেহটি লম্বায় প্রায় দেড় সেন্টিমিটার এবং সারা দেহ এক ধরনের রূপালী আঁশে

ঢাকা—এরই জন্য ঐটিকে রেশমের মত চকচকে দেখায় এবং হাত দিলেই হাতে চকচকে রুপালী গুঁড়া লেগে যায়। মাদী পোকা অন্ধকার জায়গায় উঁচুনীচু খাঁজের মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে বেশী সময় লাগে না। বাচ্চারা অবিকল ধাড়ী পোকার মত—তবে আয়তনে অনেক ছোট এবং বাচ্চাদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। মাস নয়েকের মধ্যে বাচ্চাগুলি পূর্ণতা পায়।

গ্রন্থ উকুন [BOOK-LICE]

বর্গ (Order)—Corrodentia গোত্র (Family)—Atropidae
প্রজাতি (Species)—Liposcellis transvallensis End

গ্রন্থ উকুন বা Book-lice অনেক সময় Pscoids নামেও অভিহিত হয়। পাখনাহীন এই পতঙ্গটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মিলিমিটার। নরম দেহটির রঙ ফিকে হলদে বা পাঁশুটে। পুরাতন বইয়ের রাজ্যে উকুনের মত দেখতে এই জীবটির সাক্ষাৎ প্রায়ই পাওয়া যায়, এজন্যই এর নাম 'গ্রন্থ-উকুন'। যে সব পুরাতন বই বিশেষ ব্যবহৃত হয় না তাদের ঠাঁই হয় প্রায়ই ঘরের অন্ধকার অঞ্চলে আর এই জায়গাগুলি স্বভাবতই হয় একটু স্যাঁতসেঁতে। তার ফলে ঐসব বইয়ের পাতায় বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক জন্মায় এবং গ্রন্থ-উকুন ঐ ছত্রাক খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের জীবন বৃত্তান্ত বিশদভাবে এখনও জানা যায়নি। অল্প যে খবর বিজ্ঞানীদের হাতে এখন রয়েছে তা হচ্ছে: স্ত্রী-পতঙ্গ ধুলাবালির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র সাদা সাদা ডিম পাড়ে—খালি চোখে এগুলি অদৃশ্য, তবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের আকার হংসডিম্ববৎ (oval) দেখায়। অল্প সময়েই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। সাধারণত পতঙ্গদের জীবনের চারটি অধ্যায় থাকে। প্রথম অবস্থা ডিম। ডিম থেকে শূককীট—তারপর মূককীট ও সকলের শেষে আসে পতঙ্গ। কিন্তু গ্রন্থ-উকুনের ডিম ফুটে যে বাচ্চা বের হয় সেগুলি অবিকল ধাড়ী পোকার মত দেখতে। তফাৎ কেবল আয়তনে। বাচ্চারা অবশ্য প্রজননে সক্ষম নয়, তবে এই ক্ষমতা পেতে খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না। উপযুক্ত পরিমাণ খাবার পেলে গ্রীষ্মকালে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের সব বৈশিষ্ট্যই এরা অর্জন করে। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু এদের বেশ কয়েকবার খোলস বদল করতে হয়।

অনেকে মনে করেন গ্রন্থ-উকুন ছত্রাক ভক্ষণকালে পুস্তকে ব্যবহৃত আঠা, শিরিষ ও কাগজের মাড় (size) খেয়ে ফেলে কিন্তু আধুনিক পতঙ্গবিজ্ঞানীরা গ্রন্থ-উকুনকে এই অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

আরশোলা

বর্গ—Orthoptera গোত্র—(a) Blattidae এবং (b) Phyllodromidae
প্রজাতি—Blatta orientalis, Periplaneta americana, Blattela germanica Linn

বাঙ্গালী গৃহস্থের কাছে আরশোলা বা তেলাপোকা মূর্তিমান উৎপাত। গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানার আগারিকদের নিকটও ঐটি শত্রু বলেই গণ্য। খাবারের সন্ধানে এরা বাঁধাই করা বইপত্রের মলাট এবং শিরদাঁড়া, এমন কি, বইপত্রের পৃষ্ঠাগুলিও চেঁছে ফেলে। এতে বইয়ের যে অপরিসীম ক্ষতি হয় সেকথা বলাই বাহুল্য। এছাড়া এদের বিষ্ঠায় ও তরল রেচন পদার্থে বইপত্রের কাগজে বড় বিশ্রী দাগ ধরে। আরশোলার প্রায় হাজার দুয়েক প্রজাতির খবর জানা গেছে। অবশ্য এদের মধ্যে মাত্র তিন-চারটি প্রজাতি বইপত্রের শত্রু হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে এই প্রজাতি কয়েকটি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। আরশোলা উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া বিশেষ পছন্দ করে (এজন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলেই এদের সংখ্যাধিক্য) এবং আলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। এ কারণে ঘুপচী গুদাম ঘরে, স্নানাগারে ও পায়খানায়, আসবাবপত্রের আশে পাশে অন্ধকার অঞ্চলে এরা লুকিয়ে থাকে, দিনের আলোয় মোটেই বের হয় না। বইপত্রের কাগজে যে মাড় থাকে সেই মাড় এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। বহুল ব্যবহারে বইয়ের কাগজে যে তেল ও ময়লা ধরে সেগুলির গন্ধে এরা বইয়ের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। ঘরের নালীপথে, বন্ধ জানালা দরজার পাল্লা ও চৌকাটের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে অথবা অন্য কোন প্রবেশপথে এরা ঘরে ঢোকে। কোন কোন প্রজাতির পুং আরশোলা উড়তে পারে ; কাজেই তাদের পক্ষে উড়ে এসে ঘরে প্রবেশ করা সম্ভবপর।

সাধারণভাবে বলতে গেলে আরশোলার গায়ের রঙ চকচকে বাদামী, কোন প্রজাতিটির রঙ এরই মধ্যে একটু কালচে, কোনওটির আবার লালচে। দৈহিক দৈর্ঘ্যে তারতম্য থাকলেও অধিকাংশরই দৈর্ঘ্য দেড় সেন্টিমিটার থেকে আড়াই সেন্টিমিটারের মধ্যে। আরশোলার ডিমগুলি আর একটি বিশেষ আধারের মধ্যে থাকে। ঐ আধার ভেদ করে বাচ্ছারা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাদের দেখতে প্রায় ধাড়ী পোকার মতই হয় ; অল্প যে তফাৎটুকু থাকে তা কয়েকবার খোলস বদলের পর চলে যায়।

(a) Blattidae—গোত্রভুক্ত প্রজাতি :

(i) Blatta Orientalis—প্রাচী অথবা এশীয় আরশোলা। রান্নাঘরের আশে পাশে প্রায়ই দেখা যায়। লম্বায় প্রায় দুই সেন্টিমিটার। গায়ের রঙ কাল। বক্ষ ও উদরে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে। উদরের দাগগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন মনে হয় প্রতি দেহখণ্ডে একটি করে ঢেউ খেলান রেখা এঁকে তাদের কিছু কিছু অংশ মুছে দেওয়া হয়েছে। পুং ও স্ত্রী উভয় পতঙ্গেরই ডানা আছে কিন্তু স্ত্রী পতঙ্গের ডানাটি এত ছোট যে, সেটি সম্বল করে উড়া সম্ভব নয়। পুরুষের ডানাটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বলিষ্ঠ এবং ঐটির সাহায্যে উড়া সম্ভব কিন্তু পুরুষেরা ঐটি ব্যবহার করে না বললেই চলে।

(ii) Periplaneta americana—বাদামী (বা রক্তিমাভ-বাদামী) রঙের এই প্রজাতিটি আমাদের অতি পরিচিত। লম্বায় প্রায় তিন থেকে সাড়ে-তিন সেন্টিমিটারের মত, তবে লম্বাটে ডানার জন্য বেশ বড়-সড় দেখায়। বক্ষটি ত্রিভুজাকার এবং তার উপর দুটি বড় বড় হলুদ রঙের ফোঁটা রয়েছে। এরা বেশ ভালভাবেই উড়তে পারে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার দিকে এদেরকে উড়তে অনেকেই হয়ত দেখে থাকবেন কারণ উড়ার সময় বেশ ফড় ফড় শব্দ হয়। আমেরিকার মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলেই এদের প্রথম আবির্ভাব হয়। বর্তমানে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

(b) Phyllodromidae—গোত্রভুক্ত প্রজাতি :

Blattela germanica Linn—নাম যাই হোক পণ্ডিতদের বিশ্বাস এশিয়াতেই এদের উদ্ভব হয়। অবশ্য কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন ইউরোপ এদের আদি বাসস্থান। গায়ের রঙ ফিকে হলুদ, তবে প্রোথোরাক্সের শিরোভাগে লম্বালম্বি ভাবে দুটি গাঢ় হলুদ রঙের ডোরা দাগ রয়েছে। পুং ও স্ত্রী উভয়েরই ডানা রয়েছে, লম্বায় এরা খুবই কম, এক সেন্টিমিটারের মত বা তার থেকে অল্প একটু বেশী। প্রকৃতি এদের এই অসুবিধা দূর করেছেন অন্যভাবে—প্রথমতঃ সংখ্যাধিক্যে, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলা ফেরার ও দৌড়াবার ক্ষমতা দিয়ে। এক জায়গাতে ঝাঁক বেঁধে অগুণতি পতঙ্গ থাকে, ফলে বাসস্থানটির আশ-পাশ বিশিষ্ট এক দুর্গন্ধে ভরে যায়।

আরশোলা, রূপালীপোকা প্রভৃতি পতঙ্গের উৎপাত নিবারণের উপায়

ঘুপসী স্যাঁতসেঁতে জায়গা আরশোলা, রূপালী পোকা, গ্রন্থ-উকুন, ইত্যাদির প্রিয় বাসস্থান। কাজেই এইসব কীটপতঙ্গের উৎপাত বন্ধ করতে হলে গ্রন্থাগারের মধ্যে আলোবাতাস চলাচল প্রয়োজন। আসবাবপত্রাদির ও পুঁথিপত্রের উপর যেন ধূলি ইত্যাদি না জমে সে বিষয়ে প্রখর নজর রাখা দরকার। বই পত্রের উপর থেকে ধূলি ঝাড়তে ছোট ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কাপড়ের বা পালকের ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়লে ধূলি অতি সহজেই আবার এসে জমে কারণ তাড়িয়ে দেওয়া ধূলি'ত ঘরের বাতাসেই ভেসে থাকে। ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারে কিন্তু এমনটি হওয়ার উপায় নেই—সব ধূলি গিয়ে জমে যন্ত্র সংলগ্ন থলির মধ্যে। গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য যে সব ছোট্ট ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার পাওয়া যায় সেই রকম একটি গ্রন্থাগারের জন্য কেনা যেতে পারে। এমন একটি যন্ত্র আট-নয়শত টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারের ভিজে দেওয়াল ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়িয়ে'ত তোলেই, উপরন্তু বিভিন্ন কীট পতঙ্গের প্রিয় আবাস ও বিচরণস্থল হয়, পুঁথিপত্রের উপর ছত্রাক আক্রমণের ভয়ও থাকে; অথচ মেরামতের দ্বারা দেওয়ালের স্যাঁতসেঁতে ভাব অনেক ক্ষেত্রেই দূর করা সম্ভব। গ্রন্থাগারের পক্ষে স্যাঁতসেঁতে ঘর সর্বদা পরিত্যাজ্য তবে অনেক সময় সেটি সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ যখন দুর্ঘটনাবশতঃ ছাদ ফুটো হয়ে, ছাদের জল নামবার নল ভেঙ্গে, অথবা

অন্য কোন কারণে, দেওয়ালে জল বসে এবং ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্র'তা বেড়ে যায় তখন আর্দ্রতা কমাবার জন্য ঘরের মধ্যে অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করা দরকার। এই কাজে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সিলিকা-জেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সব'ত গেল পরোক্ষ ব্যবস্থা—কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন। কীট-পতঙ্গের সম্ভাব্য বাসস্থানসমূহে কীটঘ্ন রসায়ন প্রয়োগ করতে হবে। একাজে ডি.ডি.টি, পাইরেথ্রাম, সোডিয়াম ফ্লুরাইড, সিলিকা-এরোজেল প্রভৃতি রসায়ন অথবা টিনে ভর্তি করা যে সব কীটঘ্ন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব বস্তু কিন্তু পুঁথিপত্রের উপর মোটেই প্রয়োগ করা চলবে না কারণ এগুলির ক্রিয়ায় পুস্তকাদির কাগজে দাগ লাগতে পারে এমন কি আরও মারাত্মক রকমের ক্ষতি হতে পারে (যথা গ্যামেক্সিনে কাগজ অশক্ত হয়ে পড়ে—এজন্যই গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্যামেক্সিন প্রয়োগ নিষিদ্ধ)। এ ছাড়া পাঠক ও আগারিকদের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও থাকে এসব কীট পতঙ্গ যাতে গ্রন্থাগারে ঢুকতে না পারে তজ্জন্য কোন আগারিক জানলা দরজার ফ্রেমে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রবেশপথে একধরনের কীটঘ্ন প্রলেপ লাগিয়ে দেন এই প্রলেপ আসবাবপত্রাদির উপরে, বইয়ের সেলফে লাগান যেতে পারে। লণ্ডনের Sorex Ltd কর্তৃক প্রস্তুত Insecta-lac এই ধরনের কাজে ব্যবহার্য। বইপত্রের সেলফে ফুট পাঁচেক ব্যবধানে একটি করে ন্যাপথেলিন-ইস্টিকা (Naphthelene brick) রাখা কর্তব্য—ন্যাপথেলিনের গন্ধে আরশোলা, রূপালীপোকা প্রভৃতি কীট বইপত্রের কাছেই আসবে না। (কলিকাতার Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd. ন্যাপথেলিন ইস্টিকা তৈরী করেন।)

সকলের শেষে একটি কথা বলার আছে—কোন একটি কীটঘ্নের পক্ষে সকলপ্রকার কীট পতঙ্গ ধ্বংস করা সব সময় সম্ভব হয় না, এজন্য বিভিন্ন কীটঘ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোন কীটঘ্নই একনাগাড়ে বেশীদিন ব্যবহার করা উচিত নয়, অদল-বদল করে ব্যবহার করা কর্তব্য অন্যথায় কীটগুলির মধ্যে অদ্ভুতরকমের প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

গ্রন্থকীট

গ্রন্থকীট আসলে coleoptera বর্গভুক্ত কয়েকপ্রকার পতঙ্গের শূককীট। এই বর্গের অন্তর্গত Lyctidae, Anobidae ও Plinidae গোত্রমধ্যে প্রায় 160টি প্রজাতি রয়েছে যাদের শূককীটগুলিকে গ্রন্থকীটের দলে ফেলা যায়। বলা বাহুল্য সবকটি প্রজাতি সব দেশে একই সঙ্গে দেখা যায় না।

গ্রন্থকীটের পতঙ্গগুলিকে বলা হয় বীটল (Beetle)। বাদামী বা মেহগিনী রঙের বীটলই বেশী দেখা যায়। খোলা জানলা-দরজার মধ্য দিয়ে উড়ে এসে এরা গ্রন্থাগার বা পুঁথিশালার ভিতর ঢোকে। জানালা দরজার বন্ধ পাল্লার উপরে-নীচে যে

অল্প ফাঁক থাকে সেগুলির ভিতর দিয়েও আসা অসম্ভব নয়। আর আক্রান্ত পুঁথি-পত্রের মারফৎ সংক্রমণের সম্ভবনা'ত রয়েছেই। সেলফে রাখা বইপত্রের পাতার উপর মাদী-বীটল ডিম পাড়ে। ডিমগুলি সাধারণত পাতার ফাঁকের মধ্যে ঢুকে যায়। বাচ্ছা শূককীট ডিম থেকে বেরিয়েই সুড়ঙ্গ কেটে বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর তারপর মহানন্দে নিত্য নূতন সুড়ঙ্গ কেটে পাতাগুলি ছারখার করে দেয়। আক্রমণের প্রকোপ যখন খুবই বেশী হয় তখন উপজাত গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে, অন্যথায় এগুলি সুড়ঙ্গের মধ্যেই রয়ে যায়। সাধারণতঃ সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে শূক এগিয়ে যেতে থাকে, পিছনে সুড়ঙ্গ মধ্যে পড়ে রয় উপজাত গুঁড়া। এই গুঁড়া হচ্ছে শূকের চিবিয়ে ফেলে দেওয়া ভুক্তাবশেষ। মারাত্মক রকমে আক্রান্ত পুঁথিপত্রে একটু খোঁজ করলেই শূককীটের দেখা পাওয়া যায়। সাদা অথবা ফিকে ঘৃতবর্ণের শূকগুলি যতক্ষণ সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে তাদের আকার থাকে বঁড়শির মত কিন্তু আলোতে বের করে নিয়ে এলেই কুঁকড়ে গোলাকার চাকতির মত হয়ে যায়।

গ্রন্থকীট হিসাবে Gastrallus Indicus Reitter রীতিমত কুলীন—সমগ্র ভারত জুড়ে এর অপ্রতিহত ও একচ্ছত্র আধিপত্য ; ভারতবর্ষে অন্য কোন প্রজাতির গ্রন্থকীটের কথা জানা যায়নি। Gastrallus Indicus বীটলের শীর্ণকায় দুইটি পিঙ্গলবর্ণের এবং দেহের পার্শ্বদ্বয় মোটামুটি সমান্তরাল। পূর্ণবয়স্ক বীটলের দৈর্ঘ্য গড়ে ২.৩ মিলিমিটার। শূককীটগুলি কিন্তু দৈর্ঘ্যে ৩.৪ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। শূককীটের বঁড়শি সদৃশ সুপুষ্ট দেহের প্রস্থচ্ছেদ অর্ধবৃত্তাকার তবে বক্ষদেশ বেশ স্ফীত। বক্ষদেশে তিন জোড়া ছোট ছোট পা রয়েছে এবং পাগুলির প্রান্তভাগে রয়েছে নরম গোলকাকার 'প্যাড'। শূককীটের মাথাটি retractile অর্থাৎ ইচ্ছামত ঘোরান বা নড়ান যায়। পা ও মাথার এই বিশেষত্ব Gastrullus গণভুক্ত জীবগুলির শূককীটের বৈশিষ্ট্য—Anobidae গোত্রভুক্ত অন্য কারও এমনটি দেখা যায় না।

ভারতীয় গ্রন্থকীটের জীবন ইতিহাস বা অন্যান্য তথ্য বিশেষ জানা নাই। তবে শীতকালে এরা কিছু পরিমাণে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং বসন্তের আগমনে (ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ) এদের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে অর্থাৎ সুড়ঙ্গ কাটার কাজ পুরাদমে শুরু হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন বসন্তের গোড়ায় পূর্ণবয়স্ক শূককীট সুড়ঙ্গ কেটে বইয়ের প্রান্তীয় অঞ্চলে আসে ও সুড়ঙ্গের মধ্যে গুটি তৈরী করে। এই গুটির মধ্যে সে মূককীট জীবন যাপন করে ও মূককীট জীবনের শেষে গুটি কাটিয়ে সে তার স্বাভাবিক পতঙ্গরূপ নিয়ে বাইরে সুড়ঙ্গ মধ্য অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় নেয় এবং আসার পথে অল্প যে বাঁধাটুকু থাকে সময় বুঝে সেটুকু কেটে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ে। এজন্য আক্রান্ত পুঁথিপত্রের মলাটগুলি একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রান্তীয় অঞ্চলেই ছোট ছোট গোল গোল গর্তের আধিক্য—এগুলিই সদ্য বয়প্রাপ্ত বীটলের বাইরে বেরিয়ে আসার রন্ধ্র।

পুঁথিপত্রে গ্রন্থকীটের উপদ্রব যেমন ক্ষতিকর তেমনই আয়াসসাধ্য একে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা। কীটঘ্ন রসায়নের বাষ্প সহযোগে আক্রান্ত পুঁথিপত্রকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উপধূপনের (fumigation) দ্বারা গ্রন্থকীটকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থাগারে সমস্ত পুঁথিপত্রকেই নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমে উপধূপায়িত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

উই

উইপোকার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। উইকে ইংরাজীতে বলে termite। White-ant নামটি খুব চলতি হলেও পিপীলিকার সগোত্র এরা নয়। পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের বহু লক্ষ বছর আগে উইয়ের পিতৃপুরুষদের উদ্ভব হয়। সেই স্মরণাতীতকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে পতঙ্গ পর্বে এরা খুবই 'বনেদীঘর'। [পতঙ্গ পর্বভুক্ত আরশোলাও অবশ্য বনেদিয়ানার গর্ব করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে আরশোলার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে উইয়ের পূর্বসূরীদের নিকট আত্মীয়তা ছিল। Mastotermes darwiniensis froggatt নামধারী অষ্ট্রেলিয়াবাসী উই নিজদেহে সেই আত্মীয়তার চিহ্ন আজও বহন করছে]

উইয়ের জীবন কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এরা যূথবদ্ধভাবে বাস করে এবং যূথের স্বার্থে এদের জীবন সমর্পিত। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় এরা উগ্র 'সমাজবাদী'। এদের সমাজে রয়েছে চারটি 'থাক': রাণী, রাজা (বা পুরুষ), শ্রমিক ও সৈনিক। একটি যূথে একটি মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক রাণী থাকে, রাণীর সহচরীরূপে যূথে একাধিক পুরুষ পতঙ্গ থাকে শ্রমিক ও সৈনিক থাকে কয়েক হাজার। রাণীর একমাত্র কাজ হচ্ছে ডিম্ব প্রসব। শ্রমিক ও সৈনিক একেবারে বন্ধ্যা—কোন জননক্ষমতা নাই। রাজা-রাণী তাদের একটিমাত্র কর্তব্য সন্তান উৎপাদন করেই ক্ষান্ত, সন্তান পালন, রাণীর পরিচর্যা, খাদ্য আহরণ বাসগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সকল কাজের দায়িত্ব রয়েছে শ্রমিকের উপরে। সৈনিকের উপর থাকে যূথকে রক্ষার ভার।

রাজা-রাণীর প্রত্যেকের দুই জোড়া ডানা আছে—উভয় জোড়া ডানার রূপ ও আকার প্রায় একই রকম। যৌনমিলনের উদ্দেশ্যে বাস্তত্যাগের সময় অল্পক্ষণের জন্য এই ডানা এদের কাজে লাগে, কারণ আকাশে পাড়ি জমানর অতি অল্প সময় পরেই ডানা একেবারে গোড়ার কাছ থেকে খসে যায় এবং পতঙ্গগুলি ধরিত্রীর কোলে ফিরে আসে ও দয়িতের সঙ্গে মিলনের কাজটুকু দ্রুত সেরে ফেলে। শ্রমিক ও সৈনিকগণ এরপর রাণীকে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রাণী এই সময় বিশেষভাবে নির্মিত একটি কুঠরীতে বাস করতে থাকে। রাণীর পেটটি অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে ওঠে। বিশাল উদরের জন্য রাণী নিজ কুঠরীতে প্রায় বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হয়। রাণী এ সময় হাজার হাজার,

দিনে গড়পড়তা প্রায় ত্রিশ হাজার ডিম প্র[illegible]রু করে। সেই ডিমে জন্ম নেয় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও সৈনিক। শ্রমিকদের কেউ হয় ধাত্রী, কেউবা ঘরামী—ঘর তৈরী ও মেরামতিতে সুদক্ষ; কেউবা হয় অন্য কিছু, প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। পিপীলিকাদের মতই সুশৃঙ্খল কর্মবিভাগ এদের মধ্যে দেখা যায়। যে যে কাজ করে সেই কাজের উপযোগী বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশ দেখা যায় তাদের দেহে; সৈনিকদের বেলায় ঐটি বিশেষ প্রকট। কারও থাকে সুঁচাল চোয়াল (mandible), কারও থাকে বিষাক্ত তরল নিক্ষেপকারী প্রত্যঙ্গ। এইসব সৈনিকদের রূপ ও গঠনবৈচিত্র্য খুবই বিশিষ্টতাপূর্ণ। একটি প্রজাতির সৈনিকের রূপের সঙ্গে অপর প্রজাতির সৈনিকের রূপের কিছু-না-কিছু তফাৎ থাকেই। উইয়ের প্রজাতি নির্ণয়ে সৈনিকদের রূপ খুবই সাহায্য করে।

পতঙ্গ পর্বের মধ্যে উই আছে Isoptera বর্গে। ছয়টি গোত্রে প্রায় ১৮০০টি প্রজাতির খবর আজ পর্যন্ত জানা গেছে। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র Rhinotermitidae গোত্রভুক্ত Subterranean or Earth dwelling termite অর্থাৎ বল্মীক বা মেঠো উই এবং Kalotermitidae গোত্রভুক্ত Drywood termitesএর কথাই আলোচনা করা হবে; কারণ বইপত্র লোপাট করতে এরাই সবচেয়ে তৎপর।

মাঠে-ঘাটে বিশেষত পতিত ডাঙ্গা-ডহরে বল্মীক-স্তূপ বা মৃত্তিকাবাসী উইয়ের বাসা হয়ত অনেকেই দেখে থাকবেন। এগুলি দেখতে 'খেলাঘরের পাহাড়ের' মত; সাধারণত ফুটদেড়েক উঁচু হয় তবে অনুকূল পরিবেশে ফুট তিন-চার বা তারও বেশী হতে পারে। মাটির উপরে যতখানি দেখা যায় তদপেক্ষা অনেক বেশী থাকে মাটির ভিতরে। এই বাসায় অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত থাকে এদের সমগ্র উপনিবেশটি—থাকে অসংখ্য কুঠরী, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। মাটির মধ্য দিয়েই এরা প্রয়োজন মত এগিয়ে চলে বা উপনিবেশকে বাড়িয়ে তোলে। মড়া গাছের শিকড়, কাঠ ইত্যাদি পড়লে সেই সব শিকড় ধরে এগিয়ে যায়। এগুতে এগুতে হঠাৎ যদি মাটির বাইরে আলোর মধ্যে এসে পড়ে তবে তাদের চলার পথটি তারা মুখের লালা আর মাটি, চর্বিত কাঠ, ঘাস ইত্যাদি দিয়ে আচ্ছাদিত করে নেয়। ঘর-বাড়ীর দেওয়ালের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অংশে যদি কোন ফাটল থাকে তবে সেই ফাটল দিয়ে উইয়েরা দেওয়ালে ঢোকে, দেওয়ালের ভিতর দিয়েই সুবিধামত ভাবে এগিয়ে চলতে থাকে, প্রয়োজন পড়লে দেওয়ালের বা মেঝের ফুটাফাটার মারফৎ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং যেখানে খাবার পাবার সম্ভাবনা সেদিকে এগিয়ে যায়। আসা যাওয়ার পথটি কিন্তু কোন সময়েই আচ্ছাদিত করতে ভোলে না। গ্রন্থাগারের বইয়ের আলমারী বা শেলফগুলি যদি দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকে থাকে তবে সেখান দিয়েই তারা বইয়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। অনেক সময় সেলফের বা আলমারীর পায়া বা গা বেয়েও এরা গ্রন্থজগতে ঢুকে পড়ে। আর তারপর মনের সুখে বই খেয়ে চলে সকলের অগোচরে। এ কাজটি এতই কৌশলের সঙ্গে করে যে বইয়ের বাহ্যিক আকারটি প্রায়

অক্ষতই থাকে, বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না যে এর ভিতরটি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। উইয়ের বই ধ্বংস করার ক্ষমতা বাস্তবিকই অকল্পনীয়—একটি রাতের মধ্যেই এরা অসংখ্য বইকে একেবারে নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারে। এবিষয়ে অতি করুণ অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী মাত্রেরই কিছু না কিছু আছে। ভারতবর্ষে Recticulitermes lucifugus নামক প্রজাতিটিই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। নষ্টামীতে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

এবার Dry-wood termite প্রসঙ্গে আসা যাক। বল্মীক বা মৃত্তিকাবাসী উই সব সময়েই মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে 'ড্রাই-উড টারমাইট' বা শুষ্ক কাষ্ঠে বসবাসকারী উই কিন্তু মোটেই তা করে না। অবশ্য এরা যে কেবল মাত্র শুকনা গাছপালার কাঠেই বাস করে তা নয় মাটি থেকে বহুদূরে পাকা বাড়ীর মধ্যে দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারে। এরা বেশ ভাল উড়তে পারে এবং জানলা দরজার মধ্য দিয়ে উড়ে এসে ঘরে ঢোকে। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে ছাতের কাছাকাছি জায়গায় এরা থাকতে ভালবাসে। যৌনমিলনের পর কাঠ-কাটরা বা বইপত্রের মধ্যে সুরঙ্গ খুঁড়ে ঢুকে পড়ে ও বংশ বৃদ্ধি করে চলে। এই প্রজাতিটির মধ্যে 'সৈনিক' শ্রেণীর দেখা সাধারণত পাওয়া যায় না। আলাদা 'শ্রমিক' শ্রেণী এদের মধ্যে নেই। অপ্রাপ্ত বয়স্করাই শ্রমিকের কাজ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত সকলেরই প্রজনন ক্ষমতা আছে—যারা শ্রমিকের কাজ করে তারাও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। এদের সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এদের সেলুলোজ পরিপাক করার ক্ষমতা নেই। সেজন্য এরা এদের পাকস্থলীতে এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবকে আশ্রয় দেয়। এই জীবগুলি কিন্তু পরজীবি (parasite) নয়—এদের সঙ্গে উইয়ের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ (symbiotic relationship) রয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে ঢাকা সুড়ঙ্গ পথের প্রয়োজন এদের হয় না, তবে দরকার পড়লে এরা তা তৈরী করে নেয়।

উই আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় ঃ

ঘরের মধ্যে উইয়ের সুড়ঙ্গপথ দেখলেই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সেটিকে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে দেওয়া। এতে অনেক সময়ই উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশী কারণ উদ্বাস্তু উইগুলির অধিকাংশই মারা পড়ে না এদিকে-ওদিকে পালিয়ে যায়। দরকার হচ্ছে উই-বংশ ধ্বংস করা এবং একাজের জন্য নজর ঘর ছাড়িয়ে আশেপাশের মাঠে-ঘাটে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে কেননা মূল ঘাঁটিটি ঘরের বাইরেই থাকে। ঘরের যেখানে যেখানে উই আক্রমণ হয়েছে সেইসব জায়গায় এবং ঘরের বাইরে মূল ঘাঁটি উইয়ের ঢিবি দেখতে পাওয়া গেলে সেই ঢিবিতে সংহারক রসায়ন প্রয়োগ করতে হবে। তারপর ঘরের দেওয়ালে বা মেঝেতে যে সব ফাটল বা গর্ত আছে সেখানে সংহারক প্রয়োগ করে ও পরে নিশ্ছিদ্রভাবে সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ঘরের

বাইরে দেওয়ালের গা-বরাবর ভিত্তির কাছে মাটি সরিয়ে সেখানেও সংহারক প্রয়োগ করা দরকার। পুরাতন ঘরবাড়ীর দেওয়ালে ও মেঝেতে ফাটল বা গর্ত থাকেই; মাটির তৈরী বাড়ীঘরে এ ব্যাপার আরও প্রকট। এ সব ক্ষেত্রে মেঝে এবং দেওয়ালে কয়েক হাত দূরে দূরে কয়েকটি গর্ত করে সেই গর্ত মারফৎ দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক রসায়ন প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন উঠছে কোন্ কোন্ রসায়ন এই ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে? ঘরের বাইরে বিশেষ করে, দেওয়ালের ভিতের কাছে প্রয়োগের জন্য ক্রিয়োজোট অয়েল (creosote oil), আলকাতরা ইত্যাদি ব্যবহার্য। উই-ঢিবিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। উই-ঢিবিতে উচ্চ চাপে ডি, ডি, টি বা গ্যামেক্সিন-স্মোক অনেক সময় প্রয়োগ করা হয়। ঘরের ভিতরে প্রয়োগের জন্য সাদা আর্সেনিক, ডি, ডি, টি চূর্ণ, 1% সোডিয়াম আর্সেনাইট দ্রবণ (জলীয়), 5% ডি, ডি, টি দ্রবণ (জলীয়) ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, ঘরের বাইরে এবং উই ঢিবিতেও এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি 10 ঘন ফুট বস্তুতে গ্যালন দুয়েক সংহারক দ্রবণ প্রয়োগ করা দরকার। পুরাতন ঘরের মেঝের বা দেওয়ালে সংহারক দ্রবণ প্রয়োগের পর দেওয়ালের পলেস্তরা বা মেঝে সিমেন্ট দিয়ে একেবারে আগাগোড়া নূতনভাবে করিয়ে নিতে পারলে খুবই ভাল হয়। মাটির ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে ছিটানী যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক প্রয়োগের পর আলকাতরা মেশান মাটি দিয়ে থরুটি করলে অর্থাৎ পলেস্তরা দিলে সাময়িকভাবে উই আক্রমণের ভয় কিছুটা কমে এবং বছরে বার দুয়েক দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক দিতে পারলে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। গ্রন্থাগারের জন্য নূতন পাকাবাড়ী তৈরী করার সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত উই আক্রমণ প্রতিহত করার আধুনিক ব্যবস্থা (Preconstruction antitermite soil treatment) অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রাথমিক ব্যয় কিছু বেশী পড়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও ঝামেলা অনেক কমে যায়; ফলে আখেরে লাভই হয়। তাছাড়া গ্রন্থাগারের পক্ষে একটু বেশী সাবধান হওয়াত খুবই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে কিছু কিছু সংহারক রসায়ন সব সময়ে মজুত রাখা উচিত যাতে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন মুহূর্তে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আপৎকালীন হঠাৎ প্রায়াজনে সংহারক রসায়নের অভাবে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগারে বা মহাফেজখানায় কাঠের আসবাবাদির পরিবর্তে ইস্পাতের তৈরী আসবাব-পত্র ব্যবহার করলে উইয়ের কবলে পড়ার ভয় আরও কিছুটা কমে। তবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য এমনটি হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কাঠের আসবাব যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয় তাহলে তাদের পায়াগুলি ছোট ছোট বাটির মধ্যে রেখে ঐ বাটিগুলি 'ক্রিয়োজোট অয়েলে' ভর্তি করে রাখতে হবে। ক্রিয়োজোট অয়েল মানুষের হাতে-পায়ে বা অন্যান্য নরম চামড়ায় লাগলে জ্বালা যন্ত্রণা করে এবং

ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য অনেকে এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। বিকল্প পন্থা হচ্ছে আসবাবপত্রের পায়াগুলিতে মাস ছয়েক অন্তর আলকাতরা বা ক্রিয়োজোট অয়েল লাগাবার ব্যবস্থা করা। আসবাবপত্র বার্নিশ বা রঙ করার আগে 20% জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণ (জলীয়) লাগালে উই আক্রমণের ভয় কিছুটা কমে। এ ছাড়া আলমারি ইত্যাদি দেওয়াল থেকে অন্ততঃ ইঞ্চি ছয়েক দূরে রাখা প্রয়োজন। এতে শুধু যে উই লাগার ভয়ই কমে তা নয়, ধুলাবালি জমতে পারে না ফলে অন্যান্য পোকা-মাকড়ের উৎপাতও কমে এবং বায়ু চলাচলের পথ থাকায় বই সহজে নষ্ট হয় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

The Enemies of Library Materials
Insects by Pankaj Kumar Datta.

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক ন-বিদ্যা

তুষারকান্তি নিয়োগী

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে আজ আর কোন শিক্ষিতের মনে দ্বিধা নেই এবং থাকাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। যে কোন কারণেই হোক বাঙলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চ-শিক্ষার বাহন কিন্তু আজও পর্যন্ত ইংরাজীই রয়ে গেছে। উত্তর ভারতের কোন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হ'য়েছে তবু সমগ্র ভারতের বিচারে তাতে উৎসাহের কিছু দেখা যায় না। বিশেষতঃ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও কারিগরীবিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার কিছু সুবিধা যে আছে তা অনঃস্বীকার্য। কিন্তু তবু একথা বলা অন্যায় বা অযৌক্তিক হবেনা যে আজ ভারতীয় ভাষাগুলির সার্বিক উন্নতি করতে গেলে তাদের দ্বারা শুধুমাত্র "সুকুমার সাহিত্য" সৃষ্টি করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রকেও ঐ ঐ ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে ; শিক্ষার সর্ব-স্তরে বাহন করতে হবে মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা ইংরাজীকে বা অতি প্রচাররত হিন্দীকে হেয় করা নয়---কারণ দেখা গেছে যে, যে যে দেশে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা সেখানে যাঁরা ইংরাজীর বা প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষার চর্চা করেন তাঁদের জ্ঞান আমাদের ইংরাজী জ্ঞানের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই।

ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার ধারা অনুসরণ করে আজ যদি দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহলে প্রয়োজনে ইংরাজীকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেখানে যেখানে ইংরাজীর একান্ত অপরিহার্যতা রয়েছে সেখানে তাকে রাখতে হবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে গেলেও ইংরাজীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সুনীতি বাবুর সেই উক্তিটি—বাঙ্গালীকে বিজ্ঞান শিখতে হবে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিলিয়ে—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরীশাস্ত্র পড়তে ও লিখতে গেলে অসুবিধা হয় বিশেষ করে পরিভাষার ক্ষেত্রে। সুষ্ঠু পরিভাষা না থাকলে ওইসব বিষয়ের গূঢ়ার্থ ঠিক ঠিক প্রকাশ ও উপলব্ধি করা যায়না। ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে দেখা যায় যে পরিভাষা নির্মাণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওঁরা বিশেষ উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে দেখেছেন যে সুষ্ঠু প্রকশের প্রয়োজনে মূল-ভাষা অবিকৃত ও অনমুদিত রাখা দরকার সেখানে তাই রেখেছেন—এবং এইভাবে তাঁদের ভাষায় সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে অনেক বিদেশী শব্দ এসে গেছে। এটা হল ভাষার আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা, যা কিন্তু ভাষার পুষ্টির লক্ষণ। অবশ্য এ ব্যাপারটি একটু বিবেচনা করে করতে হয়, না হলে ভাষার নিজস্ব অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞানের শাখাগুলির ভিতর নৃবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হলেও আজকের পৃথিবীতে এর ব্যাপক পঠন-পাঠন চলছে। বাঙ্গালা সাহিত্যেও নৃবিজ্ঞানের উপর কিছু পুস্তক রচিত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং সেজন্য সুগঠিত পরিভাষার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষায় দুর্ভাগ্যক্রমে নৃবিদ্যার অধ্যায়টি বাদ পড়েছে, প্রয়োজন ও প্রসক্তির তাগিদে এখানে কিছু পরিভাষা গঠনের প্রয়াস পাচ্ছি—সার্বিক সাফল্য দুরাশামাত্র। প্রয়োজনীয় ও সৃজনশীল উপদেশ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব। বক্ষমান অংশে সামাজিক নৃবিদ্যার কিছু পরিভাষা দেওয়া হল। অসুবিধা এবং অস্পষ্টতা এড়াবার জন্য স্থানে স্থানে পারিভাষিক শব্দের পাশে নৃতাত্ত্বিক বিশেষ অর্থ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য Winick-এর 'Dictionary of Anthropology' Lewis এর 'Anthropology made simple" বই দু'খানির সাহায্য নিয়েছি।

1. Aboriginal— আদিম।

2. Aborigines— আদিবাসী, আদিম অধিবাসী।

3. Adaptation– অভিযোজন, প্রতিযোজন।

4. Adoption— (ক) পোষ্যগ্রহণ

(খ) নবস্থাপিত সম্পর্ক, নবাহরিত সম্পর্ক

নৃতত্ত্বে এই কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী একটি নূতন সম্পর্কে প্রবেশ করে বা জড়িত হয় অপর ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা গোষ্ঠীর সঙ্গে। এই সম্পর্ক নূতন হলেও বিজাতীয় কিছু নয় এবং সময় সময় এই নূতন আত্মীয়তা স্বাভাবিক অবস্থারও কিছু বেশী হয় অর্থাৎ সম্পর্কের নৈকট্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। বাপ মায়ের মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাসস্থানিক বিপর্যয়, বংশলোপ, মহামারী এবং যুদ্ধ প্রভৃতি কারণের জন্য নূতন সম্পর্ক স্থাপন ও আহরণের প্রশ্ন ওঠে।

5. Adultery— ব্যভিচার, দুষ্ট যৌনাচার।

বিবাহোত্তর কালে পুরুষ বা নারী যদি স্বেচ্ছায় স্ব-স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অপরের সঙ্গে যৌনাচারে প্রবৃত্ত হয় তবে তাকে দুষ্ট যৌনাচার বলে। অবশ্য বলপূর্বক নারীধর্ষণ (rape) ও দুষ্ট যৌনাচার এক জাতের নয়। Adultery হ'ল স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংসর্গ।

6. Affianced— বাগদত্তা।
7. Afforestation— অরণ্যীকরণ।
কোন স্থানকে অরণ্য বা শিকারভূমিতে পরিণত করা।
8. Age-grade— বয়ঃক্রমিক সমাজমান।
9. Age-class— বয়ঃক্রমিক শ্রেণীমান।
10. Age-mate— সমবয়সী, সমবয়স্ক।
11. Age-set— বয়ঃসাম্য।
12. Age stratification—বয়ঃক্রমিক স্তর বিন্যাস।
13. Agriculture— কৃষি।
14. Alienation— হস্তান্তরকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ।
15. Amusement— সন্তোষ, আহ্লাদ।
16. Adolescent— কিশোর।
17. Adolescence— কৈশোর।
18. Ancestor— পূর্বপুরুষ।
19. Ancestral— কৌলিক।
20. Anthropologist— নৃ-বিদ্যাবিদ, মানববিজ্ঞানী।
21. Anthropology— নৃ-বিদ্যা, মানববিজ্ঞান।
22. Cultural Anthropology—সাংস্কৃতিক নৃ-বিদ্যা।
23. Social Anthropology—সামাজিক নৃ-বিদ্যা।
24. Anthropomorphism—নরত্ব-আরোপ।
25. Archaic Law— প্রাচীন/আদিম আইন।
26. Aristrocracy— আভিজাত্য।
27. Aristrocrat— অভিজাত।
28. Art— কলাশাস্ত্র, সুকুমার শিল্প।
29. Artisan— কারিগর, শিল্পী।
30. Association— অনুষঙ্গ, সঙ্ঘ।
31. Astronomy— জ্যোতির্বিদ্যা।
32. Authority— অধিকার।
33. Autochthon— প্রাচীনতম অধিবাসী, ভূমিজ। কোনস্থানের আদিমতম বাসিন্দাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় "ভূমিজ" বলা হয়।
34. Avoidance— পরিহার।
35. Avuncular Avoidance—মাতুল সম্পর্ক পরিহার
36. Avanculate— মাতুল সম্পত্ত্যধিকারী।

37. Benedict— আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

38. Bigamy— দুই বিবাহ।

39. Bilateral Family—দ্বিপক্ষীয় পরিবার।

দ্বি-পক্ষ বলতে এখানে স্ত্রী এবং পুরুষ বোঝান হচ্ছে। সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বণ্টনের সময় স্ত্রী বা পুরুষ, কোন পক্ষই বিশেষ অধিকার দাবী করতে পারেনা—বণ্টন ব্যাপার সমভাবেই হয়।

40. Bilinear— দ্বি-গোত্রধারা।

41. Blood Feud— পুরুষানুক্রমিক বিবাদ।

42. Bodily mortification—দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন।

43. Blue Blood— আভিজাত্য।

44. Blood money— হত্যামূল্য।

দুটি গোষ্ঠীর মধ্য হত্যাঘটিত ব্যাপার যখন অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ করা হয় তখন সেই অর্থকে "হত্যামূল্য" বলে।

45. Bride price— কন্যাপণ।

46. Bride Purchase— কন্যাক্রয়।

47. Buffoonery— ভাঁড়ামি, মস্কারা।

48. Cannibalism— নরমাংস ভোজন।

এই ভোজন ব্যাপার সংকেতধর্মী অথবা সাধারণ হ'তে পারে। অতৃপ্ত ক্ষুধা, হিংসা, ধর্মানুষঙ্গ, বাৎসল্য, অনুরাগ এবং গোষ্ঠী বিচার পদ্ধতির নির্দেশ ইত্যাদি কারণে নরমাংস ভোজন প্রথার প্রচলন দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনেও নরমাংস ভক্ষণ প্রথা চালু থাকতে পারে—এক্ষেত্রে সেটি নিতান্ত আদিম ধর্মাচার সংক্রান্ত ব্যাপার। নরমাংসভোজীদের কুকুরও খেয়ে থাকে।

49 Cannibalism burial—মৃতদেহ ভক্ষণ, মৃতমাংস ভোজন।

মৃতমাংস ভোজনের পশ্চাতে আছে মৃতের আত্মাকে আত্মস্থ করার ইঙ্গিত—অষ্ট্রেলিয়ার লিভারপুল নদীতীরের অধিবাসীরা এই আচার পালন করে।

50. Cannibalism Famine—ক্ষুন্নিবৃত্তি নরমাংস ভোজন।

খাদ্যের অভাবে নিতান্ত জীবনধারণের তাগিদে কোন কোন গোষ্ঠীতে নরমাংস ভোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ব্যাপারটা বিশেষতঃ এস্কিমোদের মধ্যে প্রচলিত।

51. Cannibalism revenge - প্রতিহিংসার নরভক্ষণ।

প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য একগোষ্ঠী পরাজিত অপর গোষ্ঠীর এক বা বহুর মাংস ভক্ষণ করে এবং উল্লাসে তাদের উদ্দেশ্যে ক্রোধাত্মক ও ঘৃণাসূচক বাক্য উচ্চারণ করে।

52. Caste— জাতি। বর্ণ।

53. Caste System— বর্ণাশ্রম প্রথা।

54. Celebacy— চিরকৌমার্য।

55. Ceramics Primitive—আদিম মৃৎশিল্প।

56. Ceremonial— আনুষ্ঠানিক।

57. Ceremony— অনুষ্ঠান।

58. Ceremony, farewell—বিদায় অনুষ্ঠান।

59. Ceremony, funeral—শবযাত্রা অনুষ্ঠান (মৃত্যু) শোকানুষ্ঠান।

60. Ceremony, nubility—বিবাহযোগ্যতাসূচক অনুষ্ঠান।

প্রায় সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে, শুধু আদিবাসী কেন, বহু সভ্য জাতির মধ্যেও, মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হ'লে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

61. Chart— নকশা, তথ্যতালিকা।

62. Chemistry— রসায়নশাস্ত্র/বিদ্যা।

63. Chief— নেতা, গোষ্ঠীপতি, সর্দার, মোড়ল, প্রধান।

64. Chieftaincy— নেতৃত্ব, গোষ্ঠীপতিত্ব।

65. Chronology— কালনির্ঘণ্ট, কালানুক্রম।

66. Civilization— সভ্যতা।

67. Clan— গোত্র, গোষ্ঠী।

68. Clan Organisation গোত্র/গোষ্ঠী সংগঠন।

69. Class— শ্রেণী।

70. Class system— শ্রেণী ব্যবস্থা।

71. Classificatory system—শ্রেণী নির্দেশক প্রথা।

72. Classificatory kinship—শ্রেণী নির্দেশক আত্মীয় সম্পর্ক।

73. Club— সংঘ, সমিতি।

74. Co-eval— সমসাময়িক।

75. Collective ownership—সমষ্টিগত মালিকানা।

76. Collective property—সমষ্টিগত সম্পত্তি।

77. Collective proprietorship—সমষ্টিগত স্বত্বভোগ।

78. Collective responsibility - সমষ্টিগত দায়বোধ।
79. Commensal — সহভোজী।
80. Commensalism — সহভোজিতা।
81. Communal house — গোষ্ঠীনিবাস।
82 Communism — সাম্যবাদ, কম্যুনিজম।
83. Communism primitive - আদিম সাম্যবাদ।
84. Compensation — ক্ষতিপূরণ।
85. Community — সম্প্রদায়।
86. Community endogamous — অন্তর্বিবাহকারী সম্প্রদায়।
87. Concubinage — উপপত্নিত্ব।
88. Concubine — উপপত্নী।
89. Concupiscence — কাম লালসা।
90. Conjngal relationship - দাম্পত্য সম্পর্ক।
91. Connubial — বিবাহ সংক্রান্ত।
92. Connubial status — বৈবাহিক মর্যাদা।
93. Consanguineous — সগোত্র।
94. Consanguineous family -- রক্ত সম্বন্ধযুক্ত পরিবার।
95. Conservatism — রক্ষণশীলতা।
96. Conventional — প্রথাগত।
97. Convergent Evolution — সমধর্মী বিবর্তন।
98. Corporeal property — ভৌতসম্পত্তি।
99. Council of Elders — বয়স্কদের মন্ত্রণাসভা।
100. Cousin — মামাতো, পিসতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাইবোন।
101. Cross Cousin — মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন।
102. Parallel Cousin — খুড়তুতো-মাসতুতো ভাইবোন।
103. Court gester — ভাঁড়, বিদূষক।
104. Craft — হস্তশিল্প।
105. Creation story — সৃষ্টিতত্ত্ব।
106. Cult - ধর্মমত।
107. Cult Fertility — উর্বরতা বিধায়ক ধর্মমত।
108. Culture — সংস্কৃতি, জীবনায়ন।

Terminology of Social Anthropology (in Bengali) by Tushar Kanti Neogi.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কিশোর গ্রন্থালয়। ৬২।৫।১ই, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থাগারের বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট ৪,৬৩৫টি বই আছে। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা মোট ১৮০ জন। আলোচ্য বছরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম-জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-বার্ষিকী, নেতাজী জন্ম-বার্ষিকী ও প্রজাতন্ত্র-দিবস যথারীতি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে: সভাপতি –ডাঃ প্রভাতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—ডাঃ সুজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ প্রভাত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীরঞ্জিৎ শেখর চন্দ্র, যুগ্ম-সম্পাদক –শ্রীশুভেন্দু ভট্টাচার্য, সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক –শ্রীগণেশ বসাক, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅলোক কুমার গুপ্ত, হিসাব রক্ষক—শ্রীবিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্যবৃন্দ –সর্বশ্রী গোলোকপতি রায়, অসিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মজুমদার, নির্মাল্য বসু, তটিনী চন্দ্র ও পরেশ পাল।

নিউ ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী। ১৬৬, নিমু গোঁসাই লেন, কলিঃ ৫

গত ২৫শে আগষ্ট, '৬৭ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আগামী বছরের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। কার্যকরী সমিতিতে আছেন: সর্বশ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য (সভাপতি), রঞ্জিতকুমার সেন (সম্পাদক), তপনকুমার সেন (সহঃ সম্পাদক), মদনমোহন দে (গ্রন্থাগারিক), সুতপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ গ্রন্থাগারিক), সুভাষচন্দ্র সেন (কোষাধ্যক্ষ), শচীনকুমার দত্ত দুলালচাঁদ পাল, প্রভাতকুমার দে, প্রসাদ চাঁদ চন্দ্র, শম্ভুনাথ চন্দ্র, শিবগোপাল ভট্টাচার্য (সদস্যবৃন্দ)।

মিলনী পাঠাগার। নরেন্দ্রনগর, বেলঘরিয়া, কলিঃ ৫৬

গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৭ মিলনী পাঠাগারের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রন্থাগার গৃহের উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় প্রবীণ আইনজ্ঞ শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সরকার। শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "আশাবরী" শিল্পীগোষ্ঠী একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীঅর্ণব সরকার উপস্থিত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৪ পরগণা

বান্ধব পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। সারাঙ্গাবাদ, বজবজ

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সারাঙ্গাবাদ বান্ধব পাঠাগারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার বেরা, শশাঙ্কশেখর মাইতি, তুষার ঘোষ, সমীর মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার দত্ত ও পূর্ণচন্দ্র বসু। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীধর্মদাস বিশ্বাস।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম

গত ২৭শে আগষ্ট, '৬৭ সরকার অনুমোদিত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৪৬শ বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৬-৬৭ সালের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ১০,১২৮ এবং সদস্য সংখ্যা ১১৯ জন। বিভিন্ন গ্রামে এই গ্রন্থাগারের পাঁচটি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সুভাষ পাঠাগার। ফটকদ্বার, কালনা

সুভাষ পাঠাগারের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩১শে আষাঢ়, '৭৪ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন, পুস্তক সংখ্যা ১৯৫০। গত বছর দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যকল্পে পাঠ্যপুস্তকের একটি বুক-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। মোট পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ৫০০। গ্রন্থাগারে নববর্ষ, সুভাষচন্দ্রের জন্ম-দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালন করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :

সর্বশ্রী নিত্যানন্দ দাস (সভাপতি), শম্ভুনাথ লাহা ও সুধীরকুমার দাস (সহঃ-সভাপতি), দিলীপকুমার মণ্ডল (সম্পাদক), মধুসূদন কুণ্ডু ও দীনবন্ধু সাহা (সহঃ সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র রায় (গ্রন্থাগারিক), দিলীপ কুমার মোদক (কোষাধ্যক্ষ), মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুষ্ঠান-সম্পাদক), অমর আদিত্য (পত্রিকা-সম্পাদক), গৌরহরি ভট্টাচার্য, বিশ্বম্ভর গোস্বামী, বিজয়চাঁদ কুণ্ডু, চিত্তরঞ্জন সিংহ, শান্তি সরকার (সদস্যবৃন্দ)।

বীরভূম

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, '৬৭ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ আয়োজিত এক সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা তথ্য আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় ভাষণ দান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমল্লিককে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীমল্লিক ও উপস্থিত সুধীজন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন ও গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন।

মুর্শিদাবাদ

বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার। বালিয়া।

গত ১৫ই আগষ্ট বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার সমিতি ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে সাড়ম্বরে স্বাধীনতাদিবস পালন করা হয়। বালিয়া অঞ্চলের কনভেনর শ্রীপ্রভাত কুমার সিংহ ও বালিয়া গ্রামসভা অধ্যক্ষ শ্রীবৈদ্যনাথ অধিকারী মহাশয় এবং গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রভাত ফেরী গ্রাম পরিভ্রমণ করে এবং একটি রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দান করেন। শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। বিকালে সমিতির সভ্যগণ একটি প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করেন।

মেদিনীপুর

গত ২২শে জুন, '৬৭ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভগবানপুর থানার রজনীকান্ত পাঠাগারের নূতন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীতারাপদ মাইতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস। কবি রজনীকান্তের জীবন ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

হাওড়া

ভারত পাঠাগার। ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

পাঠাগারের বিংশতিতম বাৎসরিক সভার কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৫ জন (সাধারণ বিভাগ), ৬১ জন (কিশোর বিভাগ) এবং মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৬৫৭ খানি।

গ্রন্থ সমালোচনা

ধর্ম্ম পরিচয় (প্রথম ভাগ)—শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲।

ধর্মের ও প্রেমের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানব সমাজ গড়ে উঠেছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সফলতার মূলেও রয়েছে ধর্ম ও প্রেমের উপর বিশ্বাস। ব্যক্তির যখন নিজের বিশ্বাসের উপরে সন্দেহ জাগে, যখন সে তার বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে তখনি তার জীবনে আসে অস্থিরতা, তখনি তার নিজের সঙ্গে নিজের মিল থাকে না। আমাদের আধুনিক সমাজের অবস্থা ঠিক ঐরূপ। সমাজের মানুষ এখন পথহারা—যেন একটা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে—পথের নিশানা নেই! "ধর্ম-পরিচয়" তাদের পথের নিশানা দেবে।

"ধর্ম-পরিচয়" জাতি, ধর্ম, শিক্ষার মান নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির মনেই ধর্ম এবং প্রেমের উপর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে। বইখানি পড়লে মনে হয়, লেখক "যেন গভীর উপলব্ধির সরোবরে অবগাহন করে নির্মল চক্ষু হয়েছেন—সেই দৃষ্টিতে পাঠক ও যেন তার পরমার্থকে দেখে চরিতার্থ হয়ে ওঠে"। লেখক মনন ও সাধন দ্বারা যাহা উপলব্ধি করেছেন—তাহাই লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষ্যকারদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ যদুনাথ সিংহ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং আরো অনেকে যে বইখানির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তা নিরর্থক নয়।

আজকের সমাজের মানুষের মধ্যে এ বইখানির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য বাংলার গ্রন্থাগারগুলি এগিয়ে আসবে বলে মনে করি।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

আকাশ প্রদীপ—সুখরঞ্জন রায় ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৪। শ্রীমিহিররঞ্জন রায় কর্তৃক ১নং রায় বাগান স্ট্রীট, কলিঃ-৬ থেকে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান : এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

'আকাশ প্রদীপ' স্বর্গত সুখরঞ্জন রায়ের একটি কাব্য নাট্য। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। নাটকাকারে এই রূপক কাব্যটি ষোল অক্ষরের দীর্ঘ পয়ারে রচিত। এক হিসেবে একে গদ্য কাব্যও বলা চলে, কেননা, এর ভাষা অনেকটা গদ্যের মতই।

"কল্পনার অভিনবত্ব, প্রতীকময় ভাবের গভীরতা, নাটকীয় ভঙ্গি, ভাষার সাবলীলতা, অলংকার প্রয়োগের স্বকীয়তা এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ও স্বতঃ প্রবাহ, সব মিলিয়ে কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী"—বইখানি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন।

৺সুখরঞ্জন রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। এক সময়ে সাহিত্য সমালোচক ও সুলেখক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যখানি তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরের রচনা হলেও এই রূপক কাব্য রচনায় তাঁর পরিণত মনের ছাপ রয়ে গেছে। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও সে যুগে এটি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেনি। সুখরঞ্জন রবীন্দ্র যুগের কবি ছিলেন। অতি-আধুনিক বাংলা কাব্য অতঃপর বহু মোড় ঘুরে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানেও হয়তো তাঁর এই কাব্যটি একেবারে অচল বলে গণ্য হবে না। সুতরাং এই কাব্যটির পুনঃ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

হিন্দুযুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা—শ্রীহিমাংশু ভূষণ সরকার। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থানঃ (১) পুঁথি-পুস্তক, ৩৪নং মোহন বাগান লেন; (২) মুখার্জী বুক ষ্টল, বড়বাজার, মেদিনীপুর; (৩) গ্রন্থকারঃ অধ্যক্ষ, খড়গপুর কলেজ, মেদিনীপুর। ৮৬ পৃঃ। মূল্য ৪·০০ টাকা।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং দ্বীপময় ভারত বা ইন্দোনেশিয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় সভ্যতার যে প্রসার ঘটেছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতে এই পরম রমণীয় দ্বীপগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের গভীর যোগাযোগের কথা তেমন ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না কিন্তু বৌদ্ধজাতক, বৃহৎ কথা, ইরিথ্রিয়ান-সাগরের পেরিপ্লাস, টলেমির ভূগোল, প্লিনির ন্যাচারালিস হিষ্টরিয়া, চীনদেশের দরবারী ইতিহাস ও অন্যান্য ইতিবৃত্তে, বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, তাম্রশাসন ও শিলালেখে সে যুগের ইতিহাস পাওয়া যাবে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ভারত থেকে হিন্দুরা এসে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ ও জনপদ গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে এখানকার ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে কিন্তু হিন্দুযুগের স্বাক্ষর আজও রয়ে গেছে এখানকার ভাষায়, নাটকে, শিল্পে, লোক-সাহিত্যে ও সামাজিক উৎসবে। এখনো এখানে রামায়ণ-

মহাভারতের নায়ক-নায়িকা নাট্যে আবির্ভূত হয়। এই সকল অঞ্চলের নদ-নদী নগর, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি ভারতীয় (সংস্কৃত) নামের স্বাক্ষর বহন করছে। চিহ্ন রয়ে গেছে এখানকার মন্দিরের কারুকার্যময় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে। ইন্দোনেশিয়ার শিল্পে ভারতের গভীর প্রভাব দেখা যায়। দ্বীপময় ভারত ও ভারতবর্ষের মধ্যে বহুকালব্যাপী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। যবদ্বীপ বা জাভার পশ্চিমাংশে সংস্কৃত ভাষায় পল্লব যুগের অক্ষরে লেখা পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার আদিম ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্ভবতঃ বণিক অভিযাত্রিগণের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারে ঠিক কারা অগ্রণী হয়েছিলেন আজ আর তা নিশ্চয় করে বলার কোন উপায় নেই।

ইতিহাসের যুগে এসে অবশ্য আমরা শ্রীবিজয় ও শৈলেন্দ্র, হোলিঙ্গ, মজপহিত, মতরাম, কদিরি, সিঙ্গসারি প্রভৃতি রাজ্য এবং রাজবংশের ইতিহাস পাচ্ছি। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংস্কৃত অনুশাসনগুলি যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। যবদ্বীপে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় শিল্প-কলার বিকাশ ঘটে। মধ্য যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র রাজগণ অষ্টম শতাব্দীতে দ্বীপময় ভারতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন এবং যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা ও ইন্দো-নেশিয়ার কিছু অংশ শৈলেন্দ্র রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এঁরা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই যুগে ভারতীয় ও যবদ্বীপীয় শিল্পীগণ মধ্য জাভাতে প্রাণ প্রাচুর্য ও শিল্প প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন রেখে গেছেন। এই সকল স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির উভয়ই আছে। যবদ্বীপের দিয়েং অধিত্যকার মন্দিরগুলি, বিশেষ করে 'চণ্ডী ভীম' মন্দির সহজ আভিজাত্য, অলঙ্করণ এবং ভাস্কর্যের দিক দিয়ে গুপ্তযুগের শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া মধ্য যবদ্বীপের জোগ্-জাকার্তা সুরাকার্তা জেলার প্রত্যন্তে অবস্থিত প্রাম্বানান উপত্যকার লোরো জংগ্রাঙ্গের মন্দির, 'চণ্ডী কলসন্' এবং নবম শতকে নির্মিত 'চণ্ডী সেবু' বিখ্যাত। দিয়েং অধিত্যকা এবং প্রাম্বানন উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত কেদুর বিখ্যাত প্রান্তর—এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে 'চণ্ডী মেণ্ডুৎ', 'চণ্ডী পাবন' এবং 'বরবুদুর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি দক্ষিণ ভারতের মামল্লপুরমের রথ, ইলোরার কৈলাসমন্দির এবং বাংলা দেশের পাহাড়পুরের মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্য যবদ্বীপের শিল্পে এই যুগে যে বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায় এই যুগের যবদ্বীপীয় সাহিত্যে অবশ্য তার কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। 'অমর-মালা' ব্যতীত এই যুগে অন্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। কদিরি যুগের আদিম পর্বে কবি ত্রিগুণ 'কৃষ্ণায়ণ' নামক কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ-রুক্মিণীর প্রণোয়োপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে 'সুমন সান্তক' নামে আর একখানি সুন্দর কাব্য রচিত হয়েছিল।

পূর্ব যবদ্বীপে দশম-একাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের আদিপর্ব, ভীষ্মপর্ব, এবং 'শিবশাসন' গ্রন্থ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত হয়। রাজা জয়ভয়ের রাজত্বকালে 'ভারতযুদ্ধ' নামক কাব্যটি রচিত হয়েছিল (১১৫৭ খৃঃ)। এ ছাড়া 'হরিবংশ', 'স্মরদহন' এবং সম্ভবতঃ 'ভোমকাব্য'টিও এই সময়েই রচিত হয়েছিল।

সিঙ্গসারি রাজ্যের প্রাধান্যকালেও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। 'চণ্ডী কিদল', 'চণ্ডী সিঙ্গসারি', 'চণ্ডী জাগো' প্রভৃতি এই যুগের অন্যতম বিখ্যাত মন্দির। ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে সিঙ্গসারির প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে 'রাজপতিগুণ্ডল' নামক গ্রন্থ এবং 'পার্থযজ্ঞ' কাব্যটি খ্যাতি লাভ করেছিল। মনে হয় মজপহিত যুগেও বিশেষভাবে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল, কিন্তু প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোন্‌টি এ যুগের রচনা তা বলা শক্ত।

এ যুগের স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'চণ্ডী পনতরনের' মন্দিরগুচ্ছ। এতে রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ-এর বিভিন্ন দৃশ্য মন্দিরের গায়ে রিলিফে আঁকা হয়েছে। যাই হোক, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে ও দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকীরণের এই যুগের স্বাক্ষর রয়ে গেছে পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরে, মধ্য জাভার হোলিন্দ নামে, যবদ্বীপের প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষরে; প্রাচীন চাম ও খে্মর ভাস্কর্যের গুপ্তযুগের রচনাশৈলীতে, প্রাচীন ফুনানের অলংকরণ রীতি এবং সোমসূত্রের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রীতির সামঞ্জস্যে চম্পা-কম্বুজের বিভিন্ন যুগের হস্তাক্ষরে। এখানে 'এক সময়ে রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ, দরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত, স্থাপত্যশিল্প ছিল ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সমাজে চতুর্বর্ণের প্রচলন ছিল। যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, দূরত্ব ও কালমাপক শব্দ, কাব্য, ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথা, আইন-কানুন, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে এই অঞ্চল একসময় এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ রচনা করেছিল। এখানকার অধিবাসিগণ আজও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বাস করে।'

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার একজন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক ও ভারত-বিদ্যাবিৎ। দ্বীপময় ভারত সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাত্মক পুস্তক আছে। তাঁর 'Indian influences on the Literature of Java and Bali' গ্রন্থখানির অনুরূপ অন্য কোন গ্রন্থ না থাকায় এখনো ইউরোপীয়, আমেরিকার এবং অষ্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এটি পঠিত হয়ে থাকে। ১৯৬৪ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক ভারতবিদ্যাবিদ্‌গণের কংগ্রেসে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার একটি শাখার (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) মূল্যায়ন করেন এবং ঐ শাখার সম্পাদক হিসেবে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।*

---

* Sarkar, H. B—South-East Asian studies. In 'Oriental studies in India: 26th International Congress of Orientalists', New Delhi, 1964, pp. 123—132. দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপীয় ভারতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণই এই শাখাটিতে প্রধানতঃ গবেষণা করেছেন। ১৯৩০ সাল থেকে যে কয়জন সুপণ্ডিত ভারতীয় ঐতিহাসিক এ বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, ডঃ বি, সি, ছাবরা, এবং শ্রীযুক্ত হিমাংশু ভূষণ সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থকার যে বাংলাভাষায় এই ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেছেন এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আলোচ্য পুস্তকটি মূল গ্রন্থের মাত্র প্রথম পরিচ্ছেদ। সমগ্র পুস্তকখানিতে মোট ২৭টি অধ্যায় আছে। স্বভাবতঃই এরূপ একটি সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ—যা কিনা আবার উপন্যাসও নয়,—প্রকাশ করতে বাংলাদেশের খুব কম প্রকাশকই আগ্রহী হবেন। মেদিনীপুরের 'মাধবী প্রেস'কে ধন্যবাদ যে তাঁরা এই বইখানি ছাপার ফলে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বাধুনিক গবেষণার পরিচয় বাংলা ভাষায় পাঠকদের জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে আলোচ্য গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ও বানান ভুল দেখা গেল যেটা এই ধরনের বইতে না থাকলেই ভালো হত। যাই হোক, আমরা পূর্ণাঙ্গ পুস্তকখানি প্রকাশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

দর্শক। ৮ম বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা; ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭। সম্পাদক: রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ২৪ পৃঃ। মূল্য ১'০০ (প্রতি সংখ্যা: ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫ পয়সা; বার্ষিক সডাক ৫'০০ টাকা)।

'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ' পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা 'দর্শক'-এর এই পূজা-সংখ্যাটি দেখে আমরা বিশেষ আনন্দিত হলাম। যদিও 'দর্শক' নাট্য পরিষদের পত্রিকা, কিন্তু নাটকই এর একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। চিত্রকলা, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, আলোক-চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, সমাজ ও অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি বহুমুখী আলোচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। অন্যান্য বিষয়ের মত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এবং বইয়ের খবরও এতে থাকে। বিশেষ করে চিত্রকলা, স্থাপত্য ও শিল্প সংক্রান্ত ফোটোগ্রাফ ও স্কেচ পত্রিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই পত্রিকার আলোচনা রুচিপূর্ণ, সুস্থ ও বলিষ্ঠ। বিভিন্ন বিভাগের লেখকদের আলোচনাগুলি সংবেদনশীল মন ও গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। রচনাগুলির কোনটি স্বাক্ষরযুক্ত, কোনটি স্বাক্ষর বিহীন। আলোচ্য সংখ্যাটিতে আছে: দর্শকের কথা (সম্পাদকীয়); গগনেন্দ্র নাথ—অশোক ভট্টাচার্য; জন ভারমিয়ার; কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র—ডঃ হাইন্‌স মোডে; আমাদের নাট্য সমস্যা; ছো-নাচের আদিকথা—সুধীর কুমার করণ; শিল্প গবেষণার পঁচিশ বছর—সুধাংশু চৌধুরী; চলচ্চিত্রের ব্যবহারিক দর্শন—বারীন সাহা; শার্ল বোদলেয়ার সম্পর্কে তক্ক বক্ত—পল্লব সেনগুপ্ত; কবিতার ছবি—অমিতাভ দাশগুপ্ত;

সোভিয়েতে রবীন্দ্রনাথ; ভাস্কর্য সম্পর্কিত চিন্তানিচয় —দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী; সরকারী ঋণ; মুঘল ক্ষুদ্র চিত্রাবলী; শিল্পবার্তা; একটি বিস্মৃত শিল্প; নৃতত্ত্ব; সঙ্গীত এবং আরো কয়েকটি লেখা।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

LIBRARIAN : Journal issued on the occasion of re-union of the students of the Deptt. of Library Science, Jadavpur University. V. 1. Aug. 12, 1967. Published. by the Students' Re-union Committee, Deptt. of Library Science, Jadavpur University, Calcutta. 32

ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথাগত ভাবে প্রকাশিত স্মারক-পত্রিকাগুলি স্বভাবতই গতানুগতিক। সংখ্যাগতভাবে এগুলির বংশবৃদ্ধি ঘটলেও গুণগত মূল্যায়নের পর উল্লিখিত হবার মতো কিছু থাকে না। এবং যেহেতু পাঠকবর্গের স্মৃতিতে এগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় না, সেহেতু লেখকবর্গও প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনাগুলির গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে কদাচিৎ সচেতন হন।

এ-সকল বাধা, অসুবিধা ইত্যাদি বর্তমান জেনেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থিবর্গ তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে সমালোচ্য এই যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন, যা নিয়মিত প্রকাশনার আপাত সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল— এ-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উল্লিখিত হবার মতো।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে ত্রুটি, অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি অবহেলা ও সর্বোপরি সবক'টি লেখায় উচ্চমান বজায় না থাকা সত্ত্বেও এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ এ-কারণে যে, এটি প্রকাশ করেছেন এরূপ একদল ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সদ্য পদক্ষেপ করলেন; অথচ তাঁদের এই প্রথম প্রচেষ্টাতেই তাঁরা এ-বৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে প্রখর চেতনা ও গভীর দরদের পরিচয় দিলেন। এ-কথা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখাটি এরূপ একটি সংকলনে প্রকাশের জন্য না দিলেই বোধহয় ভাল করতেন।

আশা করা যায়, আগামী বছরে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত করে আরো উন্নত-মানের একটি সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

পরিষদ কথা

কাউন্সিলের প্রথম সভা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পঠিত হয় এবং নতুন বছরের আয়-ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সভায় কাউন্সিল থেকে কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত সভ্য/সভ্যাবৃন্দ নির্বাচিত হন।

সর্বশ্রী চঞ্চলকুমার সেন, তুষার সান্যাল, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, প্রবীর রায়চৌধুরী, বাণী বসু, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও সুনীলবিহারী ঘোষ।

এরপর অন্যান্য উপ-সমিতিগুলি গঠিত হয়। পদাধিকার বলে প্রতিটি উপ-সমিতিতেই এঁরা থাকবেন :—

পরিষদের সভাপতি ; কর্মসচিব ; কোষাধ্যক্ষ ও 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক।

আয়-ব্যয় সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অশ্বিনীকুমার সেন, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী ও পূর্ণেন্দু প্রামাণিক।

কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিকা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

সভ্য/সভ্যাগণ : সর্বশ্রী তপন সেনগুপ্ত, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রবীর দে, মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ঘোষ, সুনীলবিহারী ঘোষ, সুবীর ঘোষ ও হিরণ দত্ত।

গৃহনির্মাণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অনাথবন্ধু দত্ত, গুরুশরণ দাশগুপ্ত, গোবিন্দ মল্লিক, দিলীপকুমার বসু, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সরলবন্ধু দত্ত।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি

সভানেত্রী : শ্রীমতী বাণী বসু
সম্পাদক : শ্রীঅশোককুমার বসু

সভ্য/সভ্যাগণ : সর্বশ্রী অরুণকুমার রায়, অরুণা চক্রবর্তী, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়, তুষার সান্যাল, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, নারায়ণ চক্রবর্তী, বিভাবসু ঘোষ, সুনীল দে ও হিরণ দত্ত।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি : ডঃ আদিত্যকুমার ওহ্‌দেদার
সম্পাদক : শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সভ্য/সভ্যাগণ : সর্বশ্রী অনবদ্য সান্যাল, অমিতা মিত্র, কৃষ্ণা দত্ত, গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, তপনকুমার সেনগুপ্ত, দেবেশচন্দ্র রায়, পঙ্কজকুমার দত্ত, বাণী বসু, সত্যব্রত সেন ও সুনীলবিহারী ঘোষ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু
সম্পাদক : শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ

সভ্যগণ : পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষকবৃন্দ ও পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং সর্বশ্রী চঞ্চলকুমার সেন, দিলীপ কুমার বসু, দীনেশচন্দ্র সরকার, ফণিভূষণ রায় ও সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : শ্রীতুষার সান্যাল

সভ্যগণ : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমন্বয় সমিতিতে মনোনীত পাঁচজন প্রতিনিধি এবং সর্বশ্রী অশ্বিনী সেন, জহর দাশগুপ্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী, প্রবীর দে, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সত্যব্রত সেন।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি : শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

সভ্য/সভ্যাগণ : কাউন্সিলের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগত সভ্য এবং সর্বশ্রী অমিতা মিত্র, অমিতাভ বসু, অরুণ রায়, অশোককুমার বসু, অশ্বিনী সেন, কৃষ্ণা দত্ত, গীতা মিত্র, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ মল্লিক, চঞ্চলকুমার সেন, জহর দাশগুপ্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব সিংহ, প্রবীর দে, প্রবীর রায়চৌধুরী, বিনয় রায়, বিভাবসু ঘোষ, মদন মল্লিক, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শীলা গুপ্ত, সত্যব্রত সেন, সুচিত্রা ঘোষ ও সুবীর ঘোষ।

Association Notes.

পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিল

গত সংখ্যায় প্রকাশিত অর্থ সাহায্যের বিবরণের পরে আরও যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য তহবিলে জমা পড়েছে (২০.১০.৬৭ পর্যন্ত) তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—	২০৲
„ বীণা সেনগুপ্ত—	২৫৲
„ অশোক বসু—	৫৲
„ নমিতা মুখোপাধ্যায়—	২৲

গ্রন্থাগার কর্মি-সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌন মিছিল

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার-কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও এশিয়েটিক সোসাইটির কর্মিবৃন্দ তাঁদের দাবীর সমর্থনে মৌন মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে অগ্রসর হন। মিছিলটি গিয়ে রাজভবনের কাছে পৌঁছবার থানিকটা আগেই এসপ্ল্যানেড ইস্টে পুলিশ কর্তৃক মিছিলের গতিরুদ্ধ হয় এবং মিছিলের পদাতিকগণ সেখানেই বসে পড়েন। মিছিলে দুই শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী যোগ দিয়েছিলেন।

অতঃপর এক প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এ যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন: সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর দে, তুষার সান্যাল, অনিল দত্ত, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, দ্বিজেন গুপ্ত প্রমুখ দশজন। শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সম্বলিত একটি স্মারকপত্র প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দেন। এই স্মারকপত্রে বলা হয়, নতুন বেতনক্রমে কেবলমাত্র স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে; তাছাড়াও যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন এতে তাঁদের সম্পর্কে কিছু করা হয়নি। এ বিষয়ে ভারত সরকার নিয়োজিত লাইব্রেরী এ্যাডভাইসরি কমিটির সুপারিশও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীর অবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের তিন মাস পর পর বেতন প্রাপ্তির অবসান, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ন্যায় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে একই রকম বেতন ও ভাতার প্রবর্তন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের জন্য এই স্মারকপত্রে দাবী করা হয়।

এই সকল দাবীর অনেকগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও দাবী পূরণের কোন আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। গত ১লা আগস্ট শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে তাঁরা একটা কিছু করবেন। যাই হোক, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সকল দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি-দলকে আগামী ২৪শে অক্টোবর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হন। ২৪শে অক্টোবরের এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে মনে করা হচ্ছে।

এশিয়েটিক সোসাইটির এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীদ্বিজেন গুপ্ত সোসাইটির কর্মীদের প্রাইভেট কলেজের অ-শিক্ষক কর্মীদের মত অর্থাৎ প্রবীণ কর্মীদের ৫৮৲ টাকা এবং নবীনদের ৫৩৲ টাকা ভাতা দেবার সুপারিশ করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বরের এই মৌন মিছিল কলকাতার রাজপথে গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বিতীয় মৌন মিছিল। তপূ ইর্বে শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকগণ গত ১লা আগস্ট মিছিলে

সামিল হয়েছিলেন। এবারে তাঁরা নিজেরাই মিছিল বের করলেন। অসংখ্য পোষ্টার ও ফেস্টুন শোভিত মিছিলটি যখন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বার হয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে রাজভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন পথের দুপাশে অনেক কৌতুহলী লোকের ভীড় জমে যায়। অবশ্য মিছিলের নগরী কলকাতায় গ্রন্থাগার কর্মীদের এই মিছিল শহরবাসীর মনে কতটুকু দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদাই বা সত্যিকারের কি, সে বিষয়ে যদিও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তবু পশ্চিম বঙ্গের দূর দুরান্তর অঞ্চলের গ্রাম ও শহর থেকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে যে সকল গ্রন্থাগার কর্মী মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের দাবী কিন্তু সামান্যই; দীর্ঘদিন অবহেলিত ও উপেক্ষিত এই সকল গ্রন্থাগার কর্মী তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং বাঁচবার মত বেতন চান।

এই মিছিল থেকে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট হল যে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের কিছু কিছু কর্মী এই মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন তবু কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত প্রায় ১০০০ গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে বড় জোর ৫০ জন এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সে তুলনায় অনেক অসুবিধা সত্বেও মফঃস্বল থেকে অনেক বেশী গ্রন্থাগার কর্মী এসেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন '৬৭
হাওড়া শাখা—২য় বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৮শে মে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীতে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক শ্রীকৃষ্ণকুমার মজুমদারের আহ্বানে হাওড়া জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথি শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার এম-এল-এ মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীপ্রবীরকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচঞ্চলকুমার সেন।

জেলার ৩৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ৭২জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া ভাষণ দেন।

সম্মেলনের জন্য কুপন ব্যবহার করিয়া প্রতি লাইব্রেরী সদস্য ও লাইব্রেরী দরদী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১০ পয়সা সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে কোন সদস্য বা অতিথিদের নিকট হইতে কোন "ডেলিগেট ফি" ও "মিল চার্জ" গ্রহণ করা হয় নাই।

Library Workers in the News.



এই সংখ্যায়

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৭ | ১৩৭৪, কার্তিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

২০শে ডিসেম্বর

২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। গত দশ বছরের অধিককাল ধরে এই দিবসটি পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে। ঐ দিন থেকে এক সপ্তাহ রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার সপ্তাহও পালিত হয়ে থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসরই রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার দিবস তথা গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানান। সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির তরফ থেকেও অনেকবার গ্রন্থাগার দিবস এবং সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানিয়ে গ্রন্থাগারগুলিতে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। প্রথামতো এ বৎসরও পরিষদের তরফ থেকে গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের জন্য একটি কর্মসূচী স্থির করা হয়েছে। যদিও এই আবেদন বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আজ কতখানি সাড়া জাগাতে সক্ষম সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তবু পরিষদ কোন বৎসরই তার এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন না।

দেখা যায়, যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যই যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ হয় পরবর্তীকালে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি হারিয়ে ক্রমশঃ গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়। এইরূপ গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচারে যাঁরা প্রথম উদ্যোগী হন তাঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাঁদের কাছে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সজীব এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নেহাৎ চলে আসছে বলেই প্রথাগতভাবে দিবসটি পালন করা উচিত মনে হলে বিষয়টি তার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে এবং তা কারো মনে কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হয় না। গ্রন্থাগার দিবস বা সপ্তাহ পালন করতে গিয়ে আমাদের সহযোগী গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের একথা মনে রাখতে হবে। এ থেকে একথা কেউ যেন মনে না করেন যে, গ্রন্থাগার দিবস বা সপ্তাহ পালনের প্রয়োজন বুঝি বর্তমানে ফুরিয়েছে। বরং আমাদের মনে হয়, গ্রন্থাগার দিবস বা সপ্তাহ পালনের প্রয়োজন এখনই সর্বাধিক।

আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল অবস্থার বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও তার অনেক কিছুই অপূর্ণ এবং অনায়ত্ত রয়ে

গেছে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা বলা যায়। পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালনের যে সব কর্মসূচী এবারে রাখা হয়েছে তা আশা করি খুবই সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে সকলেই স্বীকার করবেন। স্থানীয়ভাবে এই কর্মসূচীর কিছু কিছু অদলবদল করা চলে কিন্তু এর কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় গ্রন্থাগারগুলি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরাও যেন বিষয়গুলির ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে, অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী তোলার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য জনমত গঠন ও উপযুক্ত প্রচার প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের এবং শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠস্পৃহা সৃষ্টির বিষয়টিও সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হবে এবং শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা যত বাড়বে গ্রন্থাগার আন্দোলনও সেই পরিমাণে এগিয়ে যাবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে ভারতবর্ষের আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। অথচ অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষর ছিল। ১৯৬১ সালেও কিউবাতে অন্তত ২৫% ভাগ লোক নিরক্ষর ছিল; এখন সেখানে নিরক্ষরতা একেবারেই নেই। কিউবা অবশ্য ছোট দেশ। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণে সম্প্রতিকালে চীনেরও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কর্মসূচীতে স্থানীয় অঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে লোকান্তরিত বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এরূপ বহু ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁদের নাম আবার লোকের স্মৃতিতে জাগরূক হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার কার্যক্রমের অন্তত: কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব বলে মনে করি।

এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। এই কয়েকদিন পূর্বেই কলকাতায় আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম প্রচার সপ্তাহ পালিত হল। গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংগ্রহশালার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং এ দুইয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে। বিশেষ করে, পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে সংগ্রহশালাও রয়েছে দেখা যাবে। যত্নের অভাবে এই সকল সংগ্রহশালার দ্রব্যগুলি যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি আবার বহু মূল্যবান জিনিস আদপেই সংগৃহীত না হয়ে লুপ্ত হতে বসেছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা সংস্কৃতি কর্মী, সুতরাং এবিষয়েও তাঁদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

আশা করি বাংলা দেশে গ্রন্থাগার সপ্তাহ ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ঘটবে। উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই সকল কর্মসূচী পালনের জন্য এগিয়ে আসবেন বাংলা দেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা। কেননা, দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদেরও অনেকখানি। গ্রন্থা৲ার দিবসের তাৎপর্যের প্রতি আমরা তাঁদের এবং সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

Editorial : 20th December.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ডক্টর শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।

মিঃ মুখার্জী, প্রফেসার চ্যাটার্জী, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—

আজ আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারা আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগে আমি প্রায় শুরু থেকে জড়িত আছি। তাই আজকের অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণ আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, শিক্ষকতা বৃত্তি থেকে যখন আমি গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করলাম (আমি গ্রন্থাগারিকের পদ বলছি কেননা সে সময় গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি বলে কিছু ছিল না), এই পরিবর্তনের দু'বছর বাদে আমি সংবাদপত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সংবাদ পড়লাম। এরপর দু'বছরে, এমন কি, তিন বছর পর্যন্ত আমরা এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু শুনি নি। কিন্তু ১৯২৯ খৃঃ আমি দেখলাম কবি কলকাতায় গ্রন্থাগারিক-দের অধিবেশনে একটি ভাষণ দিয়েছেন। ততদিন মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা যখন এই বইখানি সাজিয়ে তুলছিলাম তখন সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার খবর প্রকাশিত হল। তক্ষুনি পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে আমি আমাদের জাতীয় কবির কাছে ঐ বক্তৃতা আমাদের গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলাম। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সংগে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রাচীন প্রবাদ আছে যে "সুহস্ত" দ্বারা কোন কিছুর সূচনা হলে তা ক্রমশঃ আরো বিকশিত হতে থাকে। এখন এই প্রাচীন প্রবাদের দুটি উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সমস্ত বছরগুলিতে বিকাশ লাভ করেছে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদও উন্নতি করেছে। তিনি আমাদের প্রথম প্রবন্ধ দিয়েছিলেন। ফলে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে। আমার পুরানো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে। সাধারণতঃ আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষপাতী। কিন্তু আজ আমি স্মৃতি রোমন্থনের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ১৯২৯ খৃঃ আমাদের কবির প্রবন্ধ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং পরের বছর প্রথম বারের জন্য আমার কলকাতা দেখার সুযোগ হয়েছিল। বেনারসে প্রথম অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স ডাকার ফলে এই সুযোগ ঘটে এবং তাঁরা একটি গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপনা করে আমাকে তার ভার গ্রহণ করতে বললেন। কাজেই আমার বেনারসে যাবার পথে কলকাতা হয়ে গিয়াছিলাম। সেই সময় কলকাতায় আমার বন্ধু সুশীল ঘোষই ছিলেন একমাত্র লোক যাকে আমি বিশেষভাবে চিনতাম ; যিনি পেশার দিক দিয়ে শিক্ষক ছিলেন কিন্তু আমি মনে করি তিনি ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং নিখিল ভারত

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদেরও একজন একনিষ্ঠ কর্মসচিব। আমি তাঁকে লিখলাম। তিনি এসে আমার সংগে দেখা করলেন এবং আমায় রাণীশংকরী লেনে নিয়ে গেলেন। আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন আমার পক্ষে এর ফল কি হয়েছিল। আমাকে সরাসরি কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আমি গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা এবং রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনার জন্য তাঁর উদ্যম দেখে তৎক্ষণাৎ চমৎকৃত হয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ভাষণ দিতে বললেন। সেই প্রথম আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মঞ্চে উপস্থিত হলাম। এটা ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। সেই অনুষ্ঠানে আমার আর একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সভাপতির আসন যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন এমনই একজন যাঁকে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি আমাদের কাছে ব্যক্তির চাইতে নামেই বেশী পরিচিত; কেননা, আমরা তাঁকে কখনও দেখি নি। আমি অত্যন্ত আনন্দ ও পরিতৃপ্তির সংগে দেখলাম যে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। এইদিনের অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে একজন বৈজ্ঞানিকের এতদূর আবেগ-প্রবণতা থাকতে পারে। আমার বক্তৃতার পর বৃদ্ধ পরিপূর্ণ আশীর্বাদ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন "গ্রন্থাগার বেড়ে উঠবে।" আমার সেই কথাগুলি মনে আছে।

আমরা যখন বেনারসে গেলাম কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। সেই সাথে ছিলেন বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একজন হিতকারী টি, সি, দত্ত। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ আমাদের সাথে নেই। এঁদের দুজনের কেউই গ্রন্থাগারিক নন। একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন জমিদার এবং একজন গ্রন্থাগারিক একত্রে বেনারসে গেল। আমরা ওখানে দু'তিন দিন কাটিয়েছিলাম এবং আমাদের কাজের মধ্যে মুখ্য বস্তু ছিল সম্মেলনের জন্য আমি যে আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করেছিলাম তা নিয়ে আলোচনা করা। প্রতিটি ধারা এমন কি তার চাইতেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ আপনারা আইনসভায় যে আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেন তার চাইতে বেশী আগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনা কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে এতদূর স্পর্শ করেছিল যে, তিনি তখুনি আমায় বললেন— "আমি আপনাকে কলকাতায় কয়েকদিন না কাটিয়ে মাদ্রাজ ফিরে যেতে দোব না।" আমি বললাম —'আমাকে আমার গ্রন্থাগার দেখতে হবে, আমাকে যেতেই হবে।" তিনি বললেন—"না, আমি আপনাকে যেতে দিতে পারব না।" আমি বললাম—"ব্যাপারটা কি, স্যর?" তিনি বললেন—"দুটি বিষয় আছে। আমি আপনাকে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সারি দেখাব। এ হ'ল প্রথম ব্যাপার।" বাস্তবিক আমরা ফিরে এলে তিনি এখান থেকে শুরু করে তাঁর স্বগৃহ বাঁশবেড়িয়া শহর পর্যন্ত একটি গ্রন্থাগার মিছিলের বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমার মনে নেই আমরা কত

গ্রন্থাগার দেখেছিলাম। আমার মনে নেই কত 'আধ পেয়ালা দুধ' আমাকে পান করতে হয়েছিল। যেখানেই আমি গেছি অন্য সবার জন্য চা কিম্বা কফি এবং আমার জন্য এক পেয়ালা দুধ আমার বক্তৃতার মূল্য স্বরূপ দেওয়া হচ্ছিল। এই প্রথম আমি নির্বাচনী ঢঙে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি কখনই নির্বাচনী কাজ করি নি। আমাকে প্রায় প্রতি দশ মিনিটে বক্তৃতা করতে হচ্ছিল। থামা, তারপরই বক্তৃতা করা, এইভাবেই চলতে থাকল। সেই হল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

তারপর ফিরে এসে আমি জিগ্যেস করলাম—"দ্বিতীয় বিষয়টি কি?" "দ্বিতীয় বিষয়টি হল আপনি আমার বাড়ী আসুন। আমরা বসে এই আদর্শ আইনটিকে বাংলা দেশের উপযোগী করে নোব।" তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। আমরা পুরো একদিন বসে এই আদর্শ আইনটিকে বাংলা দেশের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের খসড়ায় পরিবর্তন করলাম। তিনি আইন সভার একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি এটিকে আইন সভায় উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তখনকার দিনে কোন আইনে অর্থসংক্রান্ত কোন ধারা থাকলে, আমার ঠিক মনে নেই গভর্ণর জেনারেল কিম্বা ভাইসরয়ের —যাই হোক একই ব্যক্তি—অনুমোদন ছাড়া উত্থাপন করা চলত না। যাই হোক, তার কাছে গেল এবং উত্তর হল "অননুমোদিত।" খুব সরল জবাব। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এবং কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় তখন কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যেহেতু এতে কয়েকটি আবশ্যিক অর্থসংক্রান্ত ধারা ছিল তাই তাকে বলা হল—"এটি অননুমোদিত হল।" কিন্তু তার উদ্যম কখনও হ্রাস পায় নি। তিনি আইনসভায় প্রস্তাব তুলে, বাইরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং তার উদ্যমের শীর্ষবিন্দু আমি প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৩৩ সালে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কতগুলি ভাষণ দিচ্ছিলাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম, কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সব কটি বক্তৃতা শুনতে সময়মত হাজির হয়েছিলেন। মাদ্রাজ রাজ্যের অন্য কোন গ্রন্থাগারিক সেগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এগুলি শিক্ষকদের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে নিতান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। পরে আমি শুনেছিলাম, (আমি আশা করি আমি যে খবর পেয়েছি তা নির্ভুল) তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি *১৯৩৬এ কিম্বা তার কাছাকাছি মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমি যখন আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিতে যাই তখন কেউ একজন আমায় এ কথা জানান এবং বলেন যে আমি দ্বিতীয় ভারতীয় যে এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে। যখন আমি তাদের জিগ্যেস করলাম কে তিনি [প্রথমজন], নতুনেরা তার নাম মনে করতে পারবেনা, কেমনা, এই নাম এতগুলি শব্দের সমষ্টি যা পশ্চিমের লোকেরা সহজে মানিয়ে

(* ১৯৩৫ খৃঃ এই সম্মেলন হয়েছিল)

উঠতে পারে না। পরে আমি মিলিয়ে দেখেছিলাম এ তিনিই। তাঁর উদ্যম সর্বদাই তার সাথে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর জীবদ্দশায় বিলটি আইনে পরিণত হয় নি। আমি জানি তখন থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারে পরিষদ বিলটিকে আইনে রূপান্তরিত করবার জন্য চাপ দিচ্ছে। যাই হোক, আমি কামনা করি স্যার, আপনি (শ্রীশৈলকুমার মুখার্জী) আইন-সভায় থাকাকালীন বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল, আমি আশা করি, আপনি শীগগিরই আইনসভায় ফিরে আসবেন এবং যেভাবে আপনি এই ভবন সম্ভব করে তুলেছেন, তেমনি আপনার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গীয় সাধারণ—গ্রন্থাগার আইনকে বাস্তব করে তুলবেন।

যাই হোক, বাংলার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মাদ্রাজে শিক্ষালাভ করলাম। কাজেই কাজেই যে মুহূর্তে আমি মাদ্রাজ ফিরে এলাম, আমি মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদকে সমস্ত ঘটনা বললাম। আমরা সমস্ত shall গুলোকে may তে পালটে দিলাম—may give money, may estblish library,—may, may ইত্যাদি। তখন আমরা দিল্লী থেকে থেকে অনুমতি পেলাম। কিন্তু যখন আমরা বিলটি পরিষদের সামনে উপস্থিত করলাম তখন অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে গেল।

যখন বিলটি পাশ হবার মুখে, সরকারের একজন আই. সি. এস. কর্মসচিব, পদাধিকার বলে সদস্য বা মনোনীত সদস্য, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"প্রথমতঃ একটি সংশোধনী প্রস্তাব, যে এই আইন অনুমোদিত নিশ্চয়ই হবে—আমার ঠিক কথাগুলো মনে নেই—এই হল সারাংশ—যদি এই আইন অনুমোদিত হয় তাহলে যে সমস্ত স্থানীয় সংস্থা নিজস্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পাবার ক্ষমতাধিকারী হবে তারা রাজ্য সরকারকে সরকার কর্তৃক ধার্য কিছু টাকা দেবে—কি জন্য ?—অতিরিক্ত ডাক মাশুলের জন্য—ষ্টেশনারী খরচের জন্য এবং চিঠি পত্রাদি চালিয়ে যাবার কেরাণী খরচের জন্য। তখনকার দিনে এই ছিল সরকারী মনোভাব। আমরা জানতাম না তখন কি করা যায়। যদি আমরা ওই সর্ত মেনে নিতাম তাহলে নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আইনের ইতিহাসে মাদ্রাজ ইতিহাস রচনা করতে পারত। স্বাভাবিক ভাবে সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে টাকা আসে স্থানীয় কাজকর্মের জন্য। মাদ্রাজ চেয়েছিল টাকা স্থানীয় সংস্থা থেকে সরকারের কাছে যাক। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে ভাবলাম। আমরা অপেক্ষা করলাম। আমরা জেনেছিলাম ১৯৩৬-এর আইন বলবৎ হবে। আমরা এটিকে প্রত্যাহার করে নিতে চাই নি। আমরা কোন চাপ সৃষ্টি না করে চুপ করে রইলাম। আমি স্যর আপনাদের আইনসভার আখ্যা জানি না, বিলটির আইন সভার সংগেই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

যাই হোক, ১৯৪৬-এ যেমনি আমরা আমাদের নিজেদের সরকার পেলাম, আমরা প্রায় পেয়েছিলাম, যদিও আসলে পেয়েছিলাম '৪৭এ। মাদ্রাজের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী যে ছাত্রাবস্থায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করত, যখন আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম, ততদিনে আমি উত্তরে চলে গিয়েছিলাম, আমায় বললেন, "স্যর, এখন আমি

একজন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছি। আমি আমার পুরানো দিনপঞ্জী দেখছিলাম। যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বসতাম তখন আমি এই দিনপঞ্জীতে লিখে রেখেছি যে প্রত্যেক শহরের এই ধরনের একটি গ্রন্থাগার থাকা উচিত। আমি দিনপঞ্জীর মধ্য দিয়ে অতীতে ফিরে গেলাম। এটি পড়ে ফেললাম। আমি জানবার চেষ্টা করছিলাম কি করে করা যেতে পারে। আমি আপনার কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তাঁরা বললেন আপনি অন্তর্ধান হয়েছেন। আমি আনন্দিত যে আপনি ফিরে এসছেন।" আমি তাকে বললাম "আপনি ভুলে গেছেন যে ডাক ব্যবস্থা বলে একটা কিছু নিশ্চয়ই এখানে আছে।" যাই হোক, পরদিন আমি একটি বিল ও বিশ বছরের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার স্মারকলিপি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি করলেন এবং এটাই হল ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন। আজ এটি দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। এটি উভয়ত মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ও অন্ধ্র প্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি মহীশূর সরকার মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ করেছে।

প্রতি বছর যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমার তরুণ বন্ধুরা হয় তাঁদের সম্মেলন কিম্বা পুনর্মিলন উৎসবের জন্য একটি বাণী চেয়ে পাঠান, একটি বিষয় যা বরাবর পাঠান হচ্ছে তা হল—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইন সংবিধানে তোলার কি হোল। আমি জানি তাঁরা এ বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। আমি আশা করি খুব শীগগিরই আইন পাশ হবে। যাই হোক, অন্য রাজ্যগুলির সাথে তুলনা করে একটি বিষয়ে আমি সন্তোষলাভ করছি। মাদ্রাজ সরকার বা অন্ধ্র প্রদেশ সরকার আইন মারফত যে অর্থ দিচ্ছে আপনাদের সরকার প্রায় সেই অর্থ যোগাচ্ছে। আপনারা হয়ত জিগ্যেস করতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজন কি? এই আয়, এই অর্থ সমগ্র এলাকায় সমবণ্টনের জন্য এবং এর ব্যবহার কার্যনির্বাহকদের খেয়াল খুশীর ওপর যাতে নির্ভরশীল না হয় তার জন্য এই আইন কাম্য। কয়েক বছর আগে আমি যখন এখানে ছিলাম তখন আমি এই প্রশ্নটি অনুধাবন করেছি। আমি দেখেছি অর্থ কি ভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আমি নিশ্চিত আমার সহকর্মীরা এর যথার্থতা যাচাই করবেন। আমি বলেছি জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের স্বার্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থ ব্যয় করার পন্থা এ নয়। আমি এমনকি এখনও আশা করি যে, সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পেতে বাংলাদেশ অন্ততঃ চতুর্থ রাজ্য হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি গ্রন্থাগার ভবন পেতে উদ্যোগী হয়েছেন। এতে আপনারা আসল কিছু পেলেন। এদেশে অন্য কোন রাজ্য পরিষদ এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগার ভবন পায় নি। আমার নিজের সংস্থায় আমি গত দশ বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছি। আমি এখন এর সভাপতি হয়েছি। একটি ভবনের জন্য আমরা আমাদের নিজেদের কুড়ি হাজার টাকা রেখেছি। তারপর আমরা ভারত সরকারের সাথে চল্লিশ হাজার টাকার অনুমোদনের জন্য বন্দোবস্ত করলাম। কিন্তু মাঝ পথে এতরকম বাধা দেখা দিল যে তা আদায় করা গেল না। এখন আমি শুনলাম যে আপনারা আপনাদের রাজ্য সরকারের

কাছ থেকে উদার হস্তে টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার সময় আমরা যখন ভারত সরকারের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলাম তখন কেন্দ্রের সমপরিমাণ অর্থ দেবার অনুবিধি ছিল। আমি জানি না এখন অনুবিধি কি রকম। আমি আপনাদের এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে বলব। যদি সেই অনুবিধি এখনও চালু থাকে তাহলে আমার একান্ত কামনা আপনারা সে রাস্তা কাজে লাগান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থ পাবার চেষ্টা করুন যাতে আপনাদের ভবন আরও প্রশস্ত, আরও কার্যকরী এবং আরও প্রসারিত করতে পারা যায়। কিন্তু এই চতুর্থ পরিকল্পনার তহবিল যে কি হবে কেউ জানে না। বাস্তবিক পক্ষে কয়েকদিন আগে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম আমি শুনলাম যে চতুর্থ পরিকল্পনায় তারা এই ধরনের কোন সংস্থাকে সরাসরি টাকা দেবে না। তারা বরং রাজ্য সরকারগুলিকে তা দেবে। এর ফলে বেশ কঠিন অবস্থা হল। যদি আপনারা আবার রাজ্য সরকারের কাছে যান তারা বলবে আমরা আপনাদের টাকা দিয়েছি। ভারত সরকার যা দিয়েছে তা থেকে আবার আপনাদের দেবো কেন? এই একটি বিপদ। কিন্তু তাহলে আমি সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় শুনলাম যে আপনাদের এই ভবনের জন্য আরও কিছু টাকা যোগাড় করতে হবে এবং মিঃ রায় আমাকে বললেন যে আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, শুর, খরচ তার চাইতে কম পক্ষে চল্লিশ হাজার টাকা বেশী হবে। কি করে আপনারা এ টাকা পাবেন? একটি সম্ভাব্য রাস্তা—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেষ্টা করুন। তাঁরা যদি বলেন—"না" তাহলে আপনাদের সরকারকে জিগ্যেস করুন তাঁরা গ্রন্থাগার বাবদ যা পান তা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা দেবেন কি না। কিন্তু যদি এও ব্যর্থ হয়, তাহলে এখানে এখনি গ্রন্থাগারিতা বৃত্তির তরফ থেকে, যাঁদের আমরা সেবা করি সেই জনসাধারণের তরফ থেকে আমি পশ্চিমবংগের উদার জনতার কাছে এই চল্লিশ হাজার টাকা দান করতে আবেদন জানাচ্ছি। অবশ্য অতীতে এক ব্যক্তিই এই টাকা দান করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান কর ব্যবস্থায় তা ততটা সম্ভব নয়। অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোক একত্রে মিলে এই ফাঁকটুকু ভরে দিতে পারেন, যাতে করে, ভবনটিকে কাঁট ছাট না করতে হয়। কাজেই আমার প্রথম কাজ আপনাদের ভবনের জন্য অভিনন্দন জানান।

কেন আমাদের এই ভবন? গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি কি দেয়? কেন তার একটি ভবন প্রয়োজন? এ হল একটি বিষয় যা এমনকি এখনও অনেকে জিগ্যেস করে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি, যা আমি বলছি, একটি নতুন বৃত্তি। যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে এটি একটি বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্যে গত পনের থেকে কুড়ি বছর এটি একটি দ্বিতীয় স্তরের কিম্বা তৃতীয় স্তরের বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। একজন বৃটিশ গ্রন্থাগারিক গত বছর বাঙ্গালোরে তাঁর একটি বক্তৃতায় এ কথাই বলেছিলেন। আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত বাধাই অতিক্রম করেছি। আমরা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বৃত্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা বৃত্তি বলতে কি বুঝি?

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন সুসংগঠিত কিছু লোক। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি বলে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার, আমাদের দেশ অগ্রণীদের অন্যতম। ভারতবর্ষের মত অন্য কোন দেশে গ্রন্থাগারিককে এত সহজে প্রফেসার, রিডার এবং লেকচারারদের সাথে সমান আসনে বসান সম্ভব হয় নি। এ কাজ হয়েছে, যদিও এর জন্য আমি গত চল্লিশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি, শেষ পর্যন্ত এটা হয়েছিল বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি ছিলাম তখন আমি ভাবলাম এর জন্য চেষ্টা করার এই শেষ সুযোগ। আমি আমাদের সভাপতি শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের একজন পরম বান্ধব ডঃ সি, ডি, দেশমুখকে বললাম। আমরা যে বিশেষ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করব সেই সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে বললাম। কারণ আমি জানতাম সমস্ত রকমের বাধা আসবে। তাঁর উপস্থিতি সমস্ত প্রতিবাদ স্তব্ধ করেছিল। তিনি আরও একটি কাজ করেছিলেন। তিনি আমায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দিতে বললেন যাতে করে তিনি এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ হিসাবে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে পাঠাতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ করলে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানেই গ্রন্থাগার আছে তাদের ওপর এর প্রভাব পড়বে। জাতীয় রসায়নাগারের গ্রন্থাগারগুলি এর সুবিধা গ্রহণ করেছে। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এর সুযোগ গ্রহণ করছে। মহীশূরে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। আমরা গ্রন্থাগারের কাজে সমস্ত জিলা অফিসগুলি পর্যন্ত ব্যাপৃত কর্মীদের নিয়ে রাজ্যের কাজ করে নিয়েছি। আমাদের দেশে এই সমস্ত কাজ খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় এই পেশার মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের দেশ যত তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়েছে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে এই বৃত্তির কি করা উচিৎ। বহুপূর্বের আমাদের ঐতিহ্যে তার ইংগিত রয়েছে। গ্রন্থাগার সেবার বর্তমান ভাষ্য বহু শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশে উপলব্ধ হয়েছিল। অবশ্য সকলের জন্য শিক্ষা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায়শঃই গ্রন্থাগার সেবা নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য, কয়েকজন পণ্ডিতের জন্য বোঝাতো—এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগার সেবা A থেকে Z পর্যন্ত সকলের জন্য। এখন তাহলে কি ভাবে এই সেবা করা হবে। একটি উপনিষদের বাক্যে এ সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া আছে। আপনারা আমাদের উপনিষদের বাক্যগুলি জানেন আমাদের বেদের বাক্যগুলির অর্থের অসংখ্য স্তর আছে। আমি আশা করি, স্যার, আপনি (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) আমার সাথে একমত হবেন। আমরা যতই আহরণ করি এ যেন ততই অর্থ সরবরাহ করে। মনে হয় এ যেন অন্তহীন। সবই নির্ভর করে এর কাছে আপনি কিসের অর্থ চান তার ওপর। একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ হল তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি বাক্য যা আমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনে ও পেশায় প্রেরণা দিয়েছে। প্রথম বাক্য হল "অতিথি দেবো

ভব।" আপনার অতিথি আপনার দেবতা। আমি বলি আপনার পাঠক। গ্রন্থাগারে অতিথি বলতে আমরা পাঠককে বুঝি। পাঠক আপনার দেবতা। এই হল মূল সুর। এবং তারপর আপনি জানছেন আপনারত অতিথিকে সেবা করতে হবে, আপনার পাঠককে সেবা করতে হবে। কি ভাবে? কি মন নিয়ে? আপনি দেখুন কি সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। বলছে—"শ্রীয়া দেয়ম" এই মর্মে সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে সেবার মন নিয়েই সেবা করতে হবে। "শ্রী"র প্রকৃত অর্থ সেবা। তাই নয় কি? "শ্রী" বলতে বর্তমান অর্থ সম্পদ হল একটি আহৃত অর্থ। কারণ আপনার সম্পদ থাকলে আপনি সেবা করতে পারেন। আপনি যদি ডাক্তার হ'ন, আপনি কয়েকজন রোগীকে সাহায্য করতে পারেন। যদি আপনার টাকা থাকে আপনি হাজার হাজার ডাক্তার নিয়োগ করতে পারেন। কাজেই "শ্রী" শব্দের মৌলিক অর্থ হল সেবা। আমি ঠিক নিখুঁত এবং অন্য কিছু পুনরাবৃত্তি করতে পারব না। সুতরাং, বলছে "শ্রীয়া দেয়ম।" সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করুন। এই হল আমার প্রথম সূত্র যা আমি এখান থেকে পেয়েছি। আমার মনে আছে আমার প্রথম সূত্র হল বইগুলি ব্যবহারের জন্য। অর্থাৎ তাদের পাঠকের সামনে ব্যবহারের জন্য দিতে হবে।

তারপর আসছে "শ্রদ্ধয়া দেয়ম," গভীর যত্ন সহকারে সমস্ত আন্তরিকতার সাথে আপনি সেবা করবেন। আপনি প্রত্যেকটি পাঠককে এইভাবে সেবা করবেন। এই হল দ্বিতীয় সূত্র যা আমি এর থেকে আহরণ করেছি। প্রত্যেক পাঠককে বই দিতে হবে। তারপর আসছে আর একটি পরিচ্ছেদ "হ্রীয়া দেয়ম"। "হ্রী" শব্দটির অনুবাদ করা শক্ত। আপনি আমায় সাহায্য করবেন (সুনীতি বাবুকে)। বিনয় অথবা নম্রতা—কিম্বা আমি জানি না আপনারা একে কি বলবেন। এ বড়ই অবর্ণনীয় বিষয়। রামকে বলা হয় "হ্রী"র বিগ্রহ স্বরূপ। যে ব্যক্তি নিতান্ত দুর্বল ও কোন কিছুর অযোগ্য সে "হ্রী" সম্পর্কে কিছু বলার যোগ্য নয়। যে মহৎ বস্তু অর্জন করতে পারে সেই মাত্র "হ্রী" পেতে পারে, সেই বিনয়, নম্রতার অধিকারী হতে পারে। যেমন, উদাহরণ—বাল্মীকি নিজে তিনজন রাণীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কৌশল্যাকে "হ্রী"র সাথে তুলনা করেছেন। আবার রাম লংকা থেকে যুদ্ধ শেষে এলাহাবাদ ফিরে এসে যখন ভরদ্বাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ভরদ্বাজ জিগ্যেস করলেন—"যা যা ঘটেছে আমায় সব বল।" যিনি অসীম শৌর্যসম্পন্ন কাজ করেছেন তিনি বললেন—"তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।" ভরদ্বাজ স্মিতহাস্য করলেন—"আমি জানি তুমি কিছু করেছ।" "তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।" তখন ভরদ্বাজ বললেন—"সম্ভবতঃ তুমি জান না যে আমরা ঋষিরা বার্তা পেয়ে থাকি, যে বার্তা সময় ও দূরত্বের সীমাতিক্রম করে থাকে।" "যুদ্ধ কাণ্ডে" এ হল একটি ভারী সুন্দর পরিচ্ছেদ। কাজেই এই হল "হ্রী"র প্রকৃত মর্ম। এর প্রয়োজন কোথায়? এর প্রয়োজন আছে কারণ আপনি যদি প্রত্যেক পাঠককে সেবা করে থাকেন তাহলেও নিশ্চয়ই যথেষ্ট করেছেন বলে ভাববেন না। আপনি নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন না। আপনার ভেতরকার "হ্রী" আপনার দৃষ্টিকে

বইগুলির দিকে নিয়ে যাবে। আমি কি সব বইগুলি সেবায় লাগিয়েছি? আমি সব বইগুলির জন্য পাঠক পেয়েছি? এই অর্থে "শ্রী" আপনাকে শুধুমাত্র পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রত্যেকটি বইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রন্থাগারের দিকে দেখতে বাধ্য করবে। এখানে একটা কথা আছে যদি আপনি পাঠকদের সেবা না করেন, পাঠকেরা যদি তাঁদের অধিকার জানে তাহলে তাঁরা তা আদায় করে নেবে। কিন্তু আপনি যদি বইগুলির জন্য পাঠক না পান তাহলে বেচারা বইগুলোর আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবার কোন উপায় নাই। কাজেই "শ্রী"র সংগে বেশ কিছুটা উদ্যম থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে তৃতীয় সূত্র হল, প্রত্যেক বইয়ের জন্য পাঠক চাই।

তারপর আসছে আর একটি পরিচ্ছেদ "ভীয়া দেয়ম্"। আপনার সেবা করতে হবে কিছু ভয়ের সংগে। আমরা সাধারণতঃ দুর্বল ব্যক্তি সম্পর্কে ভয়ের কথা বলে থাকি, সে অর্থে নয়। আপনি কোন কিছু ফেলে রাখবেন না, বাদ দেবেন না, খারাপ ভাবে করবেন না, এই অর্থে। এবং যদি আপনি বইগুলি সেবায় লাগাতে চান, যদি আপনি বইগুলির ব্যবহার চান, যদি আপনি গ্রন্থাগারে যাঁরা আসছেন এমন প্রত্যেক পাঠককে রাখতে চান, তা হলে যে মুহূর্তে অতিথি বা পাঠক আসছেন ঠিক তখুনি তাঁদের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তাঁর সংগে যান, কোন প্রকারে তাঁর সময় নষ্ট না করে তাঁর প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করুন, দেখুন তাঁর কি দরকার এবং তাঁর প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সমস্ত বই ও তথ্য খুঁজে বার করুন। তারপর তাঁকে তাঁর বইপত্র দিয়ে বসিয়ে দিন। শুধু এই যথেষ্ট নয়। আপনি নিশ্চয়ই বার বার তাঁর কাছে যাবেন এবং দেখবেন তিনি যা চেয়েছিলেন সব পেয়েছেন কি না, তিনি কোথাও আটকে গেলেন কি না, তিনি আপনার কাছে কোন কিছু চাইতে খুব সংকোচ বোধ করছেন কি না। তিনি সেবিত না হয়ে ফিরে না যান এই শংকাভাব আপনার মধ্যে থাকবে। আমি গ্রন্থাগারে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, এমন সত্যিই ঘটতে দেখেছি। আমি একটি আসন রেখেছিলাম যাতে করে আমি এসে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঠিক স্ট্যাকরুমে ঢোকার মুখে বসতে পারি। পাঠকেরা যখন স্ট্যাকরুমের বাইরে চলে আসতেন আমি তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে অনুধাবন করবার চেষ্টা করতাম। আপনারা জানেন, আমি প্রায়ই দেখি যখন রেলগাড়ীতে টান পড়ে, কিছু কুলী বসে থাকে এবং চালগুলো দেখে। তারা অন্য কিছু দেখে না। ঠিক এমনি আমি তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখতাম। যখনই আমি কোন অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পেতাম তখনই তাঁদের কাছে যেতাম। জিগ্যেস করতাম "আপনি সব পেয়েছেন কি?" পাঠকদের সংকোচ এমনই—"হ্যাঁ স্যার, আমি পেয়েছি।" কিম্বা কেউ, যে সামান্য একটু বেশী সপ্রতিভ, বলতেন, "না স্যর, আমি যা চাই আপনার গ্রন্থাগারে তা নেই।" আমরা এই ধরনের উত্তর খুব সহজেই পেয়ে থাকি। তখন আমি তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতাম। তিনি যা চান ঠিক তাই খুঁজে বার করে দিতাম। এ যদি আমি না করতাম হয়ত তিনি আমার কাছে আর ফিরে আসতেন না। এই শংকা

ভাব থাকতে হবে। এই ভীতি আপনাকে যে পথে চালিত করবে তা হল চতুর্থ সূত্র —পাঠকের সময় বাঁচান।

তারপর আর একটি বাক্য আছে, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, শেষ বাক্যটি। এর প্রকৃত অর্থ হল বিষয় সম্পর্কে ও বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আপনার সেবা করা উচিত। আমার এখন ঠিক বিষয়গুলি মনে পড়ছে না। যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই আপনার জানা উচিত। আপনারা হয়ত বলতে পারেন একজনের পক্ষে জানা কি করে সম্ভব। এখানে গ্রন্থাগার সংগঠনের কথা আসছে। গ্রন্থাগারিক নিজেকে পঞ্চাশ-ষাটজনের মধ্যে ভাগ করে দেখেন। গ্রন্থাগারিক তাঁর কর্মচারীদের মধ্য দিয়ে ষাট জনে পরিণত হন এবং তিনি সমগ্র জ্ঞানের জগৎ পরিবেষ্টন করেন যার ফলে আপনারা জানতে পারেন সম্প্রতি কি বেরোল, বা আপনারা জানতে পারেন অতীতে প্রকাশিত যা কিছু। এ আপনাদের করতেই হবে। এর প্রয়োজন আছে, কেননা, জ্ঞানের জগৎ সদাই বেড়ে চলেছে। শুধু যে বেড়েই চলেছে তাই নয়, বেড়ে চলেছে সমস্ত দিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে, অচিন্তনীয়ভাবে। তেমনিভাবে পাঠকদের রুচি সম্পর্কেও ভবিষ্যতবাণী চলে না। কি যেন সেই কবিতাটি, "ভিন্নরুচির লোক।" এই দুই শক্তির মধ্যে রুচির পার্থক্য এত বেশী যে, জ্ঞানের প্রকাশিত সব কিছু সম্পর্কে এবং সাধারণের রুচি সম্পর্কে আপনারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হলে আপনারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সার্থক করে তুলতে পারবেন না। এটি হল পঞ্চম সূত্র।

এখন এই যা কিছু পাওয়া গেল এ সবের উৎস হল বেদ। আমি জানি তাঁরা বলবেন, "বৈদিক যুগের লোকেরা কি বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভেবেছিলেন?" বৈদিক ঋষিরা যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছেন তার মূল্য চিরন্তন, যা যে কোনও পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ করা যেতে পারে। এখন এই মনোভাব নিয়ে আমাদের পেশায় চলতে হবে। কি কি উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা এ কাজ করব? একটি উপায় আছে। আমার মনে হয়, মাদ্রাজ পাঠকদের ষ্ট্যাকরমে ঢুকে বই এর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে অনুমতি দেবার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল; যাতে তাঁরা অনুভব করতে পারেন যেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের বইয়ের মধ্যে আছেন। অবশ্য আমরা এর জন্য "অবারিত প্রবেশ" এই আখ্যা ব্যবহার করে থাকি। মাদ্রাজে আমরা এ করেছিলাম। আমি ঘোষণা না করে এই ব্যবস্থা শুরু করেছিলাম। আমি জানি, আমি যদি ঘোষণা করতাম, আমি যদি অনুমতি চাইতাম, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত বলত —"না, বই খোয়া যাবে।" এমন কি আজ পর্যন্ত আমরা এটা করে উঠতে পারতাম না। কাজেই আমি সব কিছু শুধু অবারিত রেখেছিলাম এবং চার পাঁচ বছর বেশ ভালভাবে চলেছিল। বাৎসরিক ষ্টক পরীক্ষার ফলে তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় নি। তখন আমি বেশ সাহসের সংগে ঘোষণা করলাম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রবেশ অবারিত। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরাও এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। কোন প্রতিবাদ ওঠেনি।

আর একটি কাজ আমাদের যা করতে হবে তা হল এই যে, গ্রন্থাগার কার্য কালের সারাক্ষণ খোলা রাখতে হবে। লণ্ডনে আমার নিজের কলেজে আমি আদর্শ উদাহরণ দেখেছি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বলতে গেলে ফলতঃ চব্বিশ ঘণ্টাই গ্রন্থাগার খোলা রাখত। তাঁরা কি করে এমন করেন? তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রন্থাগার কক্ষের একটি চাবি দিয়ে দেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগার কক্ষের একটি চাবি ছিল। আমি পাঁচ শিলিং জমা রেখেছিলাম। পরে ফেরত পেয়েছি। কাজেই আপনি যে কোন সময় গিয়ে পড়তে পারেন। এমন দিন গেছে যখন আমি মাঝ রাত পর্যন্ত সেখানে কাটিয়েছি। এই হল আদর্শ পন্থা যা আমি দেখেছি। কিন্তু ভারত এই আদর্শের কাছাকাছি প্রথম পৌঁছেছিল পুনার ফার্গুসন কলেজে। আমার পুরাণো বন্ধু পাখি সেখানে সাহসের সংগে দিনে প্রায় চৌদ্দ কি পনের ঘণ্টা গ্রন্থাগারের কাজ চালু রেখেছেন। এ দরকার, এই হল এই পেশার আদর্শ। এখন আর একটি কথা হল কবে গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা যায়? যদি আপনি গ্রন্থাগার বন্ধ করতে চান তাহলে সেদিন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকছে না। কখন আপনি গ্রন্থাগার আছে বলবেন? গ্রন্থাগার একটি পুস্তক সংগ্রহ নয়, কিম্বা কিছু পাঠকের সমাবেশ নয়। যখন গ্রন্থাগারিকের দ্বারা পাঠক ও পুস্তকের মিলন ঘটে শুধুমাত্র সেই মুহূর্তগুলিতেই আপনার গ্রন্থাগার আছে বলা যায়। কাজেই আপনি যদি গ্রন্থাগারকে সারাক্ষণ প্রাণবন্ত রাখতে চান তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সপ্তাহের সব দিনগুলিতেই গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখবেন।

তারপর আবার, আমি জানি না আপনারা কলকাতায় কি করেন, ১৯৩৫ সাল থেকে আমরা গ্রন্থাগারগুলিকে সপ্তাহের সব ক'দিন খোলা রাখতে আরম্ভ করেছি এবং তা বেশ ভালভাবেই চলছে। এইভাবে আরো অন্য অনেক কিছু আমাদের করতে হবে। কিন্তু সবচাইতে প্রয়োজনীয় হল পাঠকদের পরিচর্যা। আমাদের ভাষায় আমরা একে অনুলয়-সেবা বলে থাকি। ও হল অনুলয়-সেবা, যা এই পেশার উৎকৃষ্টতা নিরূপণ করে। অনুলয় সেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহার্য হয়ে ওঠে। একটি বড় আকর্ষণীয় উপাখ্যান আছে আমি জানি না এটা সত্য অথবা অপ্রামাণিক। আপনারা নিশ্চয়ই আমায় বলতে পারবেন যে শংকর যখন ললিতসহস্রনামের ওপর একটি ভাষ্য লেখার বাসনা করেছিলেন, তখন তিনি গ্রন্থাগারিককে একখানি ললিতসহস্রনাম আনতে বললেন। তিনি (গ্রন্থাগারিক) ষ্ট্যাকরুমে গেলেন এবং একখানা বই আনলেন যা দেখা গেল বিষ্ণুসহস্রনাম। শংকর বললেন "আমি এ চাই নি। আপনি যান এবং একখানা ললিতসহস্রনাম নিয়ে আসুন।" তিনি আবার গেলেন এবং আর একখানি বিষ্ণুসহস্রনাম নিয়ে এলেন। শংকর জিগ্যেস করলেন—"আপনার আজ হলো কি?" তখন গ্রন্থাগারিক উত্তরে বললেন—"আমি নই, স্যর। একজন যুবতী মহিলা গ্রন্থাগারে এসেছেন। তিনি সারাক্ষণ আমায় বলছেন শংকর এখন যে বইয়ের ওপর লিখবেন

তা হল বিষ্ণুসহস্রনাম, ললিতসহস্রনাম নয়।" বলা বাহুল্য, শংকর তখুনি বুঝতে পারলেন ইনি হলেন স্বয়ং দেবী যিনি তাঁর অতুলনয় গ্রন্থাগারিকের কাজ করে গেলেন। কাজেই অতুলনয় গ্রন্থাগারিককে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে হবে। আপনারা বলতে পারেন, গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এমন দাবী বড়ই কল্পনানির্ভর। কিন্তু একজন পাঠক কোন বিশেষ মুহূর্তে পাঠের মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম কি করতে পারে এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে। এই হল গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমি আশা করি, এই ভবন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু একটি পেশার আবাস হবে। আমি বলেছি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য সংখ্যা সর্বাধিক। আমি আশা করি এ কথা ঠিক। মিঃ রায় আমায় বললেন, সভ্যসংখ্যা হাজার হবে। আমার মনে হয় না অন্য কোন গ্রন্থাগার পরিষদের এক হাজার সদস্য আছে। আমি তাঁদের অধিকাংশের সাথে পরিচিত; আমার জ্ঞাতসারে নেই। এবং এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কলকাতার। আমি যখনই এখানে এসেছি আমি দেখেছি সেই অফিসটি যেন একটি মৌচাক যার কথা আপনি বললেন, স্যর, কি একটি গলির মধ্যে, যেখানে টি, সি, দত্তের সাথে আমি যেতাম। আমার দেখে একে ঠিক একটি মৌচাক বলে মনে হত। এখানে তরুণ গ্রন্থাগারিকেরা দিনের কাজের শেষে আসছে এবং চিন্তা ও আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সঞ্জীবিত করছে। এখন আপনাদের নিজেদের বাড়ী হল। আমি আশা করি আরও অনেকে আসবেন। তাঁরা আসবেন, একত্রে চিন্তা করবেন, একত্রে কাজ করবেন, নতুন পন্থা উদ্ভাবন করবেন, যাতে করে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব কটি সূত্র সার্থক হতে পারে এবং গ্রন্থাগার কি ধরনের সেবা করবে এ সম্পর্কে আদেশ ও বেদের নির্দেশ সুসম্পন্ন হবে। আমি কামনা করি যেন তাই হয়। এবং এই ক'টি কথা বলে এই অনুষ্ঠানে আমাকে মিলিত হবার সুযোগ দেবার জন্য আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[ডঃ রঙ্গনাথনের এই ভাষণটি কলিকাতাস্থ 'ইউ এস আই এস' সংস্থা কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল। টেপ রেকর্ড থেকে তোলা টাইপ করা ইংরেজী বক্তৃতার যে অনুবাদ আমরা এখন প্রকাশ করছি তা প্রফেসর দেখে দেন নি। স্বভাবতঃই এতে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। ২৮২ পৃষ্ঠায় 'নিখণ্ডু' সম্ভবতঃ যাস্ক প্রণীত বৈদিক অভিধান 'নিঘণ্টু' হবে। ঐ পৃষ্ঠাতেই এক জায়গায় 'যুদ্ধ কাণ্ডে'র উল্লেখ করা হয়েছে—সম্ভবতঃ ওটা 'উত্তর কাণ্ড' হবে। বক্তৃতাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন—শ্রীতপন সেন। সঃ গ্রঃ]

Dr. Ranganathan's Address at the Foundation
Stone laying Cermony of the Association Building.

পুঁথিপত্রের শত্রু কীটপতঙ্গ (২)

পঙ্কজকুমার দত্ত

ঘুণ

ঘুণ হচ্ছে পতঙ্গ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। ঘুণের শূককীটগুলিই কিন্তু নষ্টামির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। শূককীটগুলির স্বভাবই হচ্ছে কাঠের মধ্যে অজস্র সুড়ঙ্গ খোঁড়া। যখন এদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ পূর্ণোদ্যমে ও ব্যাপকভাবে চলে তখন গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ বাইরে পড়তে থাকে। ব্যাপারটা হয়ত অনেকেরই চোখে পড়েছে। এজন্যই ইংরাজীতে এদের বলে Powderpost beetle। অবশ্য এই নামে Lyctidae এবং Bostrichidae গোত্রভুক্ত সকল পতঙ্গকেই বুঝায়। কারণ এদের প্রত্যেকেই শূককীট অবস্থায় একই ধরনের দুষ্কায করে। গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় এরা প্রধানত বইয়ের আধার ও বিভিন্ন ধরনের কাঠের আসবাবপত্রই নষ্ট করে, তবে শূককীটের সুড়ঙ্গপথের সামনে অথবা কাঠের মধ্যে থেকে বাইরে বের হয়ে আসার পথে যদি বইপত্র পড়ে তবে সে সবের মধ্য দিয়েই এরা পথ করে নেয়। অবশ্য সুড়ঙ্গ কেটে বই নষ্ট করতে গ্রন্থকীটের প্রসিদ্ধিই সকলের চেয়ে বেশী—এদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

Lyctidae গোত্রে বারটি গণ (genus) আছে এবং আজ পর্যন্ত তেষট্টিটি প্রজাতির কথা জানা গেছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার, মহাফেজখানা বা সংগ্রহশালার আগারিকগণের কাছে Lyctus brunneus নামক প্রজাতিটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রজাতিটি মূল্যবান শিল্পবস্তু, প্রত্নসামগ্রী, ও আসবাবপত্রের (ক্ষেত্রবিশেষে পুঁথিপত্রেরও) ভয়ানক ক্ষতি করে। ভারতবর্ষে এটি ঘুণ নামেই পরিচিত। ঘুণে কাটা কাঠের গায়ে গোল গোল ছোট্ট গর্ত দেখা যায়। সেগুলি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত ঘুণ-বিটলের বাইরে বের হয়ে আসার পথ —খগরন্ধ্র (flight-holes)। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এরা অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজতে থাকে। ঘুণের রাজ্যে প্রমীলারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলাভে বিশেষ দেরী হয় না—প্রথম গোধূলি লগ্নটিতেই এরা বাসকশয্যা বিছায়। প্রতিটি ঘুণ-পুরুষ অনেকগুলি স্ত্রীকে নিষিক্ত করে। শুধু সংখ্যায় নয়, বেঁচে থাকার মেয়াদেও পুরুষেরা স্ত্রীদের পিছনে পড়ে। পুরুষরা বাঁচে মাত্র সপ্তাহ দুই-তিন, সে জায়গায় স্ত্রীরা বাঁচে সপ্তাহ ছয়েক। কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য পরমায়ুর এই পার্থক্য স্বীকার করেন না। যৌনমিলনের পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই স্টার্চ-সমৃদ্ধ ও খসখসে কাঠের উপর রাত্রিকালে স্ত্রী-ঘুণ ডিম পাড়ে। স্ত্রী-ঘুণের স্টার্চ-সমৃদ্ধ স্যাপউড (Sapwood) সঠিক ভাবে বেছে নেবার ক্ষমতা খুবই লক্ষ্য করার মত। যে কাঠের মধ্যে আশ্রয় নেয় সেই কাঠ থেকেই শূককীটকে বেশ কিছুদিন খাদ্য আহরণ করতে হয়। এজন্যই প্রকৃতি স্ত্রী-ঘুণকে কাঠ বাছাইয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছেন। স্ত্রী-ঘুণের ডিম

প্রসব প্রক্রিয়াটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্ত্রী-ঘুণ ওভিপোজিটর বা প্রসব নালিকাটি কাঠের লিউমেন-গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখানে ডিম পাড়ে। কাঠের ভেসেল-লিউমেনের ব্যাস ছোট হলে ওভিপোজিটরটি লিউমেনের মধ্যে প্রবেশ করান সম্ভব হয় না অথচ ডিম পাড়ার জন্য এটি একান্তই প্রয়োজন। বোধ হয় এজন্যই সবধরনের কাঠ ঘুণের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে অন্যান্য আরও নানা বিষয়, যথা কাঠের মধ্যে জলীয় বাষ্প ও স্টার্চের পরিমাণ (moisture & Starch content) ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

ঘুণের ডিমটি হয় সাদাটে, তবে ঈষৎ স্বচ্ছ। ডিমগুলি গড়পড়তা এক মিলিমিটারের মত দীর্ঘ হয়। ডিম ফুটতে সময় লাগে Perkin এর মতে আট থেকে বার দিন ও Atson এর মতে পনের দিন। Christian কিন্তু লক্ষ্য করেছেন পরিবেশের উষ্ণতা ডিম ফুটবার সময়কে প্রভাবিত করে –15° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ঊনিশ-কুড়ি দিন সময় লাগে কিন্তু 29° সেন্টিগ্রেডে সময় লাগে মাত্র দিন ছয় সাত। ডিম থেকে বেরিয়ে শূক শিশু কাঠের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই সময় শূক শিশুর দৈর্ঘ্য থাকে ·7 মিলিমিটারের মত এবং গায়ের রঙ হয় শ্বেতাভ ঘৃতবর্ণ। দেহটি এ সময় সিধেই থাকে, তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তা বঁড়শির আকার নেয়। সদ্যোজাত শূক শিশু কাঠের মধ্যে ভেসেল বরাবর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এগিয়ে যেতে পারে না। শক্তি বাড়াবার জন্য শূক ছেড়ে আসা ডিমের মধ্যে সঞ্চিত কুসুমের যেটুকু তখনও পড়ে থাকে সেটুকু সদ্ব্যবহারে মন দেয়; ফলে তার দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্যও যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং দেহটি বঁড়শির আকার নেওয়ায় সহজেই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে থাকে ও ভেসেল-প্রাচীর ভেদ করে তন্তু বা কলামধ্যে ঢুকে পড়ে। জীবনের প্রথম অবস্থায় শূক কাঠের আঁশ বরাবর সুড়ঙ্গ খোঁড়ে, কিন্তু কয়েক-দিন পর থেকেই সে এলোমেলোভাবে এগুতে থাকে।

শূককীট কাঠের সেলুলোজ বা হেমিসেলুলোজ খেয়ে হজম করতে পারে না। কাষ্ঠ মধ্যস্থ ষ্টাচ থেকেই এরা খাদ্য আহরণ করে; অবশ্য এই সঙ্গে কিছু কিছু শর্করা (যথা ডাই-সেকারাইড, পলিসেকারাইড প্রভৃতি) এবং প্রোটিনও গ্রহণ করে। সেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি অজীর্ণ অবস্থায় পায়ুপথে নির্গত হয়। যদি কাঠের মধ্যে 8—30% ভাগ জল না থাকে তবে সেই কাঠে ঘুণ লাগে না। পূর্ণবয়স্ক শূককীট দৈর্ঘ্যে কখনই পাঁচ মিলিমিটারের বেশী হয় না। দেহটি হয় ছিলাছাড়ান ধনুকের মত বাঁকা তবে বক্ষদেশ হয় যথেষ্ট প্রশস্ত।

শূককীট-জীবনের শেষ ভোজনটি সেরে শূক কাঠের প্রান্তিক অঞ্চলের উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করে এবং একেবারে প্রান্তীয় অঞ্চলে পৌঁছে গেলেই সুড়ঙ্গের ঐ অংশটি একটু বড় করে খুঁড়ে নিয়ে একটি প্রকোষ্ঠ (pupal chamber) তৈরী করে এবং ঐখানেই মূককীট অধ্যায়ের ১২ থেকে ৩০ দিন কাটিয়ে দেয়। অবশ্য এই অধ্যায়ের ব্যাপ্তি আরও কম হওয়াও অসম্ভব নয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

মূককীটের গায়ের রঙ প্রথমে থাকে সাদা তারপর ঘৃতবর্ণ এবং পতঙ্গ রূপ নিয়ে বাইরে আসার অল্প কয়েকদিন পূর্ব হতে রঙ কালচে হতে আরম্ভ করে। পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও অল্প কয়েকটি দিন এটি ঐ গর্তের মধ্যেই থাকে, কারণ এর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তখনও নরম থাকে, ঐগুলি শক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাইরে আসার চেষ্টা করে না। বাইরের জগতে বের হয়ে আসার জন্য পতঙ্গটি কাঠের পাতলা আস্তরণটিতে একটি ছোট্ট গর্ত করে এবং ঐপথে উপজাত কাঠের গুঁড়া ঠেলে ঠেলে বাইরে ফেলে। গর্তগুলি হয় দু-তিন মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট এক একটি নিখুঁত বৃত্ত, ঐ গর্তের সামনে কাগজ, চামড়া, শক্তকাঠ, অ্যাসবেসটস, এমনকি সীসা, রূপা ইত্যাদি যাই পড়ুক না কেন ভেদ করে মুক্ত জগতে বের হয়ে আসে।

ঘুণের জীবনের চারিটি অধ্যায়ের মোট ব্যাপ্তি আবহাওয়ার তারতম্য (বিশেষত উষ্ণতার হেরফের), কাঠের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রিটেনের মত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (ঘর বাড়ীর মধ্যেই হোক বা উন্মুক্ত অঞ্চলেই হোক) জীবনচক্রের সামগ্রিক ব্যাপ্তি হচ্ছে গড়পড়তা এক বছর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ঐ দেশের যে সব ঘরে 'central-heating' এর ব্যবস্থা আছে সেই সব ঘরে জীবনচক্রের ব্যাপ্তি মাত্র ছয় মাস। 25° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং 75% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট গবেষণাগারে ঘুণের জীবন-চক্র দশ-বার সপ্তাহের মধ্যে আবর্তিত হতে দেখা গেছে। প্রতিকূল পরিবেশে ঘুণের জীবনচক্রের সাধারণ ব্যাপ্তি হচ্ছে দু-আড়াই বৎসর, তবেও এই ব্যাপ্তি চার অথবা ততোধিক বৎসরও হতে পারে।

কীট আক্রান্ত পুঁথিপত্রের পরিচর্যা কীট আক্রমণ প্রতিরোধের উপায়

গ্রন্থাগারে কীট আক্রমণের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গ্রন্থাদি একেবারে আলাদা করে ফেলা দরকার যাতে অন্যান্য বইপত্রে আক্রমণ সংক্রমিত না হতে পারে এবং সত্বর উপধূপনের (Fumigation) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ; যথা কীটের পরিচয় বা প্রজাপতি নির্ণয়, আক্রমণ অতি সম্প্রতি ঘটেছে না বেশ কিছু দিন আগেই ঘটেছে, গ্রন্থাগারে আক্রমণকারী পতঙ্গের প্রবেশ পথ ইত্যাদি।

আক্রান্ত পুঁথিপত্রের মধ্যে আত্মগোপনকারী অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ সমূহকে সংহার করতে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ধরনের কীটঘ্ন রসায়ন ব্যবহৃত হলেও বিশেষজ্ঞরা প্যারা-ডাই ক্লোরোবেনজিন, ইথিলিন অক্সাইড—কার্বন ডাই অক্সাইড মিশ্রণ (1 : 9) কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড ইথিলিন ডাইক্লোরাইড মিশ্রণ (ছোট টিনে ভর্তি করে বাজারে এটি Killo-ptera পণ্য নামে বিক্রী হয়) ইত্যাদি ব্যবহারের বিধান দেন। নয়াদিল্লীস্থ জাতীয় মহাফেজখানার পুঁথিপত্র সংরক্ষণ গবেষণাগারের (ভারতবর্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণার এটিই

সর্বশ্রেষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষনাগার) বিশেষজ্ঞরাও ভারতীয় পরিবেশে ঐগুলিই ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

বায়ুশূন্য আধারে উপধূপনের (Vacuum fumigation) ব্যবস্থা কীট সংহারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই পন্থায় কীটরা'ত মরেই, এমন কি তাদের ডিমগুলিও রেহাই পায় না। কারণ আধারটি যখন বায়ুশূন্য করা হয় তখন পারিপার্শ্বিক চাপ কম থাকার জন্য ডিমগুলি ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হলে অনেক টাকার যন্ত্রপাতি ও বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী দরকার, যন্ত্রপরিচালনের খরচের-হার (expense ratio) কম হলেও মোট খরচ খুব বেশী। এইজন্যই জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির মত বিরাট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা লাভজনক নয়। নয়াদিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় এই পন্থায় উপধূপনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে যে বাষ্প-মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় তাতে একভাগ ইথিলিন অক্সাইড ও নয়ভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকে।

ছোটখাট গ্রন্থাগারের পক্ষে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzene) অথবা কিলোপটেরা (Killoptera) ব্যবহারই প্রশস্ত। যে কোন বায়ুরোধী আধারের সাহায্যেই উপধূপন কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। তবে আলমারীর আদলে ইস্পাত-চাদর দিয়ে তৈরী কোন আধার হলে ভাল হয়। আলমারীর তাক গুলিতে কিছু ছিদ্র থাকা অবশ্য প্রয়োজন যাতে কীটঘ্ন বাষ্প আধারের সর্বত্র পৌছিতে পারে। তাকের উপর বইগুলি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে যাতে বইয়ের পাতাগুলির মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে অর্থাৎ কিনা বইটি একটু মেলে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এরকমভাবে রাখার জন্য কীটঘ্ন বাষ্প প্রতিটি পাতা বা মলাটের আশপাশ দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে। প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন সাদা দানাদার বস্তু। সংহারক হিসাবে এটি ব্যবহার করতে হলে কাঁচের পাত্রে নিয়ে আধারের সর্বনিম্ন অঞ্চলে এটি রাখতে হবে। আধারের আয়তনের আনুপাতিক হারে কীটঘ্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রতি 2·832 ঘন. মিটার আয়তনের জন্য 4·54 কিলোগ্রাম প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন নিতে হবে। আমাদের দেশের ক্রান্তীয় উষ্ণ আবহাওয়ায় সাধারণ তাপমাত্রাতে প্যারাডাইক্লোরো, বেনজিনের বাষ্পায়ন সুরু হয়ে যাবে এবং বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা হওয়ার জন্য সহজেই আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কিলোপটেরা ব্যবহার করলে পাত্রটি সর্বোচ্চ সেলফে রাখতে হবে। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এই তরলটি সহজেই বাষ্পীভূত হয় বটে কি ঐ বাষ্প বায়ু অপেক্ষা ভারী। প্রতি 2·832 ঘন. মিটার আয়তনের জন্য 635 গ্রামে কিলোপটেরা দরকার। আধারের মধ্যে দিন সাত-আট রাখলে পতঙ্গ ও তাদের শূককীটগুলি নিশ্চয়ই মারা পড়বে কিন্তু প্যারাডাইক্লোরো-বেনজিন অথবা কিলোপটেরা কোন বাষ্পই পতঙ্গের ডিমগুলি বিনষ্ট করতে পারে না। সেজন্য 20/21 দিন পরে পুনরায় উপধূপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কারণ 20/21 দিনের মধ্যে ঐ সব ডিম ফুটে বাচ্ছা জন্মায় কাজেই দ্বিতীয়বার উপধূপনের ফলে কীটপতঙ্গাদি একেবারে নির্মূল হবে।

ন্যাপথেলিন-ফিউমিগেটর—কীটপতঙ্গের উৎপাত নিবারণে ন্যাপথেলিনের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় উপধূপন কাজে এটি ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন গবেষক চেষ্টা করছেন। নয়াদিল্লীস্থ জাতীয় মহাফেজখানার কর্মী সর্বশ্রী রণবীর কিশোর ও জে, এল, ভাটনগর সম্প্রতি এক প্রবন্ধে এমন একটি যন্ত্রের কথা জানিয়েছেন। ['Naphthalene Fumigation' -Published in 'Conservation of Cultural Property in India', Ed. by O. P. Agrawal, Indian Association for the Study of Conservation, National Museum, New Delhi, 1966]। এই যন্ত্রটির প্রধান সুবিধা হচ্ছে যে পুঁথিপত্রগুলিকে তাদের নিজ নিজ স্থানে রেখেই উপধূপায়িত করা যায়। যে সব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান-গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি তৈরী করেন তাদের দিয়ে অনায়াসেই এটি তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

ন্যাপথেলিন-ইস্টিকা বোঝাই একটি আধারের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু (তাপমাত্রা 30° সেন্টিগ্রেড) চালনা করলে যে ন্যাপথেলিন বাষ্প (তাপমাত্রা 25°—30° সেন্টিগ্রেড) পাওয়া যায় তাহাই সরু নলের দ্বারা আক্রান্ত পুঁথিপত্রের উপর প্রয়োগ করা হয়। যন্ত্রটি একটি ছোট ঠেলাগাড়ির (trolley) উপর বসান থাকলে যেখানে খুশী ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়।

যন্ত্রের বর্ণনা—যন্ত্রটির মোটামুটি তিনটি ভাগ: (ক) বিদ্যুতচালিত হাপর (air-blower) (খ) চুল্লী (air-heater) (গ) ন্যাপথেলিন আধার।

চুল্লীর দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত করা হয়। মূলত এটি দস্তাচ্ছাদিত ইস্পাতচাদরে তৈরী একটি বেলনাকার পাত্র। এটির আয়তন দশ লিটার; ঢাকনাটি বায়ুরোধী। ঢাকনার সঙ্গে কয়েকটি ধাতব পাত লাগান আছে। পাতগুলি বিদ্যুত সংযোগে উত্তপ্ত করা যায়; সংলগ্ন থার্মোস্ট্যাট দ্বারা উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। পাতগুলি এমনভাবে লাগান থাকে যে হাপর থেকে বায়ু আধারে ঢুকে চট করে বেরিয়ে যেতে পারে না। বায়ুকে অনেক আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে যেতে হয় এবং যাত্রাপথে উত্তপ্ত পাতের সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ন্যাপথেলিন-আধারটিও ইস্পাত চাদরে তৈরী একটি বেলনাকার পাত্র। এটির আয়তন সাত লিটার। আধারটির তিন-চতুর্থাংশ ন্যাপথেলিন-ইস্টিকাতে ভর্তি থাকে। সংযোগ নল মারফৎ বায়ু চুল্লী থেকে বেরিয়ে এই আধারে ঢোকে। সংযোগনলের মধ্যে দু' জায়গায় তারজালির ছাঁকনি আছে। তাপ বিকিরণ হ্রাস করার জন্য আধারদ্বয় এবং সংযোগ নলের বহির্গাত্রে অ্যাসবেস্টস-ম্যাগনেসিয়ার আস্তর দেওয়া আছে।

যন্ত্রটি চালু করলে প্রতি মিনিটে 1·75 ঘনমিটার ন্যাপথেলিন বাষ্প (উষ্ণতা 25°-30° সেন্টিগ্রেড) পাওয়া যায় এবং এর জন্য প্রতিমিনিটে 130 গ্রাম ন্যাপথেলিন খরচ হয়। ন্যাপথেলিন বাষ্প ইস্পাতের তৈরী নমনীয় নলদ্বারা যেখানে খুসী প্রয়োগ করা যায়। এই নলের নির্গম পথটি কিন্তু সূচীমুখ হওয়া চলবে না—চেষ্টা করতে হবে অন্যথায় মুখটি হরদম বন্ধ হয়ে যাবে ও কাজের অসুবিধা ঘটাবে। বাষ্প যে স্থানে প্রয়োগ করা হয় সেখানে অতি ক্ষুদ্রাকার কঠিন ন্যাপথেলিন কণা জমে থাকে ফলে কিছুকালের জন্য কীট আক্রমণের ভয় থাকে না।

গ্রন্থপঞ্জী

Back, E. A– 'Bookworms', Indian Archives, Vol 1, No. 2; National Archives of India ; 1947.

Basu, Purnendu—'Common enemies of Records', Indian Archives, Vol 5, No. 1; 1951.

Gupta, R. C—'How to fight White ants', Indian Archives, Vol 8, No. 2 ; 1954.

Harris, W V.—'Termites ; their recognition & Control', Longmans , London ; 1961.

Hickin, Norman E.—'The Insect factor in wood decay', Longmans, London, 1963.

Mckenny Hughes –'Protection of Books & Records from insects' Indian Archives, Vol 7, No. 1 ; 1953.

Plumbe, W. J—'The Preservation of books in tropical & subtropical countries', Oxford University Press ; 1964

Roonwal, M. L. & Chatterjee, P N—'Control of the Indian bookworm beetle', Indian Forest Records, new series Entomology, Vol 8, No. 6, Publications Div. Govt. of India, Delhi, 1952.

Thomson, G. (Editor)—Recent advances on Conservation, Butterworh London ; 1963.

The Enemies of library materials.
Inseets by Pankaj Kumar Datta

উইলিয়ম কেরী

কুণাল সিংহ

সহস্র যোজন দূর থেকে এসেছিলেন উইলিয়ম কেরী বাংলার "তাদের দেশের ঘুম ভাঙ্গাতে।" "নীরের কোলে শ্যামল" এই দেশটির লোকেরা তখন কুসংস্কারে আর অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইউরোপ থেকে এসে এক নবযুগের বাণী শুনিয়ে এই বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলেন কেরী। উত্তরকালে বাংলা দেশে যে নবীন প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল তার সূত্রপাত বলতে গেলে হয়েছিল কেরীর সময়ে। ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে সাধারণ মানুষকে বুঝবার একটা প্রেরণা এসেছিল ইউরোপে। সে প্রেরণা কেরীকেও স্পর্শ করেছিল। নিজের দেশকে বুঝবার ও আপন করবার যে স্পৃহা তিনি অনুভব করেছিলেন মিশনারী হিসাবে বিদেশের মানুষকে বুঝবার ও সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচাবের প্রয়োজনীয়তা ও তাকে তেমনি চঞ্চল করে তুলেছিল। বিদেশে যীশুর বাণী পৌঁছে দেওয়াটা সে যুগের মিশনারীদের জীবনের সবচেয়ে মহান ব্রত ছিল।

অবশ্য কেরী আসার আগে থেকেই বাংলা দেশে মিশনারীদের কাজ শুরু হয়ে যায়। মিঃ গ্রাণ্ট এখানে ১৭৮৬ সালে একটি মিশন স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কেরীর মত তিনিও বুঝেছিলেন যে এদেশে ধর্ম প্রচার করতে গেলে তা দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। এই সময় ব্রাউন ছিলেন গ্রাণ্টের সহকারী। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, মিশন স্থাপন করা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সরকারের অনুমতি প্রয়োজন এ সব কাজে। একটি মিশন স্থাপনের এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ-এর কাছে আবেদন করা হ'ল। কিন্তু কর্ণওয়ালিশ এ সব ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই গ্রাণ্টের সে আশা সার্থক হয় নি। তারপর ইংলণ্ডের আইন সভার অনুমতি নিয়ে তিনি মিশন স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কোম্পানীর তরফ থেকে আপত্তি আসাতে সেখানেও তিনি বিফল হলেন। নানা কারণে বেশীদিন তাঁর এ' দেশে থাকা সম্ভব হয়নি। অবশ্য টমাসের ব্যক্তিগত চরিত্রই তাঁর এই ব্যর্থতার একটি কারণ।

দেশে ফিরে গিয়েছিলে টমাস। কিন্তু ইংলণ্ডে এসেও টমাসের উদ্যোগ কিছুমাত্র কমলো না, তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য পরিচিতদের সাহায্যে আবার মিশন স্থাপনের কথা ভাবতে লাগলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "Baptist Missionary Society"র সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। মিশনারীরাও এই ধরনের উৎসাহী লোকই খুঁজছিলেন। এই সোসাইটির এক কমিটি মিটিংএ ১৭৯৩ সালের ৯ই জানুয়ারী একটি resolution নেওয়া হ'ল: "A door appeared to be open in India for preaching the gospel to the heathen, and that Mr. Thomas be

invited to unite with the society, who would endeavour to procure an assistant to accompany him." কেরী তৎক্ষণাৎ ভারতে যাওয়ার বাসনা জানালেন। কিন্তু আপত্তি উঠলো Mrs. Carey র দিক থেকে, পরে অবশ্য তিনি ভারতে আসতে আপত্তি করেন নি।

এদিকে কেরী ও টমাস ভারতে যাওয়ার লাইসেন্স পেলেন না ইংলণ্ড থেকে। অবশেষে লাইসেন্স ছাড়াই টমাসের এক বন্ধু "Oxford Indiaman"এর কমাণ্ডার তাঁদের নিয়ে যেতে চাইলেন ভারতে। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে India House-এর বিরাগ ভাজন হওয়ার ভয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁদের নিয়ে ভারতে পাড়ি দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে ঈশ্বর প্রসন্ন হলেন। খুব অল্প খরচে একটি Danish জাহাজ তাদের ভারতে পৌছে দিতে স্বীকৃত হ'ল। টমাসের অদম্য উদ্যোগেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। এবার কেরী সপরিবারে চললেন ভারতে। জাহাজে তিনি সময় কাটাতেন টমাসের কাছে বাংলা শিখে।

কোলকাতার বন্দরে জাহাজ ভিড়লো। সঙ্গে আনা বিলিতি জিনিষপত্র বিক্রয় করে ক'দিন ভালভাবেই কেটে গেল। কিন্তু খরচে স্বভাবের লোক টমাস। আহার ও বাসস্থানের কোনও সুবিধামত বন্দোবস্ত হবার আগেই টাকার আর কিছু অবশিষ্ট থাকলো না। খরচ কুলাতে না পেরে কেরী প্রথমে ব্যাণ্ডেল ও পরে মাণিকতলায় বাসা নিলেন। টমাস এই সময়ে নিজের পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

মাণিকতলা ঠিক তখন ক'লকাতার মধ্যে পড়তো না। সেটা ছিল ক'লকাতার দক্ষিণের সহরতলী। এখানে একটা অপরিচ্ছন্ন, স্যাঁৎসেতে বাড়ীতে কেরী তাঁর সংসার এনে তুললেন। কিন্তু সহায় সম্বলহীন ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর পক্ষে মাণিকতলার এই বাসাবাড়ীতে থাকা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে তাঁর গঞ্জনার শেষ ছিল না। অবশেষে প্রায় উপায় না দেখে কেরী সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসের কথা ভাবছিলেন। টমাসের কাছে গেলেন অর্থ আর পরামর্শের জন্যে। কিন্তু তখন নিজ স্বভাবদোষে আকণ্ঠ ঋণে মজ্জমান হ'য়ে পড়েছেন টমাস। অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন কেরীর স্ত্রী ও দুইটি সন্তান। উপায়ন্তর না দেখে বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে কেরী নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এলেন সুন্দরবন এলাকার হাসনাবাদ অঞ্চলে। সেখানকার জলহাওয়া মোটেই তাঁদের বসবাসের অনুকূল ছিল না। এদিকে বর্ষা আগতপ্রায়। সুন্দরবন ক্রমেই বসবাসের পক্ষে আরও অনুপযোগী হ'য়ে উঠলো। ভাগ্যদেবী অবশেষে প্রসন্ন হ'লেন কেরীর উপর। সুন্দরবনে বর্ষা কাটাতে হ'ল না কেরীকে। তাঁর ডাক এল মালদার কাছে মদনাবতী থেকে। সেখানে Udny নামে এক পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে টমাস মালদার কাছে Mypaldiggy নামে এক স্থানে নীল কুঠির কর্তা নিযুক্ত হন। তিনিই কেরীর জন্য মালদার ৩০ মাইল উত্তরে মদনাবতীতে আর একটি নীলকুঠির কাজ ঠিক করলেন। সুযোগমত কেরী রওনা দিলেন মদনাবতীর

দিকে। সেখানে কেরী যা মাইনে পেতেন তার কিছুটা খরচ করতেন বাইবেলের অনুবাদের কাজে, আর ধর্ম প্রচারে। মদনাবতীতে, নীলচাষীদের জন্যে স্কুল করে তাদের পড়ানোর প্রয়াস পেলেন তিনি, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল স্থানীয় লোকদের উৎসাহের অভাবে।

নীলচাষের তদারকের কাজে কেরী কিংবা টমাস কেউ-ই তেমন পারদর্শী ছিলেন না। "উড্‌নি"-সাহেবের ব্যবসা প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। এ' সবের মধ্যেও কিন্তু কেরী New Testament-এর অনুবাদ ছাপানোর কথা ভাবছিলেন, কারণ অনুবাদের কাজ তখন তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। বিলেত থেকে Type আনানোর খরচ পড়ে অনেক। ব্যবসায়ে মন্দা আর আর্থিক অনটনের মধ্যে সে চেষ্টা কেরীর পক্ষে করা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু ভাগ্যদেবী এ'বারও বোধ হয় তাঁর ওপর সুপ্রসন্ন ছিলেন। কোলকাতায় একটী প্রেস বিক্রীর নোটিশ দেখলেন তিনি। উড্‌নি সাহেব সেটী কিনে কেরীকে উপহার দিলেন। প্রেস আনা হ'ল কোলকাতা থেকে মদনাবতী।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের "Baptist Missionary Society" আরও অনেক বড় হয়েছে। সেখানকার পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফুলার (Fuller)। তিনি ছিলেন কেরীর বন্ধু। ফুলার মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সহ চারজন মিশনারীকে মদনাবতীতে কেরীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু ভারতে পৌঁছে কেরীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হ'লনা তাঁদের। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা মোটেই ভাল চোখে দেখছিলেন না মিশনারী-দের এই সব কার্যকলাপ। তাই কোম্পানীর লোকেদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে মিশনারীরা ডেনমার্কের অধীনস্থ শ্রীরামপুরে এসে হাজির হলেন। সেখানকার গভর্ণর "Colonel Bie" তাঁদের সমাদরে আশ্রয় দিলেন শ্রীরামপুরে। এখান থেকে তাঁরা মদনাবতীতে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর কাছ থেকে আবার বাধা এলো, তাই তাঁরা শ্রীরামপুরেই থেকে গেলেন। কেরীকেই তখন শ্রীরামপুরে যাওয়ার কথা ভাবতে হল। সপরিবারে শ্রীরামপুরে গিয়ে কেরী মিশন পত্তনের কাজে নেমে পড়লেন। ১৮০০ সাল শ্রীরামপুর তথা বাংলা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ সালেই শ্রীরামপুরে মিশন ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মদনাবতী থেকে প্রেস আনা হ'ল শ্রীরামপুরে। প্রেস বসানোর পরে বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক এখান থেকে ছাপা হতে থাকে। প্রথমে রাম বসুর লেখা "Jospel Messenger" ছাপা হল। তারপরে রাম বসুই হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা লিখলেন। ছাপাখানার পত্তন এদেশে কেরী আসার অনেক আগেই হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিতভাবে পুস্তক প্রকাশনার কাজ আর ছাপাখানাকে সর্বসাধারণের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা শ্রীরামপুরেই হয় সর্বপ্রথম।

১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ থেকে কাজ শুরু ক'রে ১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কেরী "নিউ টেস্টামেন্ট" ছাপানো শেষ করেন। টাইপ তৈরীর কাজে পঞ্চানন তখন কেরীর সর্বপ্রধান সহায়ক। অতি কৌশলে কেরী পঞ্চাননকে ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের অধ্যাপক সুপণ্ডিত চার্লস উইলকিন্সের হেফাজত থেকে নিজের কাছে শ্রীরামপুরে এনেছিলেন তাঁর ছাপাখানার কাজে। উইলকিন্স নিজে পঞ্চাননকে "পাঞ্চ" কাটা শিখিয়েছেন। যৌথ প্রচেষ্টায় তাঁরা হলহেডের "The Grammar of the Bengal language এর জন্য বাংলার Type তৈরী করেছিলেন। হলহেডের গ্রামারের পরেও, আঠারো শতকের শেষে কয়েকটি বাংলা পুস্তক বাংলা দেশ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তারপর উনিশ শতকের প্রথম থেকে শ্রীরামপুরই বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় মুদ্রণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৮০১ সালের এপ্রিল মাসে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন একটি চিঠিতে কেরী লিখেছেন "When the appointment (in the Fort William College) was made, I saw that, I had a very important charge committed to me and that I have no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar which is now half printed. ১৮০১ সালের মধ্যেই কেরীর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় কেরী একটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন যা' বর্তমান ভাষা-সমস্যার এক নতুন দিকে আলোকপাত করবে। তিনি লিখেছেন :

"It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct; for though it be admitted that persons may be found in every part of India who speak that language yet Hinduoosthanee is almost as much a foreign language, in all countries of India, except those of the North West of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in other countris of Europe. In all county of justice in Bengal and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of the particular country and seldom understand any other……

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other language of India. Fourfifths of the words in the language pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these and many other accounts, it may be esteemed as one of the most expresive and elegant languages of the east……

সাধারণ মিশনারীদের মত কেরী কেবল খৃষ্টধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর জীবন ও কার্যাবলীর মধ্যে এইখানেই আছে অসাধারণত্ব। তাঁর গ্রন্থাগারে বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদির উপরেও একাধিক বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাঁরই চেষ্টায় ১৮০২ সালে

আইন করে গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জন দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে কেরী এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য কোলকাতায় বড়লাটের কাউন্সিলে ও শ্রীরামপুরে দিনেমার কাউন্সিলে দুটি স্মারকলিপি পাঠান। তাঁর মতে এই নৃশংস প্রথাটি যখন ধর্মসঙ্গত নয় তখন এটিকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য। এই স্মারকলিপি পেশ করার অল্পদিনের মধ্যেই ওয়েলস্‌লি ইংলণ্ডে ফিরে যান বলে তাঁর পক্ষে কোনও আইন করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে লর্ড বেণ্টিক আইন জারী করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। সে সময় অবশ্য রাজা রামমোহনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনেকাংশে এই প্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণার কারণ ছিল।

ভারতে কেরীর প্রথম কয়েক বৎসর অসাধারণ দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু সমস্ত বিপদ ও বাধা অতিক্রম করে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গিয়েছেন। ধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল এই নিষ্ঠার জন্যে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক লাভবান হয়েছে। বাংলাভাষাকে তিনি সর্বসাধারণের শিক্ষার উপযোগী করে তুললেন। একজন উচ্চশ্রেণীর ভাষাবিদ হিসাবে চলিত ভাষার ব্যবহারের নিয়মাবলী থেকে তিনি বাংলার ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনাতেও হাত ছিল উইলিয়ম কেরীর। "দিগ্‌দর্শন" ও "সমাচার দর্পণ" এর প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজ তার অক্ষয় কীর্তি।

কেরী এদেশে বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করেছেন। ১৮৪৬ সালে গীতার সংস্কৃত, কানাড়ি ও ইংরাজী আলেখ্য Baptist Mission Press থেকে ছাপা হয়। কনফুসিয়াসের বাণী ও আদর্শ সম্বন্ধে লেখেন মার্শম্যান ১৮০৯ সালে। সেটিও Baptist Mission Press থেকে ছাপা হয়। মার্শম্যানের এই লেখাটিই কনফুসিয়াসের দর্শনের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ। কেরী ও মার্শম্যান ১০টি খণ্ডে বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১৮১০ সালে প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ১৮১২ সালে আগুন লেগে পরের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পুড়ে যায়। রামায়ণের সেই প্রথম তিনটি খণ্ড এখনও "কেরী লাইব্রেরী"তে আছে। এ ছাড়া দুই খণ্ডে বাংলা ভাষার একটি অভিধান কেরী প্রস্তুত করেন। তাতে শব্দের উৎপত্তি ও তাদের বিভিন্ন অর্থভেদ করেছেন তিনি। খণ্ড দুইটি ১৮১৮ ও ১৮২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

ভাষাবিদ্ হিসাবে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন কেরী। অনেক ক'টি ভারতীয় ভাষা তিনি শিখেছিলেন ভারতবর্ষে আসার পর। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড —তিনজনই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার "কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেন। তবে মার্শম্যানই সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন ভাষা শিক্ষায়। তিনি চীনা ভাষাও জানতেন। তাঁদের অনুবাদ করা পুস্তক ও বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ এখন "কেরী লাইব্রেরী"তে স্থান পেয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে শ্রীরামপুরের "কেরী গ্রন্থাগারে"র প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি।

William Carey, by Kunal Sinha

গ্রন্থাগার আন্দোলন (৪)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনের বেলগাঁও অধিবেশনে গৃহীত সুশীল কুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সেই প্রস্তাবেরই অনুসরণক্রমে বঙ্গে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ চলে। প্রথমত নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার পরিষদের তদানীন্তন অতিরিক্ত সম্পাদকের নামে এতদর্থে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ইহার কার্যালয় ছিল কলিকাতার ৭নং রাজেন্দ্র দত্ত লেনে। সম্মেলনে বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারকেই যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানান হয়। সর্ব বঙ্গীয় ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়াপত্তনের এই প্রথম পদক্ষেপ। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান বিকিরণ এবং পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন হইলেও মেদিনীপুর, পাবনা, ফরিদপুর, শিলিগুড়ি, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অন্যান্য অংশ হইতে এই ব্যাপারে আন্তরিক সহ-যোগিতা ও সমর্থনের সাড়া পাওয়া যায়। ঢাকা, খুলনা, রাজসাহী, হুগলী, হাওড়া ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান হইতে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনের স্থান ছিল কলিকাতার ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউটের সভামণ্ডপে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর রবিবার এই সম্মেলনের অধিবেশন বসে। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রী জে, এ, চ্যাপম্যান। সম্মেলনের আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন রায়, বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, পুরীর শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য, মৌলভী মুজিবর রহমান, রাজকুমার শরৎকুমার রায়, কুমার হরিৎকৃষ্ণ দেব, রাজসাহীর কুমার নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীসত্যানন্দ বসু, শ্রীশশধর চক্রবর্তী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি সরকার এবং অন্যান্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের প্রারম্ভে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অশোক-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাস্থলে পড়িয়া শোনান। রবীন্দ্রনাথের বাণীর মর্ম ছিল 'আমি আপনাদের আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। আপনাদের আন্দোলন উন্নতি ও প্রসার লাভ করুক ইহাই কামনা।'' সভাপতি মহাশয় তাঁহার মৌখিক ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার, সুষ্ঠ পরিচালন ও দেশের মধ্যে

প্রসার সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। এছাড়া এতদুদ্দেশ্যে একটি সর্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও সকলকে তিনি সচেতন হইতে বলেন। তাঁহার ভাষণান্তে তিনি ডঃ কালিদাস নাগকে ইউরোপ মহাদেশের বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করেন। নাগ মহাশয় সবিস্তারে সেখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েন। শ্রীমনোরঞ্জন রায়ও অপর একটি প্রবন্ধ পড়িয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে ভাবাইয়া তোলেন। অধ্যক্ষ ডঃ ব্রিজ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, তিনি স্পেনের মাদ্রিদ সহরের সর্বজনীন প্রমোদ উদ্যানের খোলা জায়গায় বসিয়া বই পড়ার জন্য একপ্রকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা যাহাতে আমাদের দেশে প্রবর্তন করা যায় তাহার সম্বন্ধে সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলেন। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সভাস্থ সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনের বেলগাঁও অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পড়িয়া শোনান।

পরিশেষে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজীতে রচিত প্রস্তাবাবলীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

১। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বেলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের অনুসরণক্রমে বঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিনিধিবর্গের এই সম্মেলন অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন নামক বঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহের একটি সংস্থা গঠন করিল।

২। অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর কার্যের সৌকর্যার্থ প্রতি জিলায় জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের জন্য এই সম্মেলন বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারকে অনুরোধ করিতেছে।

৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, এই অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হউক।

৪। এই সম্মেলন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি এবং অন্যান্য সর্বজনীন সংস্থাসমূহকে উহাদের নিজ নিজ এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারসমূহের সংরক্ষণ ও প্রসারণ, নূতন গ্রন্থাগারের পত্তন এবং উহাদিগকে পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৫। এই পরিষদের উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগার হইতে একজন করিয়া সদস্য লইয়া অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর অস্থায়ী সাধারণ সমিতি গঠিত হউক।

পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য সম্মেলনে যে অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় তাহাতে ডঃ কালিদাস নাগের আনুকুল্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি· নির্বাচিত হইলেন। এছাড়া একজন সম্পাদক ও যুগ্ম সহকারী সম্পাদকও নির্বাচন করা হইল। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষই হইলেন এই পরিষদের প্রথম সম্পাদক।

(ক্রমশঃ)

Library movement in Bengal (4)
By Gurudas Bandyopadhyay

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে গত আশ্বিন সংখ্যায় 'আকাশ প্রদীপ' (৺সুখরঞ্জন রায় প্রণীত) গ্রন্থটির ছন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'ষোল অক্ষরের পয়ার অনেকটা গদ্যেরই মত।' কথাটি ৺সুখরঞ্জন রায়ের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শুক্লা' সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ আছে এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ সুকুমার সেন এবং কাব্য পরিচিতি লিখেছেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ।

'গ্রন্থাগার'-এর বর্ষসূচী। 'গ্রন্থাগার'-এর ১৩৭৩ সালের যে বর্ষসূচীটি এই সংখ্যার সঙ্গে যাচ্ছে তার কয়েক জায়গায় বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের গোলমাল হয়েছে—এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। —স. গ্র.।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফলাফল ঃ ১৯৬৭

ডিস্টিংশন (গুণানুসারে)

স্থান	রোল নং	নাম
১	৩৫	পবন ধন দত্ত
২	১১১	প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	১০৬	নির্মলকুমার সেনগুপ্ত
৪	৫৩	দীপক কুমার গোস্বামী
৫	২৫	পূর্ণচন্দ্র দালাল
৬	১২	কিরণ কুমার ভট্টাচার্য
৭	২১	ছন্দা চন্দ্র
	৮৮	অসীম কুমার ঠাকুর
৮	৭৪	সুবীর কুমার রায়
৯	১৪	নির্মল কুমার ভট্টাচার্য
১০	৬	হরেন্দ্র নাথ বসু
	৭৩	নিশীথ নাথ রায়
১১	৫১	উমা ঘোষ
১২	৮৭	সৈয়দ সামীম আহ্মদ
১৩	৭৮	ননী গোপাল সরকার
১৪	৪৪	বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায়
	৮৬	পি. সুব্রাহ্মনিয়াম
১৫	৩২	ছন্দা দত্ত
	৪০	কমলা দে
১৬	৬৫	নমিতা মুখোপাধ্যায়
১৭	৪৩	অজয় কুমার ঘোষ
১৮	৩০	দয়ালকান্তি দাসগুপ্ত
	৩৬	পঞ্চানন দত্ত

পাশ (রোল নং অনুসারে)

রোল নং	নাম
২	বিমান কুমার আদক
৩	অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	রবীন্দ্র নাথ বসু
১০	কেয়া ভাদুড়ী
১১	হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৩	মীরা ভট্টাচার্য
১৫	সত্যেন্দ্র নারায়ণ ভৌমিক
১৬	বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
১৭	সন্ধ্যা বিশ্বাস (চরিত)
২০	সুধাংশু ভূষণ চক্রবর্তী
২২	নির্মলা কুমারী ছাবরা
২৩	সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৪	নিরঞ্জন চৌধুরী
২৬	বিনয়েন্দ্র নাথ দাস
২৭	বিশ্বনাথ দাস
২৮	প্রভাস চন্দ্র দাস
২৯	অলকা দাশগুপ্ত
৩৭	সরল বন্ধু দত্ত
৩৮	অঞ্জন কুমার দে
৪১	সুনীতি কুমার দে
৪২	আশালতা দেবী
৪৩	যোগেশচন্দ্র ধর
৪৫	দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৪৭	বরুণ কুমার ঘোষ
৪৯	ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ
৫০	রঞ্জিত কুমার ঘোষ
৫২	গগন চন্দ্র ঘোষাল
৫৪	হারাধন গোস্বামী
৫৬	জীমূতবাহন গুপ্ত
৫৭	সুভাষ চন্দ্র জানা
৫৮	কমলাকান্ত কোলে

রোল নং	নাম
৫৯	রঞ্জন কুমার মাজি
৬১	সুনীল মণ্ডল
৬২	অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়
৬৩	দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
৬৬	ধীরেন্দ্র নাথ নন্দী
৬৭	রমা পাল (নান)
৬৯	অশোক কুমার রায়
৭০	বীণা রায় (ঘোষ)
৭১	দেবকুমার রায়
৭৫	অর্চনা সাহা
৭৭	কানাই লাল সাহু
৮০	বারুণী সেন
৮১	ভারতী সেনগুপ্ত
৮৩	মীণাক্ষী সেনগুপ্ত
৮৪	অজিত কুমার সিংহ
৮৫	মৌজীলাল সিংহ
৮৯	শেফালী দত্ত
৯১	অরুণ কুমার দাস
৯৪	বিমল কুমার বক্সী
৯৫	ভবানী কুমার ঘোষ
৯৬	দীপক চন্দ্র দত্ত
৯৭	ইলা সিংহ
৯৯	অমলকান্ত নন্দন
১০০	অসিত বরণ দত্ত
১০১	সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০৩	অনঙ্গ নাথ ভট্টাচার্য
১০৫	মায়া চন্দ
১০৭	শিশিরবিন্দু বিশ্বাস
১০৮	প্রহ্লাদ কুমার বাগচী
১০৯	মণীন্দ্র চন্দ্র চন্দ
১১০	প্রণব নিয়োগী
১১২	জীতেন্দ্র নাথ পাল

রোল নং	নাম
১১৩	অসীম কুমার পাত্র
১১৪	ননীগোপাল দে
১১৬	নন্দলাল বেরা
১১৭	লীলা সামন্ত
১১৯	ভবেশ চন্দ্র দাস
১২১	হাসি বসু
এন ১	নীহার বসু
এন ২	উমা বসু
এন ৩	অসীমা ভট্টাচার্য
এন ৫	প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য
এন ৬	প্রতিমা চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য)
এন ৮	সনৎ কুমার বিশ্বাস
এন ১১	জ্ঞানশংকর চক্রবর্তী
এন ১২	শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী
এন ১৩	দুলাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এন ১৫	গীতা দাস
এন ১৮	নরেশ চন্দ্র দাস রায়
এন ১৯	গোলোক বিহারী দে
এন ২১	নিবেদিতা দে
এন ২৩	হিরন্ময় ঘোষ
এন ২৫	রাধানাথ ঘোষ
এন ২৬	রমলা ঘোষ দস্তিদার
এন ২৭	প্রদীপ গুহ
এন ৩১	সুস্মিতা নাগ
এন ৩২	প্রতিভা নাথ
এন ৩৭	গীতিকা রায়
এন ৪০	প্রসাদ লাল রায়

Education for librarianship.

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী থেকে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন)

কাক কি কাকের মাংস খায় ? অন্তত প্রবাদবাক্যে আছে খায় না। কিন্তু ভণ্ডুলের গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা যে সুযোগ পেলে ভণ্ডুলের মাংস ছিঁড়ে খাবেন না ভণ্ডুল এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। এসব Cannibalism-এ আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। হয়তো উল্টে ভণ্ডুলের মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে বলে ধরে নেবেন। কিন্তু জেনে রাখুন, কথাটা সত্যি। আমরা জানি সমালোচকের বাক্যবাণে অনেক বাঘা বাঘা কবি-সাহিত্যিক ভগ্নহৃদয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। কবি জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত তাঁর 'সমারূঢ়' কবিতায় সমালোচকের ওপর একহাত নিয়েছেন। কিন্তু ভণ্ডুল কবি-সাহিত্যিক কিছু নয়। তার গায়ের চামড়া এত পুরু যে (সম্ভবতঃ গণ্ডারের চামড়ার সঙ্গেই তা তুলনীয়) তা ভেদ করে এসব কিছুই প্রবেশ করবার সম্ভাবনা নেই। আর শকুনের শাপেও কখনও কোথাও গরু মরেছে বলে ভণ্ডুল শোনে নি। অনেকদিন 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় ভণ্ডুলের সাক্ষাৎ না পেয়ে অনেকে সন্দেহ করে বসেছেন যে ভণ্ডুল হয়তো সাধনোচিত ধামে গমন করেছে। বন্ধুর ছদ্মবেশধারী ভণ্ডুলের যে সব শত্রু এতে খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে ভণ্ডুলের নিবেদন না মহাশয়, না, আপনাদের সন্দেহ একেবারেই অমূলক—এসব কিছুই ঘটেনি। ভণ্ডুল বহাল তবিয়তেই আছে। ভণ্ডুলের জীবনে এখন মাত্র তিনটি সাধ—যে তিনটি ইচ্ছা মাঝে মাঝেই তার মনে প্রবল হয়ে ওঠে তা হল, মাঝে মাঝে দেশভ্রমণ, মন যা চায় তেমন কিছু পড়া এবং লেখা। তাই পুঁজার ছুটি পডবার আগে থেকেই ছুটিটাকে কাজে লাগাবার জন্য নানারকম কথা সে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ভণ্ডুলের দুর্ভাগ্য ভণ্ডুলের বন্ধুদের কেউ কেউ যখন পর্বতশিখরে দুর্গম তীর্থপথ পাড়ি দিচ্ছিল আর কেউ সমুদ্রতীরে বসে রমণীয় অপরাহ্ণগুলি কাটাচ্ছিল ভণ্ডুল তখন অতি অভ্যস্ত অতি-চেনা এই কলকাতায় প্রবল জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিল। অথচ ছুটিতে ভ্রমণ, পড়াশুনো এবং লেখা মনে মনে এসবের কত ফিরিস্তিই না সে তৈরী করেছিল! ভ্রমণের পরিকল্পনাটি গোড়াতেই কেঁচে গিয়েছিল। পডাশুনো বিস্বাদ লাগতে লাগল। আর লিখতে বসে ভণ্ডুল তার একটি কলমও খুঁজে পেলনা। হাল আমলের কোন কলম তো পেলই না, ভণ্ডুলের স্টক থেকে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের কোন অব্যবহার্য ভাঙ্গাচুরো একটা কলমও বেরোল না তখন তার মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল।

কলম নিয়ে অশান্তি ভণ্ডুলের পক্ষে এই নতুন নয়। ভণ্ডুলের অফিসের ছোট সাহেব থেকে আরম্ভ করে মেজো, বড় সব সাহেবের হাতই কলঙ্কিত করেছে ভণ্ডুলের কলম। বড় সাহেবের হাতে কালি লেগে যাবে ভেবে ভণ্ডুল বলল, 'কলমটা লিক করে

স্যর, একটু ওপরে ধরে লিখবেন।' বড় সাহেব হাতে কালি লাগিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, আরে ঠিক আছে।' মেজো সাহেব একদিন ভণ্ডুলের কলমে সই করতে গিয়ে সক্ষম হলেন না—বললেন, 'তুমি একটা লেখাপড়া জানা লোক, তোমার কি এই কলম।' আর ছোট সাহেব একদিন ভণ্ডুলের কলম নিয়ে কি একটা করতে গেয়ে কাগজের ওপর ঝপ ঝপ করে কালি পড়ে গেল। ভণ্ডুল দুঃখ প্রকাশ করতেই আর বিরক্তি চাপতে পারলেন না—তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনার মশাই সবই অদ্ভুত—একটা কলম কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন"—আবেগে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। তাহলেও এমন শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় ভণ্ডুলের জীবনে কোনদিন আসে নি। কলম হারানো ভণ্ডুলের একটি রোগ। কিন্তু সে জন্য ইতিপূর্বে তাকে কখনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বাড়ী ভর্তি একগাদা মামাতুতো-পিসতুতো-মাসতুতো ভাইবোনের কারো একটি কলম নিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া যেত বেশ। অবশ্য যার কলম সে কলম না পেয়ে এসে ধরত এই দাদাটিকেই। আর অসাবধানে ভণ্ডুলের মুখ দিয়ে যদি কখনও বেরিয়ে পড়ত, "ওরে আমার কলমটাতো পাচ্ছিনা তোরা কেউ কি দেখেছিস?"—অমনি যে যার কলম নিয়ে সাবধান হয়ে যেত। একবার তো ঘরের দেওয়ালে একটি মামাতো বোন কাঁচা হাতে লিখেই রেখেছিল, 'মেজদা হইতে সাবধান, মেজদা একটি কলম চোর।' যে হাস্যময়ী কিশোরীটি এই কথাগুলি লিখেছিল অকস্মাৎ একদিন সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাড়ী বদলাবার আগে পর্যন্তও ঘরের দেওয়ালে তার হাতের লেখাটি জ্বল জ্বল করছিল।

আর সেদিনকার কথাও ভণ্ডুলের মনে পড়ছে। তখন সে কলকাতায় নতুন এসেছে কলকাতার কলেজে পড়তে। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে সে কলেজ স্কোয়ারে পুরাণো বই দেখছিল। হঠাৎ তার নজরে এল দুই খণ্ডে বার্ণার্ড শ'র সমগ্র গ্রন্থ। বইওলা যে দাম চাইল তা ভণ্ডুলের কাছে ছিলনা, কিন্তু ভণ্ডুলের পকেটে ছিল একটি দামী কলম। কলমটি উপহার হিসাবে সে পেয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভণ্ডুল তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল—কলমটি বেচে দিয়ে সে বইটি কিনবে। কিন্তু বন্ধুটি আপত্তি করল। বলল, 'উপহারের কলমটা তুমি এভাবে বেচে দিচ্ছ কেন--বরং চলো আমাদের বাড়ী, আমি তোমাকে টাকা ধার দিচ্ছি।' তাই হল। বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ভণ্ডুল টাকা নিয়ে এল। কিন্তু উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে যখন বইওলার কাছে পৌছল তখন বইটি বিক্রী হয়ে গেছে। বইওলা বলল, 'বাবু, আপনি তো শুধু দাম জিজ্ঞেস করলেন, কিনবেন কিনা তাতো বললেন না। তাহলে না হয় বইটি আপনার জন্য রেখে দিতাম।'

ভণ্ডুলের মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে সে অনেকক্ষণ জলের ধারে বসে থাকল। তারপর অধিক রাত্রে তার মেসে ফিরে গায়ের জামা খুলতে গিয়ে সে অবাক হল—জামার পকেটে কলমটিও নেই। অন্যমনস্কভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় কখন তার কলমটি পকেটমার হয়ে গেছে।

অনেকের মনে ধারণা হতে পারে, ভণ্ডুল যে মস্তবড় একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল তাই প্রমাণ করবার জন্যই সে এই সব গল্প ফেঁদে বসেছে। কিন্তু তাই যদি হবে তবে কেন ভণ্ডুল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জটিল সকল তত্ত্ব আলোচনা না করে এইসব সস্তা এবং সহজ মার্গ অবলম্বন করবে। তাছাড়া সে নির্মমভাবে এবং নির্মোহ দৃষ্টিতে গভীরভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করে বর্তমানে তার সেদিনকার আচরণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা হল এই যে, সেই অল্প বয়সে বন্ধুবান্ধবকে দেখাবার জন্যই সে এই সব কাণ্ড করে বসত। সে সময়ে তরুণ বয়সে তার মনটা ছিল তাজা এবং আবেগপ্রবণ। হুজুগে পড়েই হোক, আর লোক দেখাবার জন্যই হোক অনেক বই পড়েছিল সে। সিরিয়াস পাঠক না হলেও উত্তর জীবনে তার সুফল নিশ্চয়ই সে কিছু পেয়েছে। এখন কিছুটা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভণ্ডুল বই কেনে না, আর বই পড়ার সময়ই বা তার কোথায়! গত দশ বছরে সে পাঁচখানাও ভাল বই পড়েছে কিনা সন্দেহ! অথচ ভণ্ডুলের বইয়ের তাকে বই জমেছে অনেক; বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য জায়গা থেকে পড়তে এনে যে সব বই আর ফেরত দেওয়া হয়নি সেই সব বইয়ের ভীড়। এতে একটা সুবিধে এই যে, বাড়ীতে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের মনে ভণ্ডুলের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেগ হয় এই এত বইয়ের পড়ুয়া বলে। অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছর কেটে গেছে, ভণ্ডুল ঐসব বইয়ের পাতা একবারও খুলে দেখেনি। ভণ্ডুলের গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা হয়তো একথা শুনে ভণ্ডুলকে ধিক্কার দেবেন গ্রন্থাগারিক হয়ে একথা কবুল করার জন্য। যদিও ময়রায় সন্দেশ খায়না বলে বাংলায় একটি প্রবাদ আছে কিন্তু গ্রন্থাগারিকের পক্ষে গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক বলে ভণ্ডুলের গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা মনে করেন। কিন্তু ভণ্ডুল জানে, বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এই অভিমত পোষণ করেন যে, গ্রন্থাগারিকদের বেশী লেখাপড়া না করাই ভাল; তাহলে গ্রন্থাগারের পাঠকরা বঞ্চিত হবেন। গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে যেসব স্কলার বেরিয়েছেন তাঁরা নাকি গ্রন্থাগারিক হওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই তা হতে পেরেছেন ইত্যাদি —।

ভণ্ডুল তার তিনটি সাধের কথা বলেছিল। কিন্তু গভীরভাবে আত্ম বিশ্লেষণ করে মনে হল, তার তিনটি সাধই মেকি। সবই লোক দেখাবার জন্য। অবশ্য তাতে দুঃখের কিছু নেই। ভণ্ডুলের ধারণা, 'সাচ্চা কিছুই নেই জগতে; দুষ্ট সবাই দোষে।'

দেশভ্রমণ জিনিসটা ভাল, কিন্তু বাস্তবে এর জন্য অনেকখানি ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, বিশেষ করে ভণ্ডুলের মত লোকেদের। বছরে একবার দেশভ্রমণ করে সারাবছর অনুশোচনা করতে হয়। তাছাড়া ভ্রমণের জন্য কষ্ট স্বীকারেরও প্রয়োজন -- তার চেয়ে কলকাতায় তক্তপোষে শুয়ে আরামে কাটিয়ে দেওয়ার লোভই ভণ্ডুলের মনে যে বেশী একথা কবুল করলে ভণ্ডুলের বন্ধুরা আর একবার ভণ্ডুলকে ধিক্কার দেবেন। সত্যি কথা বলতে, ভণ্ডুলের এই উৎসাহী বন্ধুদের মধ্যে কতজনের দেশভ্রমণের নেশা সত্যিকারের এবং কতজনের মধ্যে শুধু কলকাতায় ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ভ্রমণের গল্প

অতিরঞ্জিত করে শোনানোর বাসনাই প্রবল তা ভণ্ডুল হলপ করে বলতে পারেনা। তার চেয়ে ভণ্ডুলের কাছে কলকাতার এই ধুলিমলিন, ধুম্র-ধুসর আকাশই ভালো! ভণ্ডুল দেশভ্রমণ এ পর্যন্ত যথেষ্ট করেছে আর দেশভ্রমণে তার কাজ নেই। দেশ-ভ্রমণে গিয়ে দুদিনের জন্য হয়তো ভালও লেগে যায় কিন্তু এই কলকাতার কথা মনে পড়ে যায় দুদিন পরেই। তখন মনে হয়, কতক্ষণে কলকাতার সে অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাবে। অমনি ভণ্ডুলের মন বলে, 'যাই, কলকাতার কাছেই ফিরে যাই।' হায়, মায়াবিনী নগরী কি বাধনেই বেধেছে তাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোধ হয় তার এর কাছ থেকে মুক্তি নেই।

অবশেষে আসে লেখার কথা। সংশয়ী পাঠকেরা এবারে আর হাসি চেপে রাখতে পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, ভণ্ডুল কী এমন লেখক, তার আবার লেখা! হাসুন, প্রাণভরে হাসুন। কিন্তু লেখার ব্যাপারে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা হাসবেন না। ছোট হোক, বড় হোক, লঘু বিষয়ের লেখকই হোক, আর গুরু বিষয়েরই হোক, কোন লেখকই তার নিজের লেখাকে খারাপ বলে ভাবতে পারে না, তাহলে যে তাঁরা লিখতেই পারবেন না। লেখার প্রধান কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। কিন্তু ভণ্ডুলের সে আত্মবিশ্বাস বুঝি আর টেঁকে না।

অধিকাংশ লেখকই ভণ্ড এবং মিথ্যুক। তারা নিজেরা যা নয় লেখার মধ্য দিয়ে তাই হয়ে উঠতে চায়। আসল লোকটিকে লেখার মধ্য দিয়ে আপনি কখনো খুঁজে পাবেন না। লেখা থেকে যাকে মনে হল জগত ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং উদাসীন আসল লোকটাকে দেখা গেল ঘোরতর ধূর্ত, বিষয়ী এবং জীবনে ভয়ানকভাবে আসক্ত। এই তো 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক মশাইকেই দেখুন না, কী রকম কারবারী লোক। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় 'শোক সংবাদ' প্রকাশ করবার জন্য যেন উনি একেবারে মুখিয়ে আছেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কারো মৃত্যু হয়েছে একবার খবর পেলে হয়! অমনি! নানারকম বিশেষণ দিয়ে তার সম্পর্কে বিরাট শোক সংবাদ বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় তার প্রতি সম্পাদকের কতখানি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা ছিল তা কি এই লেখা থেকে বোঝা যাবে? মৃত্যুর পরে অত বিশেষণ জুড়ে খেদ প্রকাশ না করে জীবিতাবস্থায় শ্রদ্ধেয়র কথা যদি শ্রদ্ধাভাবে শোনা যায়, যে প্রশংসার যোগ্য তার প্রাপ্য প্রশংসা যদি দেওয়া হয়, যে ভালবাসার পাত্র তার প্রতি যদি প্রকৃত কর্তব্য পালন করা হয়, তাহলে মরে যেয়েও একটা সান্ত্বনা থাকে। কিন্তু এই ভণ্ড এবং মিথ্যুকের দল কি কখনো তা করে? আর ঈশ্বর না করুন, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের হঠাৎ কখনো কিছু যদি হয় এবং তার শোক সংবাদ লেখার ভার পড়ে এই ভণ্ডুলের ওপর তবে ভণ্ড সম্পাদকের মুখোস খুলে দিতে পারে সে। তাছাড়া সম্পাদকের ওপর ভণ্ডুলের ক্রুদ্ধ হবার কারণ আছে।

'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক মশাই আবার ভণ্ডুলকে না-হক পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন," কী যে মশাই, ছাইভস্ম লিখেন আপনি, তার মাথামুণ্ডু নেই—দেখুন

তো, 'গ্রন্থাগার'-এর বর্ণসূচী প্রস্তুত করতে গিয়ে এই ভদ্রমহিলা কী রকম মুস্কিলে পড়েছেন।' ভণ্ডুল দেখল, সত্যিই একগাদা কার্ড হাতে নিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে এক ভদ্রমহিলা সম্পাদকের কাছে বসে আছেন। সম্পাদক ধমক দিয়ে বললেন, শুধু লিখলেই তো চলবেনা, এখন বলুন, কী আপনার 'সবজেক্ট'। ভণ্ডুল মাথা চুলকে 'আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি'—বলে সেখান থেকে সরে পড়েছে। আর একবার সত্যি কথা কবুল করছে ভণ্ডুল; অনেক চিন্তা করেও 'সবজেক্ট'-টা যে কী হবে তা সে স্থির করতে পারেনি। আপনারা কি কেউ ভণ্ডুলকে বলে দিতে পারেন 'সবজেক্ট'-টা কী হবে?

IN CALCUTTA NOW: A Running Commentary by Bhandula nanda Sharma—a morbid Correspondent from the 'City of Death'.

সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব—১৯৬৭

পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব আগামী ১১শে ডিসেম্বর বিকাল ৫-৩০ ঘটিকায় ভারত সভা ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এই উৎসবে যোগদান ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানানো হইতেছে।

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্ম আহ্বায়ক
পুনর্মিলন উৎসব কমিটি, ১৯৬৭

পরিষদ কথা

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীফণি ভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ কাজ থাকার দরুণ ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সম্পাদকের অনুরোধক্রমে "পশ্চিমবংগ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটি"র পক্ষ থেকে বর্তমান সমিতির সদস্য শ্রীসত্যব্রত সেন গত ২৬.৯.৬৭ তারিখে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে নীরব মিছিল তথা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তার পূর্ণ মৌখিক বিবরণ সভার অবগতির জন্য রাখেন। ঐ স্মারকলিপির প্রত্যুত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন দাবীর ওপর ২৪শে অক্টোবর '৬৭ এক বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির সভায় স্থির হয় যে, উক্ত ২৪-১০-৬৭ তারিখে সম্মেলনে মিলিত হবার আগেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে "স্মারকলিপির" এক খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

তদনুসারে—কয়েকটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করে—গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন দাবীর ওপর ভিত্তি করে স্মারকলিপির এক খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

২৯-৯-৬৭ তারিখের সভায় ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগারের সকল বৃত্তি ও অবৃত্তিকুশলী কর্মীদের (কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকেরই নয়) বিভিন্ন দাবীর বিষয়ে যে প্রস্তাব রাখেন সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর '৬৭ গ্রন্থাগার সপ্তাহকে কেন্দ্র করে যাতে "গ্রন্থাগার আইনের দাবী সপ্তাহ" রূপে সারা বাংলা দেশে পালিত হয় শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর এই প্রস্তাব "কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের জন্য গৃহীত হয়।

২৪-১০-৬৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্মারকলিপির ওপর যে বিস্তারিত আলোচনা করবেন তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আগামী আন্দোলনের কার্যক্রম স্থির করবার জন্য শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর এ প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সম্পাদকের প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে 'কো-অপ্ট' করা হয়।

(১) শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায় (৩) শ্রীভবরঞ্জন দাস চাকলাদার

(২) শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত (৪) শ্রীদ্বিজেন গুপ্ত

(৫) শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত ২৪শে অক্টোবর ১৯৬৭, "পশ্চিমবংগ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অডিনেশন কমিটি"র প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবংগের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে এক বৈঠকে বসেন। শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য দাবির প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বর্তমান আর্থিক অনটনের দরুণ শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবীগুলির পরিপূর্ণ বিবেচনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে সম্ভব নয় বলে জানান। তবে ১৯৬৮-৬৯ সালের আর্থিক বৎসরে দাবীগুলোর বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

"পশ্চিমবংগ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অডিনেশন কমিটি"তে সক্রিয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং এশিয়েটিক সোসাইটির কর্মী সমিতি।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিদলের আলোচনার হুবহু ধারাবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো।

Draft proceedings of the meeting of a group of Deputationists (Librarians) with the Hon'ble Education Minister, 24th October, 1967.

A group of Librarians from different categories of Libraries representing the West Bengal Library workers Co-ordination Committee, met the Hon'ble Education Minister on the 24th October, 1967, at 6 P.M.

Different problems with regard to the status of librarians facilities of work, pay-scale and other benefits offered to them, were discussed. The following points were agreed to in principle by the Hon'ble Minister. He, however, emphasised that the implementation can only be taken up gradually by stages subject to the availability of funds.

(1) Librarians and other qualified professional staff of all categories of Libraries should be regarded as academic staff and benefits enjoyed by the academic staff such as :

(a) Provident Fund, Pension, Gratuity, Dearness Allowance etc.,
(b) Free Tuition of wards,
(c) Uniform Service Rules,
(d) Deputation to Professional Courses with full pay, should be extended to them also.

(2) Librarians of College Libraries should be given the pay-scale recommended by the University Grants Commission.

(3) Librarians of School Libraries should get a pay-scale accor-

ding to their academic and training qualifications as in the case of teachers and not according to the number of books in the Library.

(4) The system of Security Deposit required in case of certain categories of Librarians should be discontinued.

(5) Librarians should be, as far as practicable, made the Secretaries/Asst. Secretaries of the Committee of Management of the Sponsored and the Aided Libraries. In case of Libraries attached to Educational institutions benefits enjoyed by teachers (such as membership of the Governing Body, seat in the Teachers' Council, etc.) should be extended to the Librarians.

(6) As regards "abolition of the sponsored system" and conversion of all sponsored Libraries into Govt. Libraries, the Hon'ble Minister observed that while he would like to see the state taking over all responsibilities and all powers in respect of these and similar institutions and establishments, this is not going to happen immediately. In this particular case, apart from financial implications which may be forbidding at the moment, many administrative and legal factors have to be examined before such a proposal can be correctly formulated.

(7) Hon'ble Midister agreed to consider the case of granting D.A. from Govt. Funds under certain conditions to the Librarians of Special Libraries run by Learned Societies and Research Institutions, if the authorities of Societies & Institutions approached the Govt. for such aid with adequate Justification.

(8) The problem of regular payment to Library Staff of sponsered and aided Libraries was discussed. Hon'ble Minister said that he would ask for adequate provision in the next year's budget so that an advance payment for one quarter could be made.

(9) Hon'ble Minister also desired that the cases of further revision of the pay-scales of library staff be referred to the Pay Committee with adequate Justification supported by facts and figures.

Sd/—A. K. SEN
30.10.67

স্পনসর্ড লাইব্রেরীর নতুন বেতনক্রম সম্পর্কে সরকারী আদেশ
Govt. Order No. 3560-Edn. (D) Dated 12.7.65.

The undersigned is directed, to say that the question of further improvement of service conditions of the staff of Government sponsored libraries has been under the consideration of Government for some time The Governor is now pleased to sanction the revised scales of pay as detailed in the Annexure for the staff of the Government sponsored District Libraries, Sub-Divisional Town Libraries, Area Libraries and Rural Libraries which have been or may be established under the Scheme of Development and Expansion of Library Services in the State. The revised scales of pay are effective from the 1st. April, 1967.

2. The pay of the existing staff in the revised scales may be fixed in the following manner :—

(i) It will be open to any member of the staff to come under the revised scales on 1st April, 1967 or on any date subsequent to the 1st April, 1967 if it is more advantageous to him. For the purpose of increments in the revised scales, the period of one year should be counted from the date of fixation of the pay in the revised scale.

(ii) The pay in the revised scales should be fixed on 1st April, 1967 or on the date of option at the stage which is immediately above the pay of the incumbent on the 31st March, 1967 or the date immediately preceeding the date of option, as the case may be.

3. Option should be exercised in the enclosed form. Option once exercised should be treated as final. If the option is not exercised within one year from the date of issue of this order, the pay of the staff concerned should be fixed in the revised scale applicable to him with effect from the 1st April, 1967.

5. Such existing staff of any Government Sponsored Library as do not possess qualifications (both academic and training) specified in the Annexure in respect of corresponding posts, are permitted to continue to work in their respective posts on existing pay till they acquire the requisite qualifications.

6. Such existing staff of any Government Sponsored Library, as possess only the academic qualifications specified in the Annexure in respect of corresponding posts but have no Certificate/Diploma of Training in Librarianship, may draw pay at the initial stage of the respective

revised scale of pay with effect from 1st April, 1967 or from the date of option but any increment in pay till they obtain a Certificate/Diploma of Training in Librarianship.

7. The Director of Public Instruction, West Bengal is now authorised to proceed with the implementation of the Revised Salary Scheme as now approved.

8. The extra cost involved for the payment of grant for the increase in salary in the revised scales will be regarded as development expenditure during the Fourth Five Year Plan period and will be debited to the head "Development Schemes-Fourth Five Year Plan—Social Education - Development and Expansion of Library Services" in the 28 – Education Budget, which may be augmented by re-appropriation or otherwise in due course.

9. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. A. VII. 651/67 dated the 24th July, 1967.

10. The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/—G. C. Mallick—Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal,
Education Department S. E. Branch.

Association notes

ANNEXURE

Revised scale of pay sanctioned for the staff of the Govt. Sponsored Libraries.

Library / Staff	Existing scale of pay as on 31. 3. 67	Revised scale of pay preseribed with effect from 1. 4. 67
DISTRICT LIBRARY		
1. Librarian Possessing Ordinary Bachelor's degree with Diploma in Librarianship.	Rs. 160-7-223-8-295 plus an allowance of Rs. 25/ p.m.	Rs. 167-7-237-8-317 plus an allowance of Rs. 25 p.m.
2. Assistant Librarian (for West Dinajpur District Library only) possessing Ordinary Bachelor's Degree with Diploma in Librarianship	" 160-7-223-8-295/	" 167-7-237-8-317
3. Library Assistant :—School Final or its equivalent with training in Librarianship.	" 80-1-90-2-110-3-125	" 115-3-172-4-180
4. Library Attendant :—School Final standard with experience in Library activities.	" 65-1-85	" 80-1-85-2-105
5. Cleaner—	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
6. Peon —	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
7. Durwan—	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
8. Night Watchman—	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
SUB-DIVISIONAL TOWN LIBRARY		
1. Librarian possessing Ordinary Bachelor's Degree with Diploma in Librarianship.	" 160-7-223-8-95	" 167-7-237-8-317
2. Library Assistant—School Final or its equivalent with training in Librarianship.	" 80-1-90-2-110-3-125	" 115-3-172-4-180
3. Duftry-cum-Book Binder.	" 45½55-60	" 60-½-65-1-75
4. Durwan-cum-Night guard.	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
AREA LIBRARY		
1. Librarian :—School Final or its equivalent with training in Librarianship.	" 80-1-90-2-110-3-125	" 115 3-172-4-180
2. Cycle Peon —	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75
RURAL LIBRARY		
1. Librarian :—School Final or its equivalent with training in Librarianship.	" 80-1-90-2-110-3-125	" 115-3-172-4-180
2. Cycle Peon.	" 45½55-1-60	" 60-½-65-1-75

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

পশ্চিম বঙ্গের সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের নিকট আবেদন

প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এই বৎসরও ঐ দিবসটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালনের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৪২ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে বাংলাদেশের অসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

দিনটির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা হল ১৯২৪ সালে বেলগাঁওতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানুষের যথোচিত শিক্ষা ও সমাজচেতনা; সর্বস্তরের মানুষকে স্বীয় ইচ্ছা, অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষিত করে তোলার সর্বোত্তম মাধ্যম হোল গ্রন্থাগার; মানুষ নির্বিশেষে দেশের সকল অধিবাসীকে পাঠক্ষম ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন। ঐ সম্মেলনে সেজন্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ভারতের তৎকালীন প্রতি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই সিদ্ধান্তকে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হন পরিষদের প্রথম সভাপতি।

পশ্চিম বঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিগত বিয়াল্লিশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহুদিক থেকে তার সাফল্য যেমন সুচিহ্নিত তেমনি অনেকাংশে তার আদর্শ পরিণতি লাভ করে নি। এ-রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতির মন্থরতা তার প্রধান কারণ। সম্প্রতিকালে যে-মানসিক শূন্যতাজনিত সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। নিরক্ষরতা ও পাঠরুচির অভাব-হেতু মানসিক বিকাশ ও সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থাগারের অভাবে শিশু ও কিশোর-দের পাঠপ্রবণতা যেমন স্ফুরিত হচ্ছে না, তেমনই যথোচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় বহু অঞ্চলেঅরবি-

বাসীরা গ্রন্থাগারের সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত। নিরক্ষর ও নির্বিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত নয়। এমনকি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতেও বিনা চাঁদায় ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। মূলত: গ্রন্থাগারের অভাব ও অব্যবস্থার জন্যে পাঠস্পৃহার ক্ষতি পরোক্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগসুবিধা স্থায়ী, দৃঢ়ভিত্তিক ও সর্বজনমুখী করার একমাত্র উপায়স্বরূপ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ সোচ্চার। অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কর্তৃপক্ষ আজও এবিষয়ে নিষ্ক্রিয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সমাজের সকল মানুষেরই স্বার্থ জড়িত। সেজন্যে দলমত নির্বিশেষে সকলেরই চাই মিলিত প্রয়াস। গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরার উপযুক্ত সময়। নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের অনুরোধ জানাচ্ছে :

১. ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন এবং ঐদিন থেকে এক সপ্তাহকাল গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপন।

২. জনসভা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

৩. কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পক্ষে জনমত গ্রহণ ও প্রচার।

৪. সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. স্থানীয় অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষিতদের পাঠস্পৃহা সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ।

৬. স্থানীয় অঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে লোকান্তরিত বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা।

গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহে আহূত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ এবং তার অনুলিপি স্থানীয় বিধানসভা সদস্য ও শিক্ষামন্ত্রীকে পাঠানোর জন্যেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনুরোধ জানাচ্ছে। অনুষ্ঠানের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রেরণের জন্যেও অনুরোধ করা যাচ্ছে :

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাবটি গ্রহণ এবং তার অনুলিপি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং স্থানীয় বিধান সভার সদস্যের নিকট প্রেরণ এবং সভার কার্যবিবরণী পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রেরণেরও অনুরোধ করা যাচ্ছে :

খসড়া প্রস্তাব—

এই সভা মনে করে যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্বস্তরের মানুষের যথোচিত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং ধনীনিধন, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বজনের শিক্ষার এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থাগার। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু, স্থায়ী ও সুদূর বনিয়াদের প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় জনসভা
বুধবার ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা
স্টুডেন্টস হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কর্মসচিব

১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আচার্য দীনেশ সেন জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

স্নাতকোত্তর :—'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব'। ২০ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৬৪০০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ২০০, ১৫০ ও ১০০ টাকা।

স্নাতক :—'বাংলা লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য'। ১৫ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৪৮০০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১৫০, ১০০ ও ৭৫ টাকা।

উচ্চ, উচ্চতর মাধ্যমিক ও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়—'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনী ও সাহিত্যসাধনা'। ১০ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৩২৮০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১০০, ৭৫ ও ৫০ টাকা। ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা, প্রধানের পরিচয়পত্র, নিজ নাম, পিতার/স্বামীর নাম, বর্ষ, শ্রেণী ও বয়স সহ আগামী ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে বাংলায় লেখা প্রবন্ধ ডাকযোগে বা লোকমারফতে ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ফুলস্ক্যাপ কাগজে দশ শব্দের পংক্তিতে বত্রিশ পংক্তির পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় উক্ত ঠিকানায় জানা যাইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার। ১৮-এফ পাতাম্বর ঘটক লেন। কলিঃ ২৭

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রী দেবকুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে।

সর্বশ্রী মনি সান্যাল (সভাপতি), দেবকুমার ঘোষ, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধাংশু-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), অমল কুমার গোস্বামী (সম্পাদক), অশোক দাস (সহঃ সম্পাদক), পরিমল চক্রবর্তী (গ্রন্থাগারিক), বিশ্বতোষ পাল (কোষাধ্যক্ষ), সুনীতি-সুন্দর ঠাকুর, কল্যাণকুমার রায়, ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র প্রসাদ রায়চৌধুরী, অজিত কুমার চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু (সদস্যবৃন্দ)।

সাধারণ পাঠাগার। নকুল চন্দ্র সেন স্মৃতি ভবন। ২৭/১এ অশোকগড় ইষ্ট। কলিঃ ৩৫

সর্বসম্মতিক্রমে গ্রন্থাগারের নূতন ভবনটির নামকরণ "নকুলচন্দ্র সেন স্মৃতি ভবন" করা হয়েছে। ৺নকুলচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থাগারের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট বই-এর সংখ্যা ২৪০০ এবং সভ্য সংখ্যা ১২৬ জন।

গত ২০শে আগষ্ট, '৬৭ সাধারণ অধিবেশনে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন:

সর্বশ্রী সুনীলকুমার রায় (সভাপতি), হরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও যাদব দাস (সহঃ সভাপতি), মৃণালেন্দু গোস্বামী (সম্পাদক), জীবনকৃষ্ণ পাল (যুগ্ম-সম্পাদক), হরিপদ ঠাকুর (গ্রন্থাগারিক), বিভূতিরঞ্জন ভট্টাচার্য, রণজিৎ সান্যাল, মনোজিৎ কুণ্ডু, শচীন্দ্রমোহন পাল, মনীন্দ্রচন্দ্র দাস, তিমির রায় চৌধুরী (সদস্য)।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। মানকর।

গত ২২শে অক্টোবর, '৬৭ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে অমরারগড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসাধন কর মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বিজয়া সম্মিলনী' অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রী অনিলবরণ পাল তাঁর লিখিত বিবরণীতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজ ও সমস্যাবলীর উল্লেখ করেন। বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী, বিমলকুমার বিশ্বাস, অলোকনাথ ঘোষ, শম্ভুনাথ পাঠক, বিমলকৃষ্ণ সাহা, জগবন্ধু চক্রবর্তী, প্রণবানন্দ ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার চক্রবর্তী এবং বাসুদেব দত্ত। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বীরভুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ রামরঞ্জন পৌরভবন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। অমর সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সঙ্ঘ। জলঙ্গী।

গত ২রা অক্টোবর, '৬৭ মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "পরিচ্ছন্নতা দিবস" পালন করা হয়। ঐদিনকার সভা স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্থানীয় অঞ্চল পরিষদের সভাপতি শ্রীশ্যামাদাস নন্দী। সেদিন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুরের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীঋষিপদ মিস্ত্রি এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীপবনকুমার কুণ্ডুর পরিচালনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫।৪ মহাত্মা গান্ধী রোড।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মহান ও প্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে তিনদিনব্যাপী শিশু ও কিশোরদের উপযোগী একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনী ঐ তিনদিন প্রত্যহ বিকাল ৩টা থেকে ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

হুগলী

আইয়াঁ বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার। আইয়াঁ।

আইয়াঁ বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার উদ্যানে গত ২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বিশিষ্ট কর্মী শ্রীসাধনচন্দ্র কোলে মহাশয়। রামধুন সঙ্গীত ও সাফাই কাজে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় যুব সম্প্রদায়। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু মহাশয়। সভায় গীতা ও কোরান পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীনবকুমার বটব্যাল ও সেখ নওসের আলী এবং সভার শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার পরিচালিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা 'শিখা'র প্রথম প্রকাশ ঘটে।

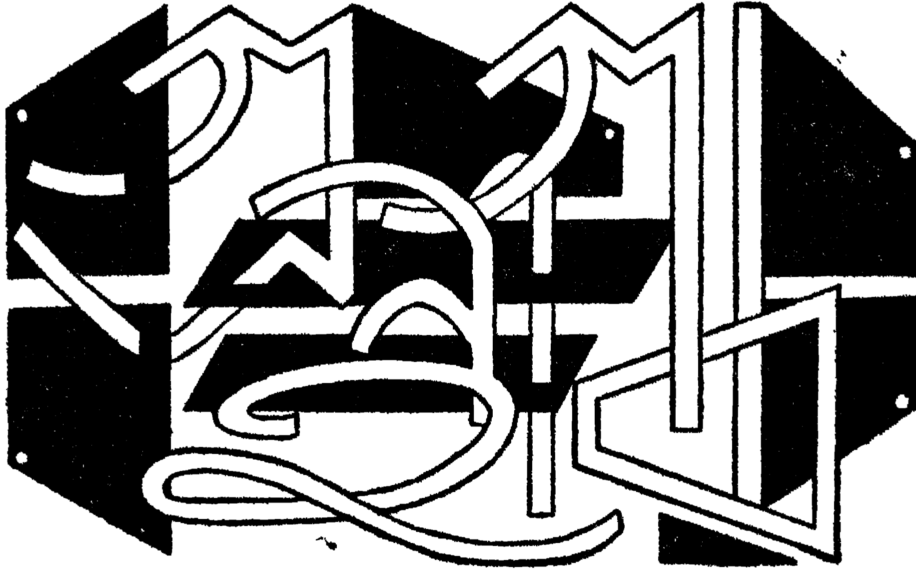
গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ বিকাল ৬টায় ষ্টুডেণ্টস হলে (কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় জনসভা উদযাপন করা হবে। ১৯৬৭ সালে যেসব পরীক্ষার্থী পরিষদ পরিচালিত লাইব্রেরী সায়েন্স সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেছেন ঐদিন তাদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হবে। এবং গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার দত্তকে ৺তিনকড়ি দত্ত পদক দেওয়া হবে।

২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস'

এবং ঐদিন হতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার

সপ্তাহ পালন করুন।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

সপ্তদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩৫৯

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সান্ধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক :—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৯ } { ১৩৭৪, পৌষ

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যৎ

গ্রন্থাগার বৃত্তি গত বিশ বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে একটি প্রায় অপরিচিত বৃত্তি থেকে ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করছে। এর মূলে রয়েছে ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির অবদান, এবং কতিপয় ব্যক্তি, বিশেষ করে, গত তিরিশ বছরেরও অধিককাল ধরে ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। সর্বভারতীয় ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির বিভিন্ন সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে অতীতে যে সকল প্রচেষ্টা চলেছে ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা কেবল প্রস্তাবাকারেই থেকে যায়নি, তার কিছু কিছু ফলও বর্তমানে ফলতে শুরু করেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা এখন প্রফেসর, রিডার ও লেকচারারের সমান মর্যাদা পাচ্ছেন। গ্রন্থাগার বৃত্তির এই জয়যাত্রার হয়তো অনেক কারণই আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পের সাহায্যে গ্রন্থাগারের জন্য অকৃপণভাবে অর্থও মঞ্জুর করছেন। বেসরকারী সংস্থাগুলিতেও শিল্প-বাণিজ্য-গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বেড়েছে। কারণ যাই হোক, গ্রন্থাগার বৃত্তি যে সম্প্রতি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সমস্ত কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের দেশের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবৃত্তির মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে মাত্র; কিন্তু এখনো আমাদের অনেক কিছুই পাওয়া বাকী আছে। সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার বৃত্তির অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ও দেশেও গোড়ার দিকে অনেক বাধা-নিষেধ ছিল। আমাদের দেশে এখনও যেমন রয়েছে, সেসব দেশেও কর্তৃপক্ষের মনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুরূপ সংশয় ছিল এবং গ্রন্থাগারের জন্য সরকারের অর্থব্যয় সম্পর্কে দ্বিধার ভাব ছিল। সুখের বিষয়, ক্রমাগতঃ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলে সে সকলে বাধানিষেধের প্রায় সকলই অন্তর্হিত হয়েছে। আমাদের দেশেও গোড়ার দিকে এই সকল গ্রন্থাগার পরিষদ যাঁরা গঠন করেছিলেন এবং সেগুলির পরিচালনা করেছিলেন তাঁদেরও

যথেষ্ট বাধা নিষেধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা কাজ করে গেছেন বা আজও করে চলেছেন। উদ্বেগের বিষয় এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগের সেই সকল আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশঃই বিরল হয়ে আসছে। আজ যাঁরা গ্রন্থাগারবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করছেন তাঁদের ভেবে দেখা উচিত যে, গ্রন্থাগারের কাজের মানের উন্নয়ন তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার মান যেমন একদিকে বাড়াতে হবে তেমনি নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা, সম্মেলন ও সেমিনার ইত্যাদিতেও যোগ দিতে হবে। গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হয়ে তার বিভিন্ন কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। এক কথায় তাঁরা যে শুধু জীবিকার জন্য গ্রন্থাগারে কাজ করছেন এটা না ভেবে তাঁদের নিজেদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী বলে মনে করতে হবে।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন লাইব্রেরী বাজেটে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ না হলে কি করে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্ভব? আর গ্রন্থাগার কর্মীরা উপযুক্ত বেতন না পেলে কাজের প্রেরণা পাবেন কোথা থেকে? একথা ঠিকই যে অর্থের অভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। আর একথাও ঠিক যে কর্মীরা উপযুক্ত বেতন না পেলে শুধু আদর্শবাদ তাদের সামনে তুলে ধরে কোন ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে শুধু বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়িয়ে লাইব্রেরীকে বড় করলেই তার উন্নতি হয় না। গ্রন্থাগারে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী যদি না থাকে—গ্রন্থের তালিকা তথা সূচীকরণ ও বর্গীকরণের ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং পাঠককে সাহায্য করার মত মনোভাবই যদি না থাকে তবে শুধু গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা কোন ফলই হবে না।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ দেখা যায় যখন দেখি লাইব্রেরীতে লোক ভীড় না ক'রে করে সিনেমায়-থিয়েটারে এবং ফুটবলের মাঠে। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থব্যয় সঙ্গত কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। অবশ্য গ্রন্থাগারে পাঠক কেন ভীড় করে না তার নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার প্রচারে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও নিশ্চয়ই একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ক'টি গ্রন্থাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করে? এক রকমের উৎসাহহীনতা আমাদের ক্রমশঃ গ্রাস করতে চলেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন অবস্থাতেই নিরুদ্যম হওয়া উচিত হবেনা।

আমাদের অনেকেরই ধারণা, গ্রন্থাগার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যতের সঙ্গে এ সকল প্রশ্নই জড়িত।

Editorial : The Future of Librarianship in India.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন ঃ দ্বিতীয় সূত্র

দিলা মুখোপাধ্যায়

ব্যবহারের জন্য বই

আমি একটি প্রবন্ধে বলেছি, মানব সভ্যতায় জ্ঞানের সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় মানুষের শেখবার ক্ষমতার যথেষ্ট অভাব থাকার দরুণ মানুষকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন এবং ঐ 'Principle of scarcity of the human capacity to learn'—এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এবং ঐ দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগারের যা কিছু টেকনিকের সৃষ্টি।

ব্যবহারের জন্য বই। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকে বলেই তার ব্যবহার। প্রয়োজন না থাকলে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। আবার অনেক সময়ে বইয়ের প্রয়োজন থাকলেও তার ব্যবহার হয় না। আবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেকের শেখবার ক্ষমতা অনুযায়ী বই না থাকার দরুণ পাঠকের প্রয়োজন মেটে না।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের ইতিহাস

পুস্তকের এবং গ্রন্থাগারের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে, এমন সময় ছিল যখন কারুর জন্যে বই লেখা হতো না। ফলে গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখবার জন্যেই বই সংগ্রহ করে রাখা হতো এবং তা সংরক্ষণ ও নকল করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতো। নকল করা বই বিক্রি হ'তো এবং সে জন্যে পুস্তক বিক্রয়ের কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বই কেনা হতো সংগ্রহের সখ মেটাবার জন্যে, সাহিত্যকারের কোন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নয়। ফলে "ব্যবহারের জন্য বই" এ কথাটা সে সময়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তখন গ্রন্থাগারের মূল কথাই ছিল "সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বই।"

মধ্যযুগের শেষের দিকে গ্রন্থাগার বলতে বোঝাত একখানি ছোটখাটো "magasin a' livers" অর্থাৎ বই ভর্তি ঘর। এখানে পড়বার জন্য কোন স্থান ছিল না। গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল একখানি খাতায় বইয়ের নাম টুকে রাখা এবং মন্দিরের সাধুদের মধ্যে যে বই বিলি হতো তার হিসেব রাখা। বইয়ের কোন লোকের সে সঞ্চয়ের উপর অধিকার ছিল না, এবং সে অধিকার তারা দাবীও করেনি, কারণ তাদের প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ সে সময়ের সমাজ গড়ে উঠেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এবং ধর্মকে বাস্তবতার রূপ দেবার জন্যে যেমন মন্দির গড়ে উঠেছিল তেমনি গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল সত্যই গ্রন্থের আগার হিসাবে এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারকে বিচার করা হয় মানব

সভ্যতার অমূল্য প্রতীক হিসাবে। সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যান্য Economic institution-এর মত সমাজভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবে এ কথা তখনকার মানুষ ধারণাও করতে পারত না।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বই ছিল ধর্মমন্দিরের সম্পত্তি এবং ধর্মের ভিত্তিতেই তা ব্যবহার করতেন মন্দিরের পুরোহিতেরা। তার কারণ সে সময়ে সমাজের গঠন হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, এবং বইকেও ধর্মের মত পবিত্র বস্তু ধারণায় সযত্নে সংরক্ষণ করা হতো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে যখন নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকল তখন গ্রন্থাগার ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠতে থাকল এবং বই ব্যবহার হতে থাকল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে। এই সময়কার নতুন গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি নাম করা গ্রন্থাগার হলো Sorborn বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। বই মন্দিরের গণ্ডি কেটে বার হলো বটে কিন্তু মুক্তি পেল না। বইকে গ্রন্থাগারে শৃঙ্খলিত করে রাখা হলো।

তারপর ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এলো Humamism reform-এর যুগ। মানুষ নিজের সত্তা এবং নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে থাকল।

গ্রন্থাগারও মানুষের মত ধর্মের গণ্ডি কেটে বার হলো। Reformation-এর যুগে ধর্মমন্দিরের গ্রন্থাগারগুলি লুট হয়ে গেল, এবং সেই লুটের মাল দিয়ে তৈরি হলো পৌর গ্রন্থাগার। Nuremberg, Francfurt, Lubeck ও Hambourg সহরে বিশেষ করে পৌর গ্রন্থাগার গড়ে উঠলো। অন্যান্য স্থানে রাজা রাজড়াদের গ্রন্থাগার এই লুটের মালে পরিপুষ্ট হলো।

এই সময়েই হলো ছাপাখানার সৃষ্টি এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ছাপাখানার প্রভাব পুরাপুরিভাবে গ্রন্থাগারের উপর পড়ল।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত হলো। কিন্তু গ্রন্থাগার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার পিছনে, রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয়, বা ধর্মমন্দির কেউই ছিল না। জনসাধারণের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তি যারা শখ করে নিজের নিজের গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিল তারাই তাদের গ্রন্থাগারের সঞ্চিত রত্ন ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের কাছে তাদের গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ইংলণ্ডে Thomas Bodley, Oxford-এ সৃষ্টি করলেন Bodleian Library; Federigo Borromini ইতালীতে সৃষ্টি করলেন—Ambrosian গ্রন্থাগার, কার্ডিনাল mazarin ফ্রান্সে গড়ে তুললেন Mazarine গ্রন্থাগার—এই সকল গ্রন্থাগার খুলে দেওয়া হলো "যারা পড়তে চায়" তাদের কাছে।

এর পরে এলো ফরাসী বিপ্লবের যুগ। ফরাসী বিপ্লবের পরেই গ্রন্থাগার Technique গড়ে উঠলো এবং বই যাতে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করা হলো সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াও শুরু হলো।

এর পরে বইয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে বলবার মত আর কিছু নেই। শিল্প, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন শ্রমবিভাগ দেখা দিল তেমনি বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন দেখা দিল ফলে বই, সমাজের মধ্যে স্থান করে নেবার জন্যে মানুষের কাছে যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল অর্থাৎ বই হলো "means to an end"। মানুষের জীবনের সমস্যা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যত বাড়তে থাকল মানুষ ততই যন্ত্রের মত হয়ে দাঁড়াতে থাকলো এবং বইয়ের ব্যবহার ক্রমশ: "false compensation" হয়ে দাঁড়ালো। একেবারে আধুনিক যুগে এলে দেখা যাবে বই অপেক্ষা documentation-এর প্রয়োজন ক্রমশ: বেশী দেখা দিচ্ছে, কারণ মানুষের জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত শেখবার ক্ষমতার একতালে পা ফেলে চলা সম্ভব হচ্ছে না। সময়ের অভাবও একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইতো গেল বইয়ের ব্যবহারের ইতিহাস এবং এ কথাও বলেছি, বইয়ের ব্যবহার যাতে হয় সে জন্যেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আমি বহুবার বলেছি যে, মানুষের জীবনের সমস্যা যত বেশী বাড়ে তত বেশী বইয়ের চাহিদা বাড়ে এবং বইয়ের ব্যবহারও তত বেশী বাড়ে। ফলে যে দেশ যত বেশী underdeveloped সে দেশে বইয়ের ব্যবহার তত কম, কারণ সে দেশে জীবনের সমস্যা কম এবং জানবার প্রয়োজনও কম। বংশ পরম্পরায় অর্জিত জ্ঞানের দ্বারাই সে দেশের মানুষ নিজের নিজের জীবনের সমস্যা দূর করতে পারে। সুতরাং তাদের নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। তাদের বিশ্বাস, তাদের ধারণা, তাদের সংস্কারের উপর ভিত্তি করেই তারা সুখে জীবন কাটাতে পারে।

গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তক

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকের ব্যবহারের কিরূপ ক্রমবিবর্তন হয়েছে তা আমরা দেখলাম। পুস্তকের ব্যবহারের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞারও ক্রমবিবর্তন হয়েছে, তাও আমরা কিছুটা বুঝতে পারলাম। পুস্তকের ব্যবহারের ক্রম-বিবর্তন এবং গ্রন্থাগারের সংজ্ঞার ক্রমবিবর্তন যে সামাজিক ভিত্তির উপর নির্ভর করছে সেদিকেও আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন করতে গেলে আমাদের সমাজের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পুস্তক নিবাচন করতে হবে। সমাজের ভিত্তি বা প্রয়োজন জানতে গেলে প্রয়োজন সমাজ সমীক্ষা। সমাজ সমীক্ষা বলতে আমি যা বুঝি তা হ'লো এই :

সমাজ সমীক্ষা বলতে বোঝায়, যে ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে উঠেছে সেই ইতিহাসকে নির্ধারণ করা। প্রত্যেক মানুষই "is a product of history" ফলে "he is always in his age"। এ কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আমাদের

পুস্তক নির্বাচনের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বইকে নিয়ে ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, কারণ ব্যক্তিকে আমরা সহজেই সমাজের মধ্যে "Situate" করতে পারি। আমাদের দেশে যারা গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় শীর্ষস্থানে বসে রয়েছেন —অর্থাৎ কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি দল—তারা চান জনসাধারণকে ভালো বই পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে, যদিও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের তিলার্ধ প্রভেদ নেই। কারণ সকলের পিছনের ইতিহাসই এক, এদের কাছে পুস্তক নির্বাচনের সমস্যাটা হচ্ছে মানুষকে নিয়ে অর্থাৎ "they think on the basis of the human problem of book selection"। তার ফলে হয় কি, গ্রন্থাগারে ভালো ভালো অব্যবহার্য বই সঞ্চিত হয় এবং "Total function of the library—total function of the stock" নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে সুতরাং "ব্যবহারের জন্য বই" এই সূত্রের ফল পাওয়া যায় না।

সমাজের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করে তবে আমাদের পুস্তক নির্বাচনের কাজ শুরু করতে হবে। জানতে হবে সে ইতিহাসকে বিচার করতে গেলে আমাদের সেই যুগের চরিত্রকে এবং চরিত্রটি গড়ে ওঠে মানুষের ধারণা এবং বিশ্বাসের উপর। "Which gives birth in pain to events that historians will label later on (as history)"। তাহলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যে সব বই থাকবে তা হবে, যে যুগের মানুষের জন্য বই, সেই যুগের প্রতীক। গ্রন্থাগার পুরানো যুগের গ্রন্থের আগার যদি না হয় তাহলে "The public library cannot afford to represent the past. It must represent the present because man can think only in relation to the present'.

"পাঠকের জন্য বই" এ কথাটি যদি আধুনিক গ্রন্থাগারের সংকলনের একটা চরিত্র হয় তাহলে পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে উপরে যা বললাম তা মেনে নেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত প্রত্যেকটি বই হবে in function তবেই আমরা গ্রন্থাগারের কাজের সম্পূর্ণতা আনতে পারব, যদিও সেরূপ সম্পূর্ণতা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই সমাজের মানুষের পাঠের সমুদয় চাহিদা মেটান সম্ভব নয়।

প্রয়োজন ও ব্যবহার

আমি পূর্বেই বলেছি যে আধুনিক সমাজের ভিত্তি যেমন অর্থনীতির উপর তেমনি আধুনিক গ্রন্থাগারের ভিত্তিও হচ্ছে অর্থনীতির উপর। গ্রন্থাগার কাজ করবে কেবল মাত্র distributing circuit হিসাবে consumption-এ সাহায্য করবার জন্য। এখানে consumption অর্থে বই পড়া। মানুষ বই পড়ে তার প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন দু-রকমের, উপস্থিত প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অর্থাৎ present need and future need.

উপস্থিত এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু জানবার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন বইয়ের consumption বলতে কি বোঝায়। বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর ব্যবহারই হলো consumption অবশ্য ব্যবহারটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। ময়দার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায় আবার ময়দার আটা তৈরী করে ময়দাকে জোড়ার কাজেও লাগান যায়। তবে বস্তুর ব্যবহার যে ভাবেই হোক, সেটা ব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু পুস্তকের ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না। বইয়ের ব্যবহার বলতে বই পড়া এবং বই পড়ে প্রয়োজন মেটান। কিন্তু না পড়েও বই consume করা যায়। কেউ একখানা বই যখনই কিনল তখনই বলা যায় বই খানির consumption শুরু হলো। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কি তাই হয়। সখের খাতিরে বা বসবার ঘরের শোভা বর্দ্ধন করবার জন্যে, কিংবা নিজেকে cultured বলে সমাজের কাছে জাহির করবার জন্যে বইয়ের ব্যবহার হতে পারে কিন্তু এভাবে বইয়ের ব্যবহারকে আমরা গ্রন্থাগারের দর্শনের দিক থেকে ব্যবহার বলতে পারি না যদিও সেরূপ ব্যবহার একটা প্রয়োজন মেটায় একথা অস্বীকার করা যায় না।

উপস্থিত প্রয়োজনে বইয়ের ব্যবহার

উপস্থিত প্রয়োজনে বইয়ের যে ব্যবহার করা হয়, তা কেবল উপস্থিত প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই—সেখানে বইখানিকে সম্পূর্ণ ভাবে consume করাই পাঠকের উদ্দেশ্য। আরও একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এভাবে একখানি বই একবার ব্যবহৃত হলে তা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। পাঠক বইখানি পড়তে শুরু করে, কথার পর কথা জু'ড়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যায়; লেখকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে, এবং লেখক যেমন বইখানিকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে পাঠকও বইখানিকে লেখকের মত সৃষ্টি করে। ফলে লেখক বই খানিকে সৃষ্টি করে যে আনন্দ পায় পাঠকও বই খানিকে সৃষ্টি করে সেই আনন্দ পায়। লেখক বইখানি সৃষ্টি করার পর আর তা ব্যবহার করতে পারে না কারণ সে বইখানিকে বস্তু হিসাবে নিজে থেকে আলাদা করতে পারে না, ফলে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানর কথাই আর ওঠে না। পাঠকের অবস্থাও তাই। বই খানির জন্ম হলো লেখকের হাতে, কিন্তু বই খানির নূতন নূতন রূপে জন্ম হতে থাকল পাঠকের হাতে; ঠিক মানুষের মত, মানবতার জন্মের শুরু থেকে যুগে যুগে নতুন রূপে জন্মে আসছে। যুগের প্রয়োজনে যেমন মানুষের নবজন্ম, পাঠকের প্রয়োজনে তেমনি পুস্তকের নবজন্ম। তফাৎ কেবল একটি জড় পদার্থ আর একটি জীবন্ত। তবে বইয়ের জীবন-মৃত্যু আছে সে কথা ভুললে চলবে না; কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে জীবনের সংস্পর্শে এলেই তবে বই জীবন পায়। সুতরাং বইয়ের ব্যবহারই হলো বইয়ের জীবন। যে বই ব্যবহার হয় না তা মৃত। সে ধরনের বই গ্রন্থাগারে ভরে রাখা মানে গ্রন্থাগারকে

গোরস্থানের রূপ দেওয়া। উপস্থিত প্রয়োজনে যে বই পাঠ করা হয় তা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বই, ভ্রমণের বই ইত্যাদি। এ ধরনের বইগুলিকে আমরা বলতে পারি pure creation. এ বইগুলি পাঠের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া।

ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পুস্তকের ব্যবহার

এ ধরনের পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লক্ষ্য করা অর্থাৎ এ ধরনের পাঠকে বলে "Reading as a means to an end"। কেবল সেই সব বইগুলিকে এভাবে ব্যবহার করতে পারা যায় যে সব বইকে pure creation বলা চলে না। এ ধরনের বই হলো সাহিত্য ব্যতীত আর যে কোন বিষয়ের বই। এখানে pure creation কথাটির আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে হয়। একখানি বইকে তখনই pure creation বলা যায় যখন অন্য কোন একখানি বই তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না কিংবা supercede করতে পারে না। তারাশঙ্করের "গণ-দেবতা" "গণ-দেবতা" লিখলে তা তারাশঙ্করের "গণ-দেবতা" হবে না, অর্থাৎ অন্য কোন বইয়ের পক্ষে "গণ-দেবতার" স্থলাভিষিক্ত হওয়া বা গণদেবতাকে Supercede করা সম্ভব নয়। কিন্তু Library classification-এর উপর বহু বই বার হতে পারে এবং একখানি চলতি বইকে আর একখানি বই এর স্থলাভিষিক্তও করতে পারে এবং Supercede-ও করতে পারে।

এই দুই ধরনের পাঠকে বা বইয়ের ব্যবহারকে গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে প্রথম ধরনের ব্যবহার হয় মানুষের মানবীয় প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয় ধরনের পাঠের প্রয়োজন হয় মানুষের জীবন্ত প্রয়োজনে। মানুষ এই দুইটি অবস্থার সমন্বয়, ফলে মানুষের এই দুটি প্রয়োজন আছে এবং বই এই দুটি প্রয়োজনই মেটাতে পারে। প্রথম ধরনের ব্যবহার মানুষকে মানবীয় হিসাবে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় ধরনের ব্যবহার মানুষের পার্থিব প্রায়োজন মেটায় অর্থাৎ তাকে Social animal হিসাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রধানতঃ প্রথম ধরনের ব্যবহারের দিকে এবং সেই ধরনের ব্যবহারের দিকেই লক্ষ্য রেখে তাকে পুস্তক সংকলন করতে হবে। দ্বিতীয় ধরনের ব্যবহারটা জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে হবে একটা বাড়তি কাজ; সুতরাং সেটা হবে দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য। এ ব্যবহারটা হবে বিশেষ গ্রন্থাগারের বিশেষ লক্ষ্য।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সঞ্চয়

আমি আগে বলেছি যে পাঠের যে প্রয়োজন তা নির্ভর করে পাঠকের পিছনের ইতিহাসের উপর। কিন্তু এই ইতিহাস গড়ে ওঠে পাঠক যে জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে

সেই জমিকে ভিত্তি করে। সুতরাং গ্রন্থাগারে আমাদের সেই সব বই রাখতে হবে যে সব বইয়ে পাঠক নিজেকে খুঁজে পাবে কারণ তার যে প্রয়োজন সে প্রয়োজনটা তার নিজেকে নিয়ে এবং তার নিজেরই জন্য। সেই কারণে Goethe বলেছেন —

"Und der Autor ist mir der liebste in dem ich meine Welt widerfinde, in dem es zugeht wie um mir. "Und dessen geschischte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen hanslich leben das freilich kein Paradis" —অর্থাৎ আমি সেই লেখকের লেখা সবচেয়ে ভালোবাসি—যার লেখার মধ্যে আমি আমার পৃথিবীকে, আমার সাংসারিক জীবনকে খুজে পাই—যে জীবন স্বর্গীয় না হলেও তা আমার ভালো লাগে, তা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। কথাটা খুব সত্যি কারণ, যা ভালোবাসা যায়, যা আমার ভালো লাগে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকা চাই তা'হলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে, যে দেশের গ্রন্থাগার সেই দেশের সমাজ, সেই দেশের মানুষ, সেই দেশের প্রকৃতি, সেই দেশের ভাবধারা সম্বন্ধেই বই রাখতে হবে। অন্য দেশের মানুষ সম্বন্ধে, অন্য দেশের সমাজ সম্বন্ধে লেখা বইয়ের এক দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখলে তার বিশেষ ব্যবহার হবে বলে মনে হয় না।

তবে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দূরের মানুষও কাছে এসে গেছে, ফলে বিশ্বসমাজ ক্রমশঃ গড়ে উঠছে দেশ দেশান্তরের মানুষের মধ্যে পরিচয় হচ্ছে সুতরাং গ্রন্থাগারে কেবল দেশীয় বই থাকলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু এ কথাও আমি বলতে বাধ্য যে, জাতীয়তাবোধ মানুষের অন্তরের বস্তু এবং এক জাতি কখনই নিজের জাতীয়তাবোধকে অন্যের সংগে এক করে দেখাতে পারবে না – কারণ তাতে তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা থাকে না।

সেই জন্যে গ্রন্থাগারের সংকলনকে Universal (বিষয়ের দিক থেকে নয়) করা একটা অলীক স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টেকনিক ও পুস্তকের ব্যবহার

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের টেকনিক যে principle of scarcity'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা আমি পূর্বের প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। Technique এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে বই যাতে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তাকে Principle of economy আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগারের Technique এর মধ্যে আছে পুস্তক নির্বাচন, পুস্তকের জাতি বিচার করে বই সাজান এবং তালিকা প্রণয়ন। পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে যতটুকু জানা প্রয়োজন তা আমি পূর্বে বলেছি। পুস্তকের জাতি বিচার ও তালিকা প্রণয়ন, এ দুটি Technique এর উদ্দেশ্য হলো বইকে পাঠকের

চেতনার আবর্তে এনে তার অস্তিত্বকে জীবন্ত করে তোলা—একখানি বই যতক্ষণ না পাঠকের হাতে পড়ছে ততক্ষণ তার অস্তিত্ব শুরু হয় না। তা হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-এর প্রথম কথা হবে গ্রন্থাগারে কি বই আছে—যা না আছে তা পাঠকের গোচর করার ব্যবস্থা করা।

পুস্তকের তালিকা

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনের ভিত্তি যেমন পাঠক, তেমনি গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকাও পাঠকের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। সুতরাং এক দেশের পুস্তক তালিকার টেকনিক আর এক দেশে নাও চলতে পারে। পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বইয়ের ব্যবহার বাড়ান। যে ধরনের বই ব্যবহার হবে সেই ধরনের বই গ্রন্থাগারে সঞ্চিত হবে। কিন্তু তালিকা যদি পাঠকের ব্যবহার উপযোগী না হয় তা হলে তালিকার উদ্দেশ্যও সফল হবে না, গ্রন্থাগারে পুস্তক সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যও সফল হবে না। সুতরাং যে নিয়ম অনুসারে গ্রন্থাগারের তালিকা গড়ে উঠবে সে নিয়মগুলি পাঠকগোষ্ঠিকে ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য তালিকার নিয়ম ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রন্থাগার চেতনা—এ সব বিষয় যখন সব দেশে সমপর্যায়ে উঠবে তখনই কেবল পুস্তক তালিকার নিয়মগুলি আন্তর্জাতিক হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন এলাকার মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান, শেখবার ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রন্থাগার চেতনার মধ্যে এত বৈষম্য যে একটি এলাকার তালিকা আর একটি এলাকায় অচল বলে মনে হয়। এই সব বিষয় চিন্তা করে, বিশেষ করে পাঠকের প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-সঞ্চয় করার ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের তালিকা গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা করবেন তাদের গ্রন্থাগার টেকনিক বা তালিকার টেকনিক জানা থাকা প্রয়োজন কিন্তু তারা যেন টেকনিকের দাস হয়ে না পড়ে। টেকনিকের জালে পড়ে তারা যেন নিজের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে না ফেলে।

পুস্তকের জাতি বিচার

গ্রন্থাগার যেখানে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত নয়, সেখানে পুস্তকের জাতিবিচারের সংখ্যা অনুযায়ী বই সাজানর কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে পুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বই সাজালেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। জাতি বিচারের যেটুকু প্রয়োজন তা তালিকায় বজায় রাখতে পারলেই হলো। কিন্তু যেখানে পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারের মঞ্চ উন্মুক্ত সেখানে একজাতীয় বই একস্থানে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, একজাতীয় বইয়ের সঙ্গে আর এক জাতীয় বইয়ের সম্বন্ধও দেখান

প্রয়োজন। পুস্তকের ব্যবহার যে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সেখানে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে পুস্তকতালিকা করতে গেলে তালিকা ভীষণ জটিল হয়ে পড়া সম্ভব কারণ সেখানে কোন্ বইখানি কোন্ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত হবে তা পাঠককে জ্ঞাত করা এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু মঞ্চে পাঠকের অবাধ গতি থাকলে এ সমস্যা একেবারেই থাকে না কারণ পাঠক সেখানে নিজেই দেখে নিতে পারে কোন বই সে পড়তে পারবে। পুস্তক তালিকায় পুস্তকের লেখনের দ্বারা পুস্তক প্রদর্শিত হয় কিন্তু বইখানির পাঠককে আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা আছে একখানি পুস্তকের লেখনের সে ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়। পুস্তক তালিকার ও পুস্তকের জাতি বিচারের, পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ী গুণাগুণ এখানে বিস্তৃতভাবে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থাগার প্রচার

প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহার বা consumption বৃদ্ধি করা। পুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে গেলেও প্রচারের প্রয়োজন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচার কার্য চালাবার যা পন্থা গ্রন্থাগারের প্রচার কার্যও ঐ একই পন্থায় করতে হবে। প্রচার কার্যের প্রধান কাজ হবে ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারে আকর্ষণ করা এবং পরের কাজ হবে salesman-এর কাজ। গ্রন্থাগার কর্মীর কাজের সঙ্গে Salesman-এর কাজের কোন বিভেদ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের দ্বারা ব্যক্তি আকৃষ্ট হলো, কিন্তু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পাঠক তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হলেও সে ঠিক জানে না, কি ধরনের বই সে পড়বে, এবং কি ধরনের বইয়ে তার প্রয়োজন মিটবে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ হবে তাকে তার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে তার পড়বার মত বই দেওয়া।

প্রয়োজন থাকলে তবেই গ্রন্থাগার প্রচারে কাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজ যে ঠিক কি তা আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে অপরিচিত। তার প্রথম কারণ বই পড়বার প্রয়োজনটা তারা অনুভব করে না। আমাদের দেশে পাঠের চাহিদা কেন কম তা আমি পূর্বেই বলেছি। আবার জনসাধারণের পুস্তকের প্রয়োজন যতটুকু আছে তারা সে সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে সচেতন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রচারের ক্ষেত্রে উদাসীন থাকা উচিত নয়। তার উপর বই আধুনিক সমাজে economic good ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক সমাজে বইকে economic good ব্যতীত অন্যরূপে বিচার করাও ভুল হবে কারণ যে কোন বস্তুর চরিত্র নির্ভর করে তার প্রয়োজন মেটানর ক্ষমতার উপর। সুতরাং প্রচারের সকল প্রকার মাধ্যমই গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

The Second principle of the philosophy of Librarianship By Dila Mukhopadhyay.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৬)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের (১৯২৬ খৃঃ) এই দ্বিতীয় অধি-বেশনের মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অতঃপর তাঁর ভাষণ দেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"একটা জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি হইল উহার সাহিত্য ও কলা। উহার জীবন যেমন হইবে সাহিত্যও হইবে তেমন, কলাও হইবে তেমন। একটা শক্তিমান ও বীর্যবান জাতির থাকিবে মহাকাব্য, যুদ্ধের কাহিনী, বীরত্ব, সাহসিকতা ইত্যাদির কাহিনী। আর দুর্বল জাতির থাকিবে প্রেম ও অনুরাগের গান। এই ধরনের জাতির ভিতরে সামাজিক কাব্য ও অসমসাহসিকতার কাহিনী থাকে। সদানন্দ জাতির থাকে মিলনান্ত নাটক, ছিদ্রান্বেষী রসিকতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

সাহিত্যের মতন যোদ্ধা জাতির কলায়ও থাকে বীরের মূর্তি ও বীরোচিত কার্যের আঁকা ছবি। আর ক্লীব জাতি ক্লীবের মূর্তি ও ক্লীবের ছবি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। চপল স্বভাবের জাতিগুলি তাহাদের চপলতাকে প্রকাশ করে পাথরের বুকে ও চটকাপড়ে।

আদিম জাতির মতন বর্তমান জাতিগুলি ততটা অমিশ্র উপাদানে গড়া নয়। সাধারণতঃ তাহারা মিশ্র উপাদানে গড়া। পারিপার্শ্বিক নানা দেশের লোকের সংমিশ্রণেই এই জাতিগুলি গড়িয়া উঠে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান গুণ দেখা যায়। সেই গুণ দ্বারাই তাহারা নিজেদের ও বহির্জগতের কাছে পরিচিত। কিন্তু যাহারা এরূপ একটি জাতিকে গড়িয়া তোলে তাহারা কমবেশী পরিমাণে তাহাদের বিশিষ্ট গুণাবলী নিয়া আসে। তাহার ফলেই গড়িয়া উঠে এক সর্বজনীন সাহিত্য। প্রাচীন হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল এইরূপ একটি মিশ্র সমাজ এবং ইহার সাহিত্যও সুন্দরভাবে সকলকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে আমি একটু পরে আলোচনা করিব।

সাহিত্য এবং কলা যেমন একটি জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি তেমনই গ্রন্থাগারও সেই প্রতিচ্ছবিরই একটি মূর্ত প্রকাশ। সেই প্রতিচ্ছবিই রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়া বলিতে পারি। ব্যষ্টির, সমাজের এবং মহাজাতির রুচি অনুসারে গ্রন্থাগারের আধেয় বস্তুর অনেক পার্থক্য ঘটে। একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের পুস্তক সাজাইয়া তাহার আলমারীর তাক ভর্তি করিবে, একজন সাহিত্যিক করিবে সাহিত্যের বা সাহিত্যবিষয়ক পুস্তক দ্বারা, ঐতিহাসিক করিবে ইতিহাসের পুস্তক দ্বারা, একজন আইনজ্ঞ আইনের পুস্তক এবং আইনসংক্রান্ত মতামতের বিবরণী দ্বারা, একজন রসিক লোক হাস্যরস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের পুস্তক দ্বারা ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ লঘু সাহিত্য

ও পাঁচমিশালি সাহিত্য থাকে। সহরের গ্রন্থাগারে থাকে সহরবাসীদের উপযোগী সব রকমের বই। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে থাকিবে ব্যষ্টি ও জাতির সর্বজনের প্রয়োজনসাধক পুস্তক। ওয়াশিংটনে এইরূপ একটি গ্রন্থাগার সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েক লক্ষ বই মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে আরও লক্ষ লক্ষ বই মজুত রাখিবার মত স্থানেরও সংস্থান করা হইয়াছে। বৃটিশ মিউজিয়াম এবং বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগার হইল ইংলণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার। প্রত্যেক দেশেরই একটি জাতীয় গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমেরিকা এই দিক দিয়া সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। একটা জাতির সর্বতোমুখী ক্রিয়াকলাপের মূর্ত রূপ হইল গ্রন্থাগার। আর বিবেচক পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারে গ্রন্থতালিকা তুলিয়া ধরে জাতির সমগ্র বৈশিষ্ট্যকে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রাচীন জগতের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা বিপুল। বর্ত্তমান সময় হইতে একশত বৎসর পূর্ব প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতগণ ঘোষণা করেছিলেন যে, ল্যাটিন ও গ্রীসীয় গ্রন্থকে একত্র করিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাহা হইতেও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ভাষায় বহু ও বিভিন্ন রকমের সাহিত্যও পাওয়া গিয়াছে। সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়া ও সাইবেরিয়ায় স্বদেশে অপ্রাপ্য বহু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং মিশ্র সংস্কৃতে শত শত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থরাজিকে সংস্কৃত হইতে পৃথক বলা যায় না। শুধু ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম-এই (গ্রন্থতালিকার তালিকা) প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সন্ধানকার্য এখনও চলেছে এবং প্রতি বৎসরই শত শত নূতন গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। দর্শন ও ব্যাকরণের অঙ্গ সহ সংস্কৃতে শুধু ধর্ম্ম-শাস্ত্রই আছে এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা ও বোধ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ভ্রান্ত ধারণা বেশ ব্যাপক ছিল। মেকলে-র ভয়াবহ পরিকল্পনার মূলে ছিল এই ভ্রান্ত ধারণা। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের বিরোধিতার মূলেও ছিল এই ভ্রান্ত ধারণা এবং ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইহাই একটি কারণ। এমন কি উইলসন সাহেবের মতে সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগীদেরও ধারণা ছিল না যে সংস্কৃত সাহিত্য কত ব্যাপক এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এক বিশাল মহাজাতির সর্বতোমুখী ক্রিয়াকলাপ ইহাতে কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

পাঁচ শত আঠারটি বিভিন্ন কলাকে আশ্রয় করিয়া ইহার সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। সাধারণের ধারণা কলার সংখ্যা মাত্র চৌষট্টি। কিন্তু চৌষট্টি হইল মূল কলা, ইহাদের ছাড়া চৌষট্টিটি ঔপায়িকী কলা এবং পঞ্চালে প্রচলিত পাঞ্চালিকী কলা ও এইরূপ কলা আটটি বর্গে বিভক্ত। এই আটটি বর্গে আবার চৌষট্টিটি কলা ছিল। ইহার অতিরিক্ত ছয়টি কলা লইয়া মোট কলার সংখ্যা হইল পাঁচ শত আঠার। কয়েকটি কলার

অনেক সাহিত্যও ছিল, যথা—নৃত্য, গীত ও বাদিত্র। কারুশিল্পেরও সাহিত্য ছিল, যথা—ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ও চিত্রাঙ্কন। ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ শাখাও আছে। অতীতের সহিত জড়িত বর্তমানের সাহিত্যের নাম ইতিহাস। বর্তমানের সহিত জড়িত ভবিষ্যতের সাহিত্যের নাম অন্য কোন ভাষায় দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃতে ইহাকে কর্ম-বিপাক বলা হয়। ইহা বর্তমান জগতের কার্যাবলীর একটি পঞ্জী। ভবিষ্য জগতে এই কার্যাবলীর কি সুফল ও কুফল ফলিবে ইহাতে তাহারই ইঙ্গিত থাকে। পত্রলিখন প্রণালী ও দলিলাদি লিখনপ্রণালী সম্পর্কেও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ আছে। এমন কি চৌর্যকৌশল সম্পর্কেও বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। গণিত এবং ব্যবহার সম্পর্কে রচিত বই তো অতীতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলই অধিকন্তু বর্তমান জগতকেও প্রভাবিত করিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বদনাম এই যে ইহার কোন ইতিহাস সাহিত্য নাই। ইহা সত্য নয়। আমি সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিহাস ও ভূগোল বইয়ের এক গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করিয়াছি। আপনারা ডি অগবিনি-র রচিত হিষ্ট্রি অব দি রিফরমেশন (ধর্মসংস্কারের ইতিহাস) বইয়ের প্রশংসা করেন। কিন্তু আপনারা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে সংস্কৃতে 'সম্প্রদায় প্রদীপ' নামক একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার আন্দোলনের একটি ব্যাপক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে বৃহৎ জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা শোনা যায় না। তাহার কারণ ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। কালিকলম ও লিখিবার উপকরণ যখন ছিল না তখন এই সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে স্মৃতিই গ্রন্থাগারের স্থান অধিকার করিয়াছিল। দুগ্ধখাদ্য ব্রাহ্মণদের স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করিত এবং অতি যত্নে তাঁহারা ইহার চর্চা করিতেন। গুরুগৃহে নয়, আঠার, সাতাশ এমন কি ছত্রিশ বৎসর থাকিয়া তাঁহারা শুধু তদানীন্তন সাহিত্য কণ্ঠস্থ করিতেন। অন্য ভাষায় সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় সংস্কৃতে যে তাহা বুঝায় না ইহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাই। যাহা লিখিত হয় তাহাই সাহিত্য। কিন্তু লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই সংস্কৃত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাজেই অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ একটি নিজস্ব শব্দ সংস্কৃতের আছে। এই শব্দটি হইল বাঙ্ময়। যে শব্দ স্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত হয় তাহাও সাহিত্য।

সব সময়েই বেদকে কণ্ঠস্থ করা হইত। পাণ্ডুলিপি হইতে বেদোচ্চারণ পাপ বলিয়া গণ্য হইত। কথিত আছে ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বেদ লিখিত হয়। ফা-হিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া লিপিকারের সাহায্যে তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রুত বিষয় লিখিয়া আনিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে তিনি কয়েকশত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

যাহা হউক পরবর্তী কালে প্রত্যেক পণ্ডিতই কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া

রাখিতেন। বহু পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ আছে বলিয়া ধনী ব্যক্তিরা গর্ব বোধ করিতেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের বিহার এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের মঠে ভাণ্ডার বা পুস্তকের সংগ্রহালয় থাকিত। সেখানে পাণ্ডুলিপির সর্বাধিক সংগ্রহ রহিয়াছে। এখানকার পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ষোল হাজার। ইহা একটি আশ্চর্যজনক গ্রন্থাগার। ইহাতে শুধু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির প্রচুর সংগ্রহ তো আছেই অধিকন্তু চীনা ত্রিপিটক এবং তিব্বতী ভাষায় সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও রহিয়াছে। ভারতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ আমি দেখিয়াছি। বিকানীরের প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহও সর্বাধিক। আড়াই শত বৎসর আগে এই সংগ্রহকার্য আরম্ভ হয়। সেখানে ছয় হাজার পাণ্ডুলিপি আছে। রাজপুতনার অন্যান্য রাজ্যে রহিয়াছে গড়ে আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। পুরী জিলার ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত শাসনগুলিতে প্রচুর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে বত্রিশটি শাসন ছিল। তাহার প্রত্যেকটিতে প্রথমত চব্বিশ জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম এই শাসনগুলিতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। আমার এই সংখ্যা শুনিয়া অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা এই সংখ্যাকে আজগুবি মনে করিয়াছিলেন। বিহার উড়িষ্যার ছোট লাট বাহাদুরকে আমি স্বাধীনভাবে সংখ্যা নিরূপণ করিতে বলিয়াছিলাম। তাঁহার সংখ্যা আমার থেকে অনেক বেশী ছিল। শিবাজীর পিতৃদেব সাহাজীর আমলে তাঞ্জোর প্রসাদ গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। ইহাতে অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সরকার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতেছে। কোন কোন সরকার ষোল হইতে সতের হাজার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে এই মূল্যবান সংগ্রহ করা হইয়াছে। কাশ্মীর, মহিশূর, গাইকোয়াড় এবং ত্রিবাঙ্কুরেও প্রচুর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য ও সঙ্গীত গ্রন্থাগারের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই শেষ করি। কিন্তু আমরা শুধু সংস্কৃত গ্রন্থাগার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে চাই না। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী বইয়ের সমাহারে গঠিত গ্রন্থাগারগুলির কথাই আলোচনা করিতেছি। দিকে দিকে এইরূপ গ্রন্থাগারের পত্তন হইতেছে। কিন্তু আমি সব সময়েই বলিয়াছি যে এইগুলি ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে। এইগুলি স্থাপিত হয়, তিন চার বৎসর থাকে, তারপরই উঠিয়া যায় এবং বইগুলির অপব্যবহার হয়। আমি নিজে এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম, কিন্তু কোনটিকেই ধ্বংস ও অবক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। পরবর্তীকালে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। ইহার আয়ু বত্রিশ বছর। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, অসমীয়া, উর্দু বই ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ইহাতে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অনেক গ্রন্থাগার নিজেদের রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিষদের হস্তে তাহাদের পুস্তকগুলি অর্পণ করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষও তাঁহাদের সংগৃহীত পুস্তক ইহাকে দান করিয়াছেন, উত্তর ভারতে ইহার অনেক শাখা আছে এবং ন্যূনাধিক সাফল্যের সহিত সর্বত্রই এই সংগ্রহকার্য চলিতেছে।

কিন্তু হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা পৃথক ধরনের। পারস্পরিক সাহায্যে ও সহযোগিতায় ইহা জিলার গ্রন্থাগারগুলিকে পুনর্গঠন করিতে চাহিতেছে। বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুকরণে ইহা প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে প্রেরণা লইয়া একটা বিরাট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য দিতেছেন। আমাদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ বৎসরে একবার গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদকবর্গকে এবং গ্রন্থাগারে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদিগকে শুধু জড় করিলে, ইহা যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, কোন সুফল ফলিবে না। কিন্তু আমাদের আইন পরিষদের সদস্যদিগকে ও সরকারকে আগ্রহান্বিত করিতে এবং সরকারী ব্যয় বরাদ্দ গ্রন্থাগারকে একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে স্থান দেওয়াইতে হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রকৃত আগ্রহ দেখাইয়া আমাদের জিলার অধিবাসীদের নিকট গ্রন্থাগারকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ পাঠান্তে হরিহর শেঠ মহাশয় 'গ্রামীণ গ্রন্থাগার' নামক এক প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল যে ছাত্র, বয়স্ক ব্যক্তি ও মহিলারা যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী বই নিয়া পড়িতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগারেরই অনুরূপভাবে বইগুলির শ্রেণীবিভাগ করা উচিত। প্রতিবৎসর সুপাঠ্য পুস্তকের একটি তালিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার ফলে গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক নির্বাচনের সুবিধা পাইবে। জিলা পরিষদের উদ্যোগে জিলার প্রত্যেক গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই চেষ্টা সফল হইলে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার পক্ষে অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উত্তরপাড়া সর্বজনীন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে উহার পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিয়া উহাকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বলেন। হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি বিবরণ দেন। অতঃপর সম্মেলনের সভাপতি যথারীতি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। নানা দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপুস্তক এবং বরোদা হইতে প্রেরিত গ্রন্থাগার আন্দোলনবিষয়ক প্রচারপত্র ও পুস্তক প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির অনুরোধে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ ইহা বুঝিয়াছেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের জন্যই শুধু শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকা উচিত নয়। সর্বসাধারণের জন্যই তা থাকা উচিত। দেশময় সর্বজনীন গ্রন্থাগারের বেড়াজাল ছড়াইয়া দিয়াই সফলতার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধন করা যাইতে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্য আমেরিকা কি কি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহার সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেন। কলিকাতা হইতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে

জাতীয় গ্রন্থাগার) দিল্লীতে স্থানান্তর করা সম্পর্কে সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে সরকারের এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইহার প্রথম কারণ কলিকাতার অধিবাসীরা, বলিতে গেলে যে মুষ্টিমেয় সুধীজন এইরূপ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন তাহারা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী নামে কলিকাতায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই। পরে ইহার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নাম দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর ইহা সুপরিচালিত হইবার পর ইহার পরিচালনভার উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। কাজেই অধিকারবলেই কলিকাতাবাসীদের দিল্লীতে এই গ্রন্থাগার স্থানান্তরের বিরোধিতা করা উচিত। দ্বিতীয় কারণ, দশ বার লক্ষ লোকের অধিবাসস্থল কলিকাতায় এই গ্রন্থাগার না রাখিয়া যদি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয় তবে কলিকাতার তুলনায় দিল্লীতে অনেক কম লোকের উপকারেই ইহা আসিবে। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহেন না যে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে কোন গ্রন্থাগার থাকিবেই না। কিন্তু তিনি কখনও বুঝিতে পারেন না যে কি কারণে দিল্লীতে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন দেখা দিল।

মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় জিলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন কতখানি প্রসার লাভ করিল সেই সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন পাঠ করিয়া পরিষদের বিভিন্নমুখী কার্যাবলীর বিবরণ দেন। প্রতিবেদন পাঠান্তে জানিতে পারা যায় যে তখন পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থাগারের নামের সংখ্যা ছিল সাতান্ন। তন্মধ্যে মাত্র পাঁচটি গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ছিল। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ছলে গ্রামকে সংগঠন করা এবং সেই সঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের অত্যাবশ্যকতার কথাও তিনি বলেন। ডঃ গুরুদাস রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ইতিহাস নামক তাঁহার রচিত প্রবন্ধ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পড়িয়া শোনান।

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাখাতে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের বরাবরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ, জিলার প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড-এ অন্তত একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন, বালক, মহিলা ও সাধারণ পাঠকদের উপযোগী নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ, জিলার গ্রন্থাগারসমূহে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্থানান্তরের প্রতিবাদ, জনগণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পুস্তকের লেনদেন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সম্মেলনের শেষে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বসে। ইহাতে তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—সভাপতি, মণীন্দ্রনাথ রুদ্র

মহাশয়—সম্পাদক এবং ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্ত মহাশয়গণ যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনের প্রথমে দুইটি গান এবং দ্বিতীয় দিন পরবর্তী দুইটি গান গীত হয়।

আবাহন গীত

স্বাগতম্ সুস্বাগতম্।
বিনীত নিবেদন এস সুধী সজ্জন
সকল আকিঞ্চন স্বাগতম্॥
জ্ঞানগরিমা যার চমকিল ধরণী,
দীনা দুঃখিনী কেন সেই জননী ?
ব্যথা বুকে চেপে ঐ মলিন মুখে
পথ চেয়ে আছে দেশবাসিগণ॥
জগত মথিয়া নাকি জ্ঞান বিদ্যা যত,
আনিয়াছ আহরি সাধিতে দেশহিত,
ধন্য অনুষ্ঠিত পুণ্য প্রতিষ্ঠিত,
পূর্ণ হউক যত সকল সাধন ;
দেশবাসিগণে শিখাইতে সযতনে
এস বিদ্বজন স্বাগতম্॥
লুপ্ত গরিমা যত সুপ্ত দেশবাসী,
কে জানে যে কোথা গেল গুপ্ত রতনরাশি,
তোমরা কি এসেছ দিতে সে সন্ধান ?
দেশ-বিদেশ ভ্রমি ঘুচাইতে আঁধার,
ধন্য সার্থক পুণ্য সাধনার,
পুণ্য পদার্পণে ধন্য মানি মনে
দেশসেবী পদে কোটী নমস্কার,
এস গুণী এস জ্ঞানী এস ধনী এস মানী
উদ্দেশে ব্যাখানি স্বাগতম্॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গান

পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
খুঁজে হলেম দিশেহারা।
কমল বনে খুঁজে এলেম
খুঁজে এলেম গ্রহতারা।
চোখে তোমার পাইনে দেখা,
বীণাটী শুনি কানে
তোমার অমন রূপের রেখা
লেখা সে চিত্রে গানে।
তোমার ঐ সোনার ছবি দেয় খুলে দেয়
ওগো দেয় খুলে দেয় অন্ধকারের বন্ধ কারা।
পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
খুঁজে হলেম দিশেহারা।
চোখে তোমার পাইনে দেখা
(তোমার) কমল ফুলের পাপড়িগুলি
এ বন ও বন সে বন করে
আমরা তুলি আমরা তুলি।
তুলে তুলে হলেম সারা।
(তোমায়) পাগল হলেম খুঁজে খুজে
খুঁজে হলেম দিশেহারা

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

গান

তোমার অমল চরণকমল · শরণ পিয়াসী ভিখারীর দল
জুটেছি জননি ভারতি।
জানি না মন্ত্র পূজা উপাসনা কেমনে তোমার করি আরাধনা
কি দিয়ে করি বা আরতি ?
মা তোমার ঐ চরণনখরে
শত সূর্যের কিরণ ঠিকরে
প্রতিভার যারা উচ্চ শিখরে
পায় তারা ক্ষীণ আলোক গো!
আমরা তোমার নির্বোধ ছেলে অজ্ঞান তিমির আবরণ ঠেলে
অন্ধ নয়নে দাও আলো ঢেলে
মুছে দাও যত তমসা গো।

অন্ধকারের সাথে সংগ্রামে তুমি মা মোদের সারথি
ওগো মা জননি ভারতি !*

শ্রীগিরিধন চট্টোপাধ্যায়

বিদায় সঙ্গীত

উৎসব মিলনে মাতোয়ারা মনপ্রাণ
কেন গো সহসা তবে হয় এত উচাটন।
আসিয়ে বসিয়ে পাশে বাঁধিয়ে মায়ার পাশে
কেমনে গো অবশেষে ফেলে যাবে সুধীগণ ॥

নিজগুণে এ মিলনে দিয়েছ পায়ের ধূলি,
অতিথি দেবতা এলে জ্ঞানের কপাট খুলি।
সমুচিত সমাদর করিতে গিয়াছি ভুলে
অজানিত অপরাধ হয়েছে তো অগণন ॥

মহৎ উদার জ্ঞান যা কিছু শিখাইলে,
বিজ্ঞান বিবরিয়া যা কিছু বুঝাইলে,
স্নেহ করুণা কত অবহেলে প্রকাশিলে,
চিরদিন মনে রবে এ মধুর মিলন ॥

বিদায়ের আগে শুধু একবার ফিরে চাও,
ত্রুটি করেছি কত নিজগুণে ভুলে যাও,
পিছু পড়ে থাকি পাছে হাত ধরে টেনে নাও,
প্রার্থনা পারি যেন করিতে অনুসরণ ॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

---

*সভাপতির ভাষণ ও উপরোক্ত গানগুলি শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

এই গানগুলি ছাপার ব্যাপারে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের একটু দ্বিধা ছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর বৎসর পূর্বে যে কোন সম্মেলনে গান ছিল অপরিহার্য। তখনকার দিনে গ্রন্থাগার সম্মেলনে কি ধরনের গান গাওয়া হ'ত তার কিছু নমুনা হয়তো মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে বলে গানগুলি আমরা হুবহু 'গ্রন্থাগারে' ছাপলাম। —সঃ গ্রঃ

পেপারব্যাক সংস্করণ প্রসঙ্গে

সুচিত্রা ঘোষ

বিগত ত্রিংশ সম্মেলনে "বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে" প্রবন্ধে বাংলায় পেপার ব্যাক সংস্করণের প্রচলন আরও বর্ধিত হোক এই মর্মে বঙ্গীয় প্রকাশক সভা সমীপে এক আবেদন রাখা হয়। দামে সস্তা, সাজসজ্জাবিহীন প্রচ্ছদ, কাগজের মলাট ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে 'পেপারব্যাক' সংস্করণের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থজগতে বিপ্লবের আধুনিকতম অবদান এই 'পেপারব্যাক' বা 'কাগজের মলাটের বই'। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, প্যাপিরাসের যুগ থেকে কিভাবে গ্রন্থিত জ্ঞানরাজি পেপারব্যাকের পর্যায়ে এসে পদার্পণ করল।

গ্রন্থ বিবর্তনের ধারায় কাগজের মলাটের বই খুব একটা নতুন আবিষ্কার তা বলা চলে না। ছাপাখানা আবিষ্কারের পর কাগজের মলাটের অনেক বই-ই প্রকাশিত হয়। ১৪৯৪ সালের পেপারব্যাকের নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্যালারীতে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের সাধারণ রেওয়াজই কাগজের মলাটের বই। গ্রন্থাগারিক বা বইয়ের মালিক নিজের সুবিধানুযায়ী তাকে নতুনভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে থাকেন। ইদানীং সেখানে শক্ত মলাটের বই বাঁধান বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।

ফ্রান্সের বিপরীত নিদর্শন ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়। উনিশ বা বিশ শতকের প্রারম্ভে 'পেপারব্যাক' সেখানে অপরিচিত না হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৩৫-এ পেঙ্গুইন কোম্পানীর এক অভিনব প্রচেষ্টায় গ্রন্থজগতে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হয়। কাগজের মলাট, সাজসজ্জাবিহীন প্রচ্ছদ, একই ধরনের মাপ, দামেরও বিশেষ তারতম্য নেই ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে দশটি জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করে পেঙ্গুইন কোম্পানী। হেমিংওয়ের Farewell to Arms, আঁদ্রে মারোয়ার "Ariel" ইত্যাদি বই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পেঙ্গুইনের এই প্রচেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহল থেকে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা হয়েছিল। সেদিনকার বইয়ের বাজারে তালিকাভুক্ত বইগুলি শক্ত মজবুত বাঁধাই-এ লভ্য ছিল। এছাড়া গ্রন্থাগার আইনের কল্যাণে পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বার সাধারণের কাছে উন্মুক্ত ছিল। কাজেই পেঙ্গুইনের প্রচেষ্টা যে কতটা সফলতা অর্জন করতে পারবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেকের কারণও পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠক মহলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সব সন্দেহের নিরসন হয়। এরপর পাঠ্যবস্তুর চাহিদা অনুসারে পেঙ্গুইন গল্প, উপন্যাস, জীবনী ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ের বইও পেঙ্গুইন কোম্পানী প্রকাশ করে। পেঙ্গুইনের অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উক্ত প্রকাশক সংস্থা 'পেলিক্যান সিরিজে'র নামে এর এক শিক্ষণীয় বিভাগের (educational counterpart) সূত্রপাত করেন। এই সিরিজে গল্প উপন্যাস জাতীয় বই ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের বই বের করা হয়।

এক আকাশ, অনেক তারা

[দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (ইয়াসলিক) সপ্তম সম্মেলন, ১৯৬৭ প্রসঙ্গে]

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের দিল্লী। কিছুদিন পূর্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীতের হাওয়ায় কাঁপন দিচ্ছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশে এবার ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (ইয়াসলিক) সপ্তম সম্মেলন হতে চলেছে। ২৬শে ডিসেম্বর থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আসতে শুরু করেছেন। ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে অধিবেশন। কর্মকর্তারা সবাই ব্যস্ত। অরগানাইজিং সেক্রেটারী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীকাপুর এর মধ্যমণি। প্রতিনিধিদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোষ্টেলে। তবে বেশির ভাগ প্রতিনিধিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অতিথিশালায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা এককথায় সুন্দর ও মনোরম।

২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিনিধিবৃন্দের নাম তালিকাভুক্তিকরণ (Registration) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোল। নাম তালিকাভুক্তিকরণ অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী আশীষ সেন ও শিবব্রত ঘোষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা মনে রাখবার মত। 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী সায়েন্স অ্যাবস্ট্রাকটে'র প্রধান সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হোল সদ্য প্রকাশিত নতুন এই জার্নালটিকে প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এর মধ্যে পদ্মশ্রী বি, এস, কেশবন এসে একবার সব দেখে গেলেন।

বিকেল ৪-৩০ মিনিটে 'নিউ কনভোকেসন হলে' উদ্বোধন অনুষ্ঠান আরম্ভ হোল। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপি, এন, ভেঙ্কটাচারীকে ইয়াসলিক বুলেটিনে প্রকাশিত ১৯৬৬ সালের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য (Source materials for locating Government of India Publications. Iaslic Bull 11, 2; 1966 ; 119-27) ইয়াসলিক মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অব্ সায়ান্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের (CSIR) ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ আত্মারাম। বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (IASLIC) তরফ থেকে পরিষদের সভাপতি কলকাতার ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডঃ বি, মুখার্জি ভাষণ দেন। ডঃ মুখার্জি তাঁর ভাষণে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (IASLIC) ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, জাতীয় সরকারের উচিত এই ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া ও সাহ

করা। সম্মেলনের মূল সভাপতি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস, বসীরউদ্দিন তাঁর মূল্যবান ভাষণের প্রারম্ভেই বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম এই সম্মানে ভূষিত করে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্র (IASLIC) তাকে গৌরবান্বিত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি তার ভাষণে বলেন—মেসোপটোমিয়ায় সভ্যতার উষাকালে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থাগারের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই গ্রন্থাগারিক বৃত্তিরও প্রারম্ভ সূচিত হয়। প্যারিসে ১২৫৭খৃঃ কোন একটি কলেজের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারকে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় উন্মেষের কারণের পেছনে ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ধারণা 'as preservation, assimilation, transmission and not as innovation, investigation and extension of Knowledge'.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণশীল ভূমিকা গ্রন্থাগারের উন্নতিকে ব্যাহত করে। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেই সত্যিকারের জীবন্ত গ্রন্থাগার পরিলক্ষিত হয়। অক্সফোর্ডের বদলেয়ান ও মিলানের অ্যামাব্রোসিয়ান গ্রন্থাগার ধরনের, গতানুগতিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলির উপরেও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পরিলক্ষিত হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপর্যাপ্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিজ্ঞান কেবল কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্বৎ সভা কর্তৃক লালিত পালিত হতে থাকে, অকস্মাৎ সেই বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে প্রবেশ করে পশ্চিমী বিজ্ঞানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

এর ফলে, শিক্ষাসম্বন্ধে পুরানো ধারণা যথা, বর্তমানের জ্ঞানকে পুরুষানুক্রমে পরবর্তীকালে সঞ্চারিত করা—এই ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানের সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার সাহায্যে লব্ধ নতুন জ্ঞানের সংযোজনে জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু লব্ধজ্ঞানকে সংযোজন করে জ্ঞানের জগতে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে সমালোচনা, অনুসন্ধান, গবেষণা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একটি নতুন পথে চলতে শুরু করে। এই যুগান্তকারী পরিবর্তিত চিন্তাধারা গ্রন্থাগারের গতি, প্রকৃতি, গঠন, বৃদ্ধি ও সংগঠনে পরিবর্তন সূচিত করে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা এই উভয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হবেন একজন বিদ্যোৎসাহী এবং গবেষণা প্রণালী (methodology of research) সম্বন্ধে পারদর্শী। পরিশেষে অধ্যাপক বসীরউদ্দিন তাঁর ভাষণে কয়েকটি সমস্যাকে তুলে ধরেন।

প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উৎকেন্দ্রিক করার যে প্রবণতা (Centrifugal

trend), এই প্রবণতা যদি না সুসম্বন্ধ কার্যধারায় নিয়মানুগ করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-যোগানের কেন্দ্রে পরিণত হবে। বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণা বিজ্ঞানীর সর্বসময়ের কাজ হওয়ায়, কোন একজন বিজ্ঞানী তাঁর বিশেষ বিষয়ের সমস্ত পুস্তক, পত্র পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে পেতে চান। অবশ্য এই ধরনের মনোবৃত্তি খুবই যুক্তিযুক্ত। এর ফলে, সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য যে মূল্যবান সময় বিজ্ঞানীর অপচয় হত, তা তিনি অতি সহজেই বাঁচাতে পারেন। প্রায়ই দেখা যায় তিনি যে পুস্তক বা পত্রপত্রিকা পেতে চান, তা হয় অন্য কোন পাঠকের কাছে আছে, অথবা গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট স্থানে নেই কিংবা হারিয়ে গেছে। এই ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে গবেষক তার বিষয়ের সমস্ত পুস্তক কোন একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করতে চান। কিন্তু গ্রন্থাগারিক এই ধরনের চিন্তায় বাধা দেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ এতে গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় সত্তার বিলোপ ঘটে। গ্রন্থাগার জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র ও অধ্যাপক যে কোন পুস্তক দেখতে আগ্রহী বা দেখার সুযোগ পেতে চান, বিশেষ করে যখন বিভিন্ন বিষয় সমন্বিত (Inter-diciplinary) গবেষণার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জ্ঞানের সীমারেখার পৃথকীকরণ অসম্ভব। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের ফলে এই চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা অপ্রয়োজনে একাধিক ক্রয় করা হতে পারে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অর্থের উপর চাপের সৃষ্টি করবে। তাহলে উপরোক্ত সমস্যার প্রতিবিধান কি? অনেক সময় বলা হয় Divisional Library এর উত্তর। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তা নয়।

দ্বিতীয় সমস্যা হল: সেলফে পুস্তক সন্নিবেশ করার সমস্যা। আমাদের পুস্তক শ্রেণী বিভাগীকরণের যে পদ্ধতিগুলি ২৪ বৎসর পূর্বে জ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে হয়ত খাপ খেত, কিন্তু এখন ব্যবহারিক দিক দিয়ে কোন শ্রেণী বিভাগীকরণের রীতিই (clasification System) বোধ হয় উপযোগী নয়। মিঃ র‍্যালফ এলস্‌ওয়ার্থ তাঁর কোন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বভাব বিজ্ঞান (Behavioural Sciences) অধ্যাপনা প্রভৃতির কার্যক্রম আছে এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একেকটি এরকম কার্যক্রমের সূত্রপাত হবে। কিন্তু স্বভাব বিজ্ঞান অনেকগুলি বিভিন্ন বিষয় সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি। এই বিষয়গুলি হল: (১) মনোবিজ্ঞান (২) জীববিদ্যা (৩) সমাজবিদ্যা (৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৫) অর্থবিদ্যা (৬) নৃবিদ্যা (৭) গণিত প্রভৃতি। কি করে কোন পুস্তক শ্রেণীবিভাগের রীতি (classificatlon system) আমাদের সহায়ক হবে, যখন সমস্ত জ্ঞানের জগতের প্রত্যেক অংশই চঞ্চল?

প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অসন্তোষের কারণই হচ্ছে পুস্তক বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের জগতের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা।

তৃতীয় সমস্যা হল: গ্রন্থাগারিক ও তাঁর শিক্ষা সমস্যা। এই পরিবর্তনশীল গ্রন্থাগারের

জন্য কি ধরনের গ্রন্থাগারিক দরকার এবং কিভাবে গ্রন্থাগারিক নিজেকে যোগ্য করে তুলবেন—এ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিঃ ডগলাস ব্রিয়াণ্ট। যদিও প্রথাগত গ্রন্থসম্বন্ধীয় কলাকুশলতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহাও অতি পরিষ্কার যে এর চেয়ে একটা বেশি কিছুর প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের বিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করে থাকে তার উপরেও অতি উচ্চ পর্যায়ের আকাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

উপরোক্ত সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একজন গবেষক গ্রন্থাগারিকের কাছে (Reserch Librarian) যে আশা, এমন কি কারিগরী নৈপুণ্যের জন্যে যে প্রারম্ভিক প্রয়াস প্রয়োজন তা কি করে এক বৎসরের পাঠ্যক্রমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে?

আমরা আমাদের যাত্রাপথের এমন এক সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছি যখন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রগুলির যুগ্মভাবে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে, আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন আছে যাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অধিগত। এই সব গ্রন্থাগারিকগণ নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ দ্বারা এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণা করে গ্রন্থাগারের ক্ষমতার যোগ্য ব্যবহারের দ্বারা গবেষণায় সাহায্য করেন।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ইহার কার্যপ্রণালী কেবল শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষণার দিকে নিবদ্ধ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের শুধু পেশাগত নৈপুণ্য ও সাধারণ কারিগরী শিক্ষা থাকলেই চলবে না, তাকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রণালী এই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করতে হবে। এই সম্মেলন প্রমাণ করছে যে আমরা এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছি।"

এবারকার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি: (১) Indexing and Abstracting Services in India (2) Translation Services in India.

৩৬টি প্রবন্ধ আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর সকাল ৯-৩০টায় প্রাতঃ-কালীন অধিবেশনে প্রথম বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়। অধিবেশনে ডাইরেক্টর জেনারেল, ডাইরেক্টর, রাপোর্টার জেনারেল ও রাপোর্টার ছিলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী বি, এস, কেশবন, ধনপৎ রাই, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী ও ভি, পি, ভিজ। ডাইরেক্টর শ্রীধনপৎ রাই প্রথমেই বিষয়টিকে স্থির লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার জন্য বিষয়টির আলোচনার পরিধি নির্দিষ্ট করে দেন। আলোচনার মূল বিষয় ও ভাবধারা যে প্রবন্ধগুলো আলোচনা করলে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই প্রবন্ধগুলোর লেখকদের বিতর্কের সূত্রপাত করতে তিনি অনুরোধ করেন।

যে সমস্ত প্রবন্ধ আলোচনার জন্য প্রেরিত হয় তন্মধ্যে শ্রীসুব্বারাওয়ের প্রবন্ধটির* এখানে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, ইয়াসলিকের সদ্য প্রকাশিত নতুন পত্রিকা 'Indian Library Science Abstracts' (ILSA) প্রকাশনার ব্যাপারে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে এই প্রবন্ধটি। তাই প্রবন্ধটির কয়েকটি মূল তথ্য সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করছি। প্রবন্ধটি দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তথ্যসম্বলিত, দ্বিতীয়াংশ ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তথ্যসম্বলিত। ১৯৫২-৬১ সালের তথ্য নিম্নরূপ :

(১) এই সময়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ৭৫০টি প্রবন্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র ২০৯টি প্রবন্ধের Library Science Abstracts এ তথ্য-সংক্ষেপ (abstract) করা হয়েছে ; অর্থাৎ ২৮% তথ্য-সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং ৭২% অবহেলিত হয়েছে।

(২) কোন একটি রচনা প্রকাশিত হবার দিন থেকে Library Science Abstracts-এ প্রকাশিত হবার দিন পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৭ মাস ৭ দিন।

(৩) এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ভারতীয় রচনার তথ্য-সংক্ষেপের জন্য প্রয়োজন একটি ভারতীয় পত্রিকা।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ ১৯৬২-৬৬ সালের তথ্য নিম্নরূপ :

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভারতে ১০৬৪টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে (কনফারেন্স প্রোসিডিংস ধরে)।

তন্মধ্যে মাত্র ১৬৪ টি প্রবন্ধের Library Science Abstracts (London) পত্রিকায় তথ্য-সংক্ষেপ করা হয়েছে অর্থাৎ মাত্র ১৭% প্রবন্ধের তথ্য-সংক্ষেপ হয়েছে।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময় থেকে তথ্য-সংক্ষেপ (abstract) প্রকাশিত হবার দিন পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ১০.৬৯ মাস।

(৩) ডঃ রঙ্গনাথন এখনও ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের ভিতর প্রবন্ধ রচনা সংখ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি এই সময়ে ২৭টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন—ক্লাসিফিকেসনের উপর ১০টি, ক্যাটালগিং ১, ডকুমেন্টেশন ৭ এবং অর্গানিজেশন ও অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উপর ৯।

৪) এই সময় অপর একটি জিনিস পরিলক্ষিত হয় যে, অধ্যাপক নীলমেঘন রচনা সংখ্যায় ডঃ রঙ্গনাথনের কাছাকাছি এসে গেছেন। রচনাসংখ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তিনি ১৩টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ৬টি ক্লাসিফিকেসন ও ৭টি ডকুমেন্টেসন সম্বন্ধীয়।

২-৩০ মিঃ বৈকালিক অধিবেশনে প্রথমোক্ত বিষয়ের উপর পুনরায় বিতর্ক শুরু হয় ৪ টার সময় বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

* Indian out put in English from Library Science primary Sources noticed in foreign abstracting periodicals : a critical introspection : Project I. 1952-61 এবং Project II. 1962-66.

৪টার সময় সম্মিলিত প্রতিনিধিদের ফটো তোলা হয়।

বিকেল ৫টার সময় দিল্লী পুস্তক বিক্রেতা সংঘ প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান।

৬টার সময় Dr. Herman Liebaers টেগোর হলে বক্তৃতা দেন।

২৯শে ডিসেম্বর সকাল ৯-৩০ মিঃ Translation Services in India—এই বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়।

এইদিনকার অধিবেশনে সভাপতি ও র‍্যাপোর্টারের কায সম্পাদন করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী এম, এস, ডাণ্ডেকর ও দেবব্রত রেজ।

শ্রীডাণ্ডেকর প্রারম্ভেই আলোচনার পরিধি নির্দিষ্ট করে দিয়ে আলোচনার ধারাকে মূল লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন। ২-৩০ মিঃ Plenary Session আরম্ভ হয় এবং খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়।

বিকেল ৫টার সময় দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ সমাগত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান। এই উপলক্ষ্যে শ্রী বি, এস, কেশবন 'এশিয়ায় ডকুমেন্টেশন' (Documentation in Asia) শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা উপহার দেন।

বক্তৃতায় তিনি জাপানের অধিবাসীদের কর্মপ্রবণতা, সহিষ্ণুতা এবং উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার ডকুমেন্টেশনের কাজকে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি DRTC-র ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

৩০শে ডিসেম্বর সকাল ৯-৩০ মিঃ পরিষদের সহ সভাপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা হয়। পরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ পরিষদের দ্বিবাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হল।

সভাপতি : ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়।

সহসভাপতিবৃন্দ : সর্বশ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, এস, বসীরউদ্দিন, ডি, এন, মার্শাল, কে, এস, হিন্গে, জগদীশ শরণ শর্মা।

সাধারণ সম্পাদক : শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীআশীষ সেন

যুগ্ম সম্পাদক : সর্বশ্রী এস, এম, কুলকার্ণী, চিত্তরঞ্জন পাল

সহসম্পাদক : সর্বশ্রী অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারিক : শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

কাউন্সিল সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী জীবানন্দ সাহা, ধনপৎ রাই, বি, এন, ভরদ্বাজ, সুব্রত দত্ত, সি, ভি, সুব্বারাও, এন, কে, গোয়েল, কে, এ, আইজ্যাক, শক্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, ঘোষাল, ফণিভূষণ রায়, টি,

লাহিড়ী, প্রবীরকুমার রায় চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সরকার, আর, পি, হিঙ্গরাণী, গিরিজাকুমার, আহমেদ সুলতান ও ডঃ (মিস্) এস্, চিতলে।

সমাপ্তি অধিবেশনের পূর্বে নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবাবলী (Indexing and Abstracting Services in India) :

(১) এই সম্মেলন ভারতীয় বিজ্ঞান সাহিত্যের Bibliographical Control বিষয়ে ইনসডকে কার্যাবলী গভীর সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এই সম্মেলন 'Indian Science Abstracts' প্রকাশকে একটি সময়োচিত পদক্ষেপ হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছে। এই সম্মেলন ইহাও মনে করে যে, বর্তমান সময়ের ব্যবধানকে (time lag) হ্রাস করা এবং I S A-র বিষয়সীমা (Coverage) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২) ভারতীয় বিজ্ঞান সাহিত্যের সম্পূর্ণ Bibliograplical Control-এর জন্য ১৯৩৪ সালের পূর্ববর্তী ও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে বিচ্ছিন্ন সময় (gap period) রয়েছে, সেই সময় পূর্ণ করার জন্য এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে NIS, CSIR, UGC-র মত সংস্থা যেন অবিলম্বে এই কার্যভার গ্রহণ করে।

(৩) এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে, যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ (major) বিষয়ে নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ (Indexing & Abstracting Service) কার্যাদি নাই অথবা পর্যাপ্ত নয়, সেই সব বিষয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতি আছে (resource) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশী ও তথ্য সংক্ষেপ কার্যাদির জন্য একটি 'National Information Grid' গড়ে তোলা উচিত।

নতুন তথ্য অবগতকরণ কার্যাবলীর (Current awareness Service) জন্য স্থানীয় নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ কার্যাবলীকে (Local Indexing and Abstracting Service) উন্নত করা ও উৎসাহিত করা উচিত বলে এই সম্মেলন মনে করে। (৪) এই সম্মেলন মনে করে যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সে, বিশেষ করে মাষ্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাস্তরে, নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপের (Indexing and abstracting) তত্ত্ব ও ব্যবহার (theory and practice) প্রণালী শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া উচিত। এই সম্মেলন DRTC, INSDOC, IASLIC পরিচালিত কোর্সগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে। এইসব সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা, যাদের এধরনের কোর্স চালু করার সুযোগ আছে সেইসব সংস্থাকে স্বল্পমেয়াদী নির্দেশী ও সারসংক্ষেপ শিক্ষণকোর্স চালু করার জন্য এই সম্মেলন অনুমোদন করছে।

(৫) এই সম্মেলন ইয়াসলিক কর্তৃক সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকা 'Indian Library Science Abstracts'কে স্বাগত জানাচ্ছে।

প্রস্তাবাবলী (Translation Services in India) :

(১) ভারতের বিভিন্ন সংস্থা কতৃক অনুবাদিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ের সংগ্রহ নির্দেশীকরণ (indexing), তথ্য-সংক্ষেপকরণ (abstracting) এবং পরিবেশনে

(dissemination) সুবিধা সৃষ্টির জন্য এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে একটি কেন্দ্রীয় অনুবাদ ভাণ্ডার (Central Depository of Translations) গড়ে তোলা উচিত এবং ইহাকে অন্যান্য সমগোত্রীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীর (liaison) ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(২) যেহেতু যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদকের সংখ্যা যথেষ্ট সীমিত, রুশ, জার্মাণ, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার মত প্রায়শঃ ব্যবহৃত ভাষাসমূহের জন্য আঞ্চলিক অনুবাদকেন্দ্র (Zonal Translation Centres) পরিচালিত হলে কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থাগুলির (Central Translating Agencies) কার্যভার লাঘব করার জন্য এই সব অনুবাদকের কার্যগুলিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে নিয়োজিত করা যাবে।

স্বল্পজানা বিদেশীভাষা যেমন চীনা, জাপানী ইত্যাদি থেকে অনুবাদ কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থাগুলিতে যথেষ্ট উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই সম্মেলন উপদেশ দিতেছে।

উপরোক্ত অনুমোদনগুলি কাযে পরিণত করার ও পথের সন্ধান লাভের জন্য এই সম্মেলন ISTA, IASLIC ইত্যাদির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করতে ইন্‌সডককে অনুরোধ করছে।

এই সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে আয়োজিত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনায় ত্রুটি থেকে যাবে।

প্রথমতঃ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'Souvenir' প্রকাশ করেন। 'Souvenir'টি মনোরম।

দ্বিতীয়তঃ দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ, পরিষদের ১৫ বৎসরের কার্যবিবরণী একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। এই পরিষদ পরিচিতি সত্যই প্রশংসনীয়।

তৃতীয়তঃ এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান প্রদর্শনীর আয়োজন করে ইন্‌সডক সুধিবৃন্দের বিশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছে। প্রদর্শনীটি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। কোন গ্রন্থাগার সম্মেলনের সঙ্গে এই ধরনের প্রদর্শনী অদ্যাপি দেখিনি। ইনসডকের কর্মীদের নিরলস কর্মসাধনা ও অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর ছিল প্রদর্শনীর প্রতিটি দ্রষ্টব্য জিনিসের মধ্যে।

৩১শে ডিসেম্বর—একে একে প্রতিনিধিরা সবাই চলে যাচ্ছেন। তখনও যেন আমার কানে আসছে আমেদ সুলতানের সুরেলা কণ্ঠের কবিতার রেশ যার মর্মার্থ হচ্ছে : 'এই দিল্লীকে আমি ভালবাসি—দিল্লী ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করেনা।'

সত্যই মনে হল কি যেন পেয়ে হারালাম দিল্লীর পথের ধূলায়।

Report of the 7th IASLIC Conference – Delhi, 1967
By Subhas Chandra Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিভিন্ন স্থানে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন

কলিকাতা

বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগার। কলিকাতা-৩৫

গত ২৪শে ডিসেম্বর বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম-সচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। বিভিন্ন বক্তা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগারের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকারের নিকট উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য দানের আবেদন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় যে সব দোষত্রুটি আছে সেগুলির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ও এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকারের উচিত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা। অধ্যাপক সুব্রত মুখার্জী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণের দাবী করেন। বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি ঘোষ মহাশয়ও এই সভায় ভাষণ দেন।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার। ৩২এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, কলি-২৩।

গত ৩রা ডিসেম্বর, '৬৭ 'সমাজ শিক্ষা সপ্তাহ' উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রদীপ রায়চৌধুরী এবং সভার উদ্বোধন করেন শ্রীসমর দত্ত। সাক্ষরতা অর্জন, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দেন সবশ্রী বিজয় বসু. রাজকুমার দত্ত, সুরঞ্জন দত্ত, সন্তোষ পাল ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয় গত ২০শে ডিসেম্বর। শ্রীউদয় সেনের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সবশ্রী সমর দত্ত, বিশ্বনাথ পাল, সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক গায়েন, বিজয় বসু ও শংকর মুখোপাধ্যায় নানা আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

২৪ পরগণা

গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির। গাইঘাটা

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৭ গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ গ্রন্থাগরের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। জনশিক্ষা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীশশাঙ্কশেখর চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জয়ন্তকুমার সেন, ননীগোপাল দেবনাথ, হারানচন্দ্র সাহা, গোবিন্দ দেবনাথ, বিমল কর্মকার ও অনিরুদ্ধ নাথ।

সংগঠনের দ্বি-মাসিক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩রা জানুয়ারী, '৬৮। বিতর্কের বিষয় ছিল ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন'। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোকুল বিহারী বসু ও শ্রীশ্যামাপদ সেন মহাশয় সভার কাজ পরিচালনা করেন।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী। মেটেলী। জলপাইগুড়ি।

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মিবৃন্দ গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণোদয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে, গত ২৪শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে ঐ গ্রামে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সদস্যদের বকেয়া চাঁদা আদায় ও পুস্তক সংগ্রহের একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় মেটেলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নানা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অরুণ খাসনবীশ, শান্তিময় রায় এবং অমূল্যগোপাল সেনগুপ্ত। গ্রন্থাগারিক শ্রীরাখালচন্দ্র মালাকার গ্রন্থাগার আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নদীয়া

কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়। কৃষ্ণনগর।

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৭ কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। গড়জয়পুর।

গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্যমন্দিরের একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন গত ২৫শে ও ২৬শে কার্তিক, ১৩৭৪ অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে পুরুলিয়া বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যক্ষ ডাঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সাহিত্যবাসরে বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

গত ২০শে ডিসেম্বর বর্ধমান জামালপুর থানার অন্তর্গত গ্রামীণ গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। গ্রন্থাগার ভবন পরিষ্কার, মহিলা সমাবেশ ও জনসভার মাধ্যমে ঐ দিনটি যথাযথরূপে পালন করা হয়। সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমধুসূদন পাণ্ডিত গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। অন্যান্য বছরের মত এবারও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর জন্মদিন, গত ১৪ই নভেম্বর 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং ১লা ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস' যথারীতি উদ্‌যাপন করা হয়।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি। শ্রীখণ্ড।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতির শিশু গ্রন্থাগার বিভাগের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী ৺লক্ষ্মীকান্ত বরাট ও ৺সুশীলকান্ত কবিরাজ মহাশয়ের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দাস।

বীরভূম

খরুন শক্তি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার। খরুন।

স্থানীয় সুপরিচিত কবিয়াল শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে, গত ২০শে ডিসেম্বর শক্তিসঙ্ঘে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীঅম্বুদাক্ষ রায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন এবং বিভিন্ন বক্তা বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় পরিষদের প্রধান পরিচালকের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

হাওড়া

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পল্লী পাঠাগার। ওয়াদিপুর।

জনশিক্ষা পাঠাগারে গত ১লা থেকে ৭ই ডিসেম্বর, '৬৭ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সমাজশিক্ষা সপ্তাহ' পালন করা হয়। শ্রীগণেশচন্দ্র পাত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ সভা, ও আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সবশ্রী গণেশচন্দ্র পাত্র, অবনীভূষণ ধাঁড়া, সুশীলরঞ্জন দে, মন্মথনাথ পাত্র এবং নৃপেন্দ্রনাথ ধাঁড়া।

দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। দফরপুর।

গত ২৪শে ডিসেম্বর, '৬৭ দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীসত্যবরণ পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিভিন্ন বক্তা 'গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন' এই মর্মে বক্তৃতা করেন।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সাধারণ পাঠাগার।

গত ১লা জানুয়ারী, '৬৮ ত্রিবেণী হিতসাধন সাধারণ পাঠাগারের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হুগলী মল্লিকবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধারমণ গোস্বামী। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের ইতিহাস বিবৃত করেন। অনুষ্ঠানে বাগাটী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে পাঠাগার প্রদত্ত ভূপেন্দ্রনাথ সোম স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

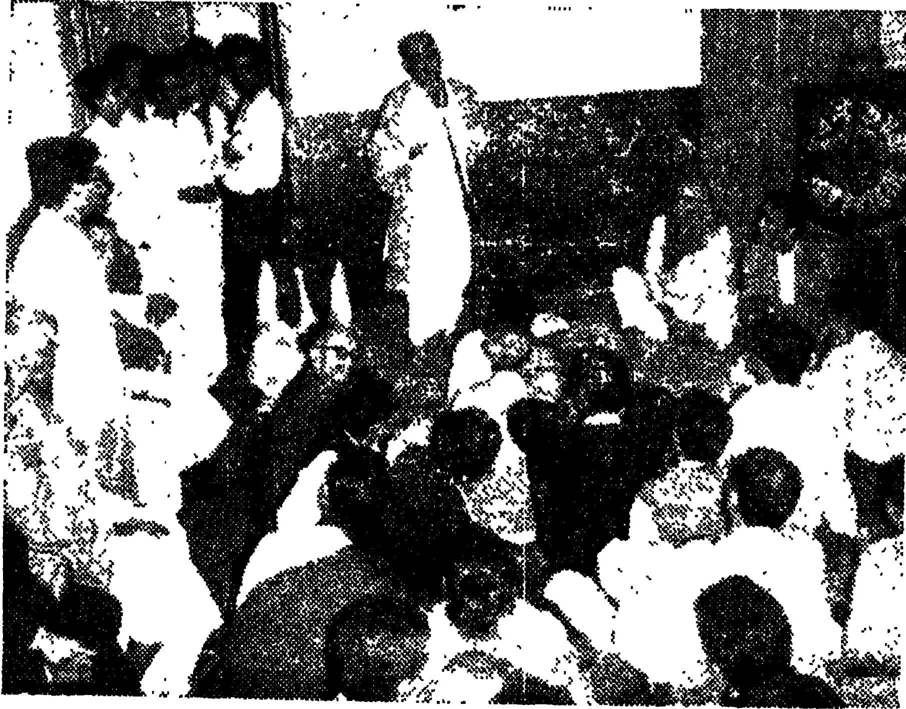
প্রচার, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে গত ২৬শে ডিসেম্বর, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির সাধারণ পাঠাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভদ্রেশ্বর পাবলিক লাইব্রেরী। ভদ্রেশ্বর।

ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারে, গত ২৪শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলী জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিল কুমার দত্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী। এঁরা প্রত্যেকেই সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীভোলানাথ ঘোষ 'গ্রন্থাগার দিবসের' তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যিক শ্রীশচীন অধিকারী ও শ্রীসম্রাট সেনের উপস্থিতিতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার। ৪০, শ্রীরামকৃষ্ণ রোড। রিষড়া।

গত ৩১শে ডিসেম্বর, '৬৭ মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমুদশঙ্কর দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নানা বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রোহিণীকান্ত দে, নীলমণি ঘোষ, দুর্গাপদ ঘোষ, অনিলকুমার দাঁ, শুভ্রাংশু মিত্র, স্বামী সোমানন্দ ও কুমুদশঙ্কর দাশগুপ্ত। News from Libraries



গত ২০শে ডিসেম্বর শান্তি ইন্সটিটিউটে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভার চিত্র।

গ্রন্থাগার কর্মিসংবাদ

তুলিন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের পুনর্নিয়োগ

পুরুলিয়া জিলা গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে তুলিন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুইজন কর্মী যথারীতি চাকুরী করে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন। কর্মীরা ৭ মাসের বেতনও পেয়েছেন। এই কর্মীদের দাবীগুলি নিয়ে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নেতৃত্বে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার ফলে ঐ দাবী আজ স্বীকৃত হল। পুরুলিয়ার কর্মীদের—তুলিনের কর্মীদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সমিতির দ্বিতীয় সভা—গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় "ইয়াসলিক" সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিল্লীতে থাকায় সমিতির প্রবীণ সদস্য শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

(১) গত ২৪শে অক্টোবর '৬৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মী কো-অর্ডিনেসন কমিটির যে বৈঠক হয় তার সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে

(ক) শিক্ষাসচিব, শিক্ষা অধিকর্তা ও সমাজ-শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

(খ) বেতন কমিশনের সদস্যদের সংগে যোগাযোগ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য যথাযথভাবে পেশ করতে হবে। বেতন কমিশনের অন্যতম সদস্য ও বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

(২) পশ্চিমবংগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার বিশিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ সূচক প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয় সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

Library workers in the news

বার্তা-বিচিত্রা

মির্জা গালিবের মৃত্যু শতবার্ষিকী

১৯৬৯ সালে বিখ্যাত ভারতীয় কবি মীর্জা গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মহাকবি গালিবের শতবার্ষিকী কাব্যসংকলন সম্পাদনার কাজ শুরু করেছেন। এই উপলক্ষে উর্দু, ফার্সী ও রুশ ভাষায় গালিবের রচনাবলী ও তাঁর জীবনী প্রকাশিত হবে। এ কাজে তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করছেন। ভারতীয় শতবার্ষিক কমিটি গালিবের কয়েকটি কাব্যের প্রথম সংস্করণের কপি সোভিয়েতের এশীয় জনগণের ইনস্ট্যিটকে পাঠিয়েছেন। এশীয় জনগণের প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা বাবাজান গফুরফ এ-পি-এন এর সংবাদদাতাকে এই সকল সংবাদ জানিয়ে দেন।

ফ্লোরিডায় অগ্নিকাণ্ডে গ্রন্থাগারের ক্ষতি

ফ্লোরিডার সুবিখ্যাত Miami বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এক অগ্নিকাণ্ডে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৭ বছরের গবেষণালব্ধ লক্ষাধিক ডলার মূল্যের হাজার হাজার পুঁথি ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধাবলী বিনষ্ট হয়েছে।

'রিয়াস-অল-মহম্মদ'-এর পাণ্ডুলিপি

লেনিনগ্রাডের বিশেষজ্ঞরা মহম্মদ খান লিখিত "রিয়াস-অল-মহম্মদ" নামে পস্তু ব্যাকরণ ও শব্দকোষের এক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। তারা বলছেন যে, এটি হলো পস্তু ব্যাকরণের প্রথম বই এবং বিগত শতাব্দীতে কলিকাতায় এই সম্পর্কিত যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুস্তক লেখা হয়েছে এটি তার মধ্যে কোন একটির অনুলিপি। এটি এখন Institute of Asian People's গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

অশ্লীল গ্রন্থাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকায় কমিশন গঠন

অল্পবয়স্কদের ওপর অশ্লীল পুস্তকাদি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকায় ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে।

এই কমিশনে একজন মহিলা আইনজীবী ও একজন শিক্ষিকাও আছেন। ১৯৭০ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করতে হবে।

কমিশন অশ্লীল সাহিত্য ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে যোগাযোগ এবং আমেরিকার যুবকদের মধ্যে এর প্রভাব নির্ণয় করবেন। চলচ্চিত্রকেও এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাশিয়ায় ভাষা শিক্ষার নতুন পদ্ধতি

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা টেপ রেকর্ডের সাহায্যে ভাষা শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। মস্কোর ছাত্ররা গত সেপ্টেম্বর থেকে এই পদ্ধতিতে ইংরেজী শব্দ শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি করেছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্ররা রাত নটায় বিছানায় বসে বই থেকে পাঠ নেয় এবং লাউডস্পীকারে নতুন শব্দের আবৃত্তি শোনে। দশ মিনিট পরে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে তারা প্রায় একঘণ্টা ধরে টেপরেকর্ডে ঐ শব্দগুলি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি শোনে। আবার সকালে ঘুম ভাঙ্গার ২০ মিঃ আগে থেকে সেই শব্দগুলি আবার টেপ রেকর্ডে আবৃত্তি করা হয়।

বৃটেনের নতুন রাজকবি সিসিল ডে-লুইস

বিশিষ্ট কবি সিসিল ডে-লুইস বৃটেনের রাজকবি মনোনীত হয়েছেন। গত ৪০ বছর ধরে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জন মেসফিল্ড। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৮৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করার পর পদটি এতদিন খালি ছিল। কবি ডে-লুইস 'নিকোলাস ব্লেক' এই ছদ্মনামে ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখেও যথেষ্ট নাম করেছেন।

২৬০০ লাইব্রেরীর শহর লেলিনগ্রাদ

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লেনিনগ্রাদেই লাইব্রেরীর সংখ্যা সর্বাধিক। শহরের সব থেকে পুরানো প্রথম পিটার প্রতিষ্ঠিত লাইবেরীটিকে বিজ্ঞান আকাদমীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে এখন বইয়ের সংখ্যা হল ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং পাঠকক্ষ ৪০টি। সালভিকোভশিচদ্রিন পাবলিক লাইব্রেরী আরও বড (বই সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ), এখানে সোভিয়েট জনগণের ৯০টি ভাষায়, পশ্চিম ইয়োরোপের ৩০টি ভাষায় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার ১২৬টি ভাষায় লিখিত বই রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় পাঠকদের ২০০০ বই দেওয়া হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলি ধরলে লেনিনগ্রাদের মোট লাইব্রেরীর সংখ্যা ২৬০০। কারিগরী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং দেবার জন্যে লেলিনগ্রাদে একটি লাইব্রেরী শিক্ষণ সংস্থা রয়েছে। বর্তমানে শহরের প্রতিটি নাগরিকের মাথা পিছু ২৪টি লাইব্রেরী পুস্তক রয়েছে।

(কালান্তর ২৩।১।৬৮)

আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলন

মাদ্রাজে গত ২রা জানুয়ারী থেকে আটদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে মাদ্রাজ শহরের সমুদ্রোপকুল অঞ্চলে ১০ জন বিশিষ্ট তামিল কবি, ও দেশপ্রেমিক ও পণ্ডিতের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাও হয়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলনের তামিল গবেষণা সম্পর্কিত সেমিনারের উদ্বোধন করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সদস্য চাঁদা ইংরাজী বছর হিসাবেই গণনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং নতুন বছরের প্রথমেই পরিষদের সদস্যগণের নিকট নিবেদন, তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের দেয় সদস্য চাঁদা পরিষদ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। এতে পরিষদের কাজকর্মের বিশেষ সুবিধে হয় এবং সুবিধে হয় 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকেরও। দেখা যায়, অনেকেই ২।৩ বছরের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে 'গ্রন্থাগার'-এর পুরনো সংখ্যার জন্য দাবী জানান। কিন্তু পুরনো সংখ্যাগুলির অধিকাংশই নিঃশেষ হয়ে যায় বলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলেই পুরনো সংখ্যাগুলি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'।

ঘোষণা

'গ্রন্থাগার'-এর মাঘ সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা বৎসর ১৯৬৭-৬৮ উপলক্ষ্যে 'গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। বিশেষ সংখ্যার মূল্য হবে ১৲ টাকা। কিন্তু পরিষদের সদস্য ও 'গ্রন্থাগার'-এর গ্রাহকদের এজন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। —সঃ গ্রঃ